উচ্চ মাধ্যমিক

ইতিহাস

ইউরোপ ও পৃথিবী
(১৭৬৩ - ১৯৪৫)

গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
কৌশাম্বী নাথ মল্লিক

ক্যালকাটা বুক হাউস

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ কর্তৃক তৃতীয় সংশোধিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য লিখিত।

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

দ্বিতীয় পত্র

ইউরোপ ও পৃথিবী
[১৭৬৩-১৯৪৫]

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লন্ডন)

প্রাক্তন অধ্যাপক ও রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; অস্থায়ী অধ্যাপক, এলমায়রা কলেজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট্ এবং অস্টিন্ কলেজ, শেরম্যান্, টেক্সাস্ স্টেট্, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

ও

শ্রীকৌশাম্বীনাথ মল্লিক, এম. এ. (ইতিহাস), এম. এ. (শিক্ষাবিজ্ঞান)

ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, বেহালা কলেজ; প্রাক্তন অধ্যাপক, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, হেতমপুর কলেজ; ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ; বেলুড় শিক্ষণ মন্দির।

পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৭৬
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আগস্ট, ১৯৭৮
পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই, ১৯৮২
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, ১৯৮৪

মূল্য ঃ পনরো টাকা

বাঁধাই ঃ ইস্ট এণ্ড ট্রেডার্স

প্রিন্টোগ্রাফ
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর ঃ

দাস প্রিণ্টার্স
১৭, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ নির্দেশিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইল।

ইউরোপ ও পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৭৬৩ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগটি বিভিন্ন কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুগের প্রারম্ভে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন—উপনিবেশবাদ, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ, শিল্প-বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে, আর এই যুগের শেষে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই যুগের সমগ্র ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ নহে। এই সময় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে; জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্র পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বভাবতই এই যুগে ইউরোপীয় আদর্শে ও লক্ষ্যে যখনই কোন পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই সময়কার ইউরোপ ও পৃথিবীর ইতিহাসের বিষয়বস্তু সরল ও সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বহু অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত করিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আশা করি।

বহু প্রয়োজনীয় মানচিত্র, ছবি, স্কেচ পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনা-ধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী বহু প্রশ্ন পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

পুস্তকখানি রচনাকালে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমরা তাঁহাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ইহা ব্যতীত আমাদের সহকর্মী শ্রীমৃণালকান্তি আতর্থী পুস্তকখানির গ্রন্থনা বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

স্নেহভাজন শ্রীমান বিপ্লব ভাওয়ালের সহায়তা না পাইলে এই পুস্তকটি দ্রুত প্রকাশ করা কখনও সম্ভব হইত না। শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয় পুস্তকখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
৭ই কার্তিক, ১৩৮৩

গ্রন্থকারদ্বয়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ নির্দেশিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় সংশোধিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতিহাসের আলোচনা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রতিটি অধ্যায় পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির শেষে নূতন ধরনের বহু প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই সংস্করণটি যে অধিকতর উপযোগী হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করান যাইতেছে যে সংশোধিত পাঠ্যসূচীতে আদি পাঠ্যসূচীর পঞ্চদশ অধ্যায় "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অধ্যায় হইতে কয়েকটি বিষয়ও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবতই পুস্তকখানির এই সংস্করণে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকারদ্বয়ের আশা নূতন সংস্করণখানি শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের নিকট পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে।

কলিকাতা
১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৫ — গ্রন্থকারদ্বয়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় মুদ্রণের প্রয়োজনের সুযোগে বইখানির আগাগোড়া পরিমার্জন সম্ভব হইল। ইহাতে বইখানির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করি ইহা পূর্বেই মতই অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর নিকট সমাদৃত হইবে।

কলিকাতা
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ — গ্রন্থকারদ্বয়

Revised Syllabus of History

PAPER II (Marks—100)

Europe and the World (1763-1945)

Section I :

Europe—1763-1789

Europe in 1763.
Enlightened Despotism.

Section II :

Industrial Revolution

Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries. Factory system—Effects of the Industrial Revolution upon contemporary society and politics.

Section III :

War of American Independence

Background—Causes of war, Treaty of Versailles 1783.

Section IV :

French Revolution and Napoleon

Causes of the Revolution—Calling of the States General—National Assembly—Legislative Assembly—National Convention—Reign of Terror—Significance of the Revolution—Advent of Napoleon—From Consulate to Empire—Reforms and Conquests of Napoleon—his fall. Impact of the Revolution on Europe.

Section V :

Reconstruction of Europe

The Congress of Vienna—Metternich System—Concert of Europe : its activities, causes of its failure.

Section VI :

Revolution and Reaction

July Revolution, February Revolution—Greek War of Independence.

Section VII

The Mid-century upheaval

National Revolutions of 1848-50—the sequence, character and sequel of the Revolutions.

Section VIII

Relations of Great Powers, 1850-71

The Eastern Question and the Crimean War—France under Napoleon III—Unification of Italy and Germany—Franco Prussian War—significance of the settlement of 1871.

Section IX :

Major European States & System of Alliances

Germany under Bismarck and William II (1871-1914)—Russia under Alexander II, Alexander III and Nicholas II, System of Alliances.

Section X :

Socialism and Imperialism

Karl Marx and Socialism—Reforms and Revolution in China.

Section XI :

Dismemberment of the Ottoman Empire

Development of Balkan nationalism—From Treaty of Berlin to Balkan Wars.

Section XII :

First World War and its aftermath

Causes of the War—Major Participants—Peace Settlement of 1919-23—League of Nations—Modernisation of Turkey.

Section XIII :

Russian Revolution—its impact

Section XIV :

Dictatorship and Failure of Collective Security

Locarno Treaty and Pact of Paris—Disarmament—Work of the League—Fascism on the ascendant and breakdown of collective security—Chamberlain—Daladier—Mussolini—Hitler and Stalin—Origin of Second World War.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপ

(১৭৬৩-১৭৮৯)

ইউরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা—রেনেসাঁস আন্দোলন—ভৌগোলিক আবিষ্কার, ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, সামন্তশক্তির পতন, ফ্রান্সের উথান, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অভ্যুদয়, অস্ট্রিয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, ১৭৬৩-এর গুরুত্ব, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষে (১৭৬৩) ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী-শাসন ইউরোপের কিরূপ রাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দ ও নৃপতিবৃন্দ।

ইউরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা ঃ প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই পরিবর্তন দেখা দেয়। এইগুলি হইল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রেনেসাঁস আন্দোলন, এই শতাব্দীর শেষ দশকের ভৌগোলিক আবিষ্কার, এবং ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

আধুনিক যুগের প্রস্তুতি চলিয়াছিল কয়েকশত বৎসর ধরিয়া। ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে ইহা তাড়াতাড়ি আসে, অনান্য স্থানে কিছুটা বিলম্বে। তবে সমগ্র ইউরোপে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল শক্তি মধ্যযুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলির অবসান ঘটায় সেগুলি ছিল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই শক্তিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল অর্থনৈতিক। মধ্যযুগের থামিয়া যাওয়া কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গতিশীল বাণিজ্যিক অর্থনীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লয়। মধ্যযুগের শেষাশেষি পশ্চিম ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগরের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই নগরগুলি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। আধুনিক যুগের শুরুতে এই নগরগুলিতে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। শিল্পকাজে শ্রমভেদ প্রথার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন কারিগরের কাজ একত্রিত করা, তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া, কাঁচামাল সংগ্রহ করা প্রভৃতির দায়িত্ব বণিক তথা শিল্পপতিরা গ্রহণ করিল। তাহারাই আবার কারিগরদের জিনিস ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। এই নূতন যুগকে বলা হয় পুঁজি সংগ্রহের যুগ।

এই যুগে ব্যাঙ্কিং প্রথার প্রচলন ঘটে। বড় বড় বণিকরা ছিলেন প্রথমে ব্যাঙ্কার বা অর্থলগ্নিকারী। তাহারা তাহাদের ব্যবসা হইতে পাওয়া লভ্যাংশ লগ্নি করিতে থাকিল এবং আরও ধনী হইল। সমাজে তাহারাই হইল শিরোমণি।

কৃষি ব্যবস্থায়ও নূতনত্ব দেখা দিয়াছিল। দেশের মধ্যে ছোট ছোট চাষীর উচ্ছেদ করিয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদের আবির্ভাব ঘটে। ইতিমধ্যে ভূমিদাস প্রথারও প্রায় অবসান ঘনাইয়া আসিল। এইসব পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সমাজে জন্মকৌলিন্যের বদলে অর্থকৌলিন্য স্থান পাইল। অর্থই সব কিছু বলিয়া অনেকে মনে করিল। ঈর্ষা, দাম্ভিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ঐহিক

তৃষ্ণা যেগুলিকে চার্চ এতদিন পাপ বলিয়া গণ্য করিত, সেগুলিই হইল নূতন অর্থ-নীতির ও সমাজনীতির চালিকাশক্তি। প্রার্থনা, উপবাস ও দীন আতুরকে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ধর্মীয় ধারণার বদলে নূতন সমাজের মানুষের আদর্শ হইল কঠোর পরিশ্রম, স্বার্থপরতা ও মুনাফা। ইহার বিরুদ্ধে চার্চ কিন্তু কিছুই করিল না। বরঞ্চ চার্চের কর্ণধার পোপ হইতে শুরু করিয়া মাঝারি ধর্মযাজকগণও ভোগস্পৃহায় মত্ত হইলেন। এই নূতন মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হইল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী। এই শ্রেণী অবশ্য পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ: পুরাতনকে ছাড়িয়া যখন একটি জাতি নূতনকে গ্রহণ করিয়া সঞ্জীবিত হয় তখন জাতির পক্ষে তাহা রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। রেনেসাঁসের প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল ইটালীতে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ইটালীকে এই সুযোগ দান করিয়াছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীদের হাতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে। তখন বহু গ্রীক ও রোমান পণ্ডিত তাঁহাদের অমূল্য পুঁথিপত্র লইয়া ইটালীর বিভিন্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইটালীর মানবতাবাদী পণ্ডিতগণ (humanists) এই সকল আশ্রয়প্রার্থীর সাহচর্যে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শন পড়িয়া স্বাধীন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁহাদের মনেও নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। সঙ্গে সংগে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা ও আনন্দ তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাহারা আর দৈবীলীলার বশংবদ হইয়া থাকিতে চাহিল না।

ভৌগোলিক আবিষ্কার: রেনেসাঁসের ফলে যে অনুসন্ধিৎসা ও উদ্দীপনার জন্ম হয় তাহা পশ্চিম ইউরোপবাসীদের নূতন নূতন অভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে আগ্রহী করিয়া তোলে। ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রবল আকাংক্ষাও অভিযানকারীদের মনে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করে। এই সময়কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রানী ইসাবেলার আনুকুল্যে ইটালীর জেনোয়া নিবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব আবিষ্কার, এবং ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দ্য গামা কর্তৃক ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার। ইহার পর ১৫১৯ ও ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাজেলান নামক অপর একজন দুঃসাহসী পর্তুগীজ নাবিক ও তাঁহার সহযাত্রিগণ ভূপ্রদক্ষিণ করেন।

পর্তুগাল ও স্পেন তাহাদের আবিষ্কৃত দেশগুলিতে একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার দাবি করিত। ইহাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়। তখন ধর্মগুরু পোপ আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া দেন। ইহার পূর্ব পার্শ্বে পর্তুগীজ ও পশ্চিম পার্শ্বে স্পেনীয়গণ একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। পর্তুগীজগণ ক্রমে আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুঠি স্থাপন করিয়া একটি বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। স্পেন ব্রেজিল বাদে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া সেখানকার ধনরত্ন আহরণ করিতে থাকে। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীগণ নবাবিষ্কৃত

অঞ্চলসমূহে পর্তুগাল ও স্পেনের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আমেরিকা ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয়। ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদের বহিষ্কার করিয়া কেপ অব গুড হোপ, সিংহল দ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার করে। উত্তর আমেরিকায়ও তাহারা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ফরাসীরা উত্তর আমেরিকাতে সেণ্ট লরেন্স ও মিসিসিপি নদীর তটভূমি আবিষ্কার করিয়া ফ্রান্সের অধিকারে আনয়ন করে। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষেও তাহারা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। এদিকে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর সাহায্য লইয়া ইটালীয় নাবিক কেবট ভ্রাতৃদ্বয় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজগণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছিল। ভারতবর্ষেও তাহারা কতকগুলি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বাণিজ্য জগতে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথ তখন প্রায় পরিত্যক্ত হইল। তাহার পরিবর্তে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের পথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। এই সময় হইতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে।

ধর্মসংস্কারের আন্দোলন ঃ ইটালী হইতে রেনেসাঁস আন্দোলন পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। হীব্রু ও গ্রীক ভাষার চর্চার ফলে তাহারা প্রাচীনতম বাইবেল পড়িবার সুযোগ পায়, এবং রোমান ক্যাথোলিক চার্চের দুর্নীতিগুলির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের শেষ দিকে স্বয়ং পোপ হইতে শুরু করিয়া সাধারণ ধর্মযাজক পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা অপেক্ষা অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠেন। অনেকে আবার সাধুজীবন যাপনের পরিবর্তে বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতেন। নিজেদের ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর নানারকমের কুসংস্কারের বোঝা চাপাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। এই সময় পোপ প্রচার করিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং কোন পাপী অনুতপ্ত হইয়া পোপের ভাণ্ডারে অর্থদান করিলে তিনি তাঁহাকে মুক্তিপত্র দান করিবেন। এইভাবে মুক্তিপত্র বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইল। সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিগণ ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন লুথার নামে একজন জার্মান জাতীয় ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। এই সময় তিনি শুধু বাইবেল পাঠের মাধ্যমে সকলকে ধর্মজীবন যাপনের জন্য আহবান করেন। জার্মানীতে তখন ধর্মসংস্কারের জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। পোপ দশম লিও ও পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ লুথারের বিচারের জন্য ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু জার্মানীর কয়েকজন রাজা লুথারকে সমর্থন করায় বিচার ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়।

জার্মানী হইতে এই ধর্মসংস্কারের আন্দোলন অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সুইজারল্যাণ্ডে ক্যালভিন ও জুইঙ্গলি, স্কটল্যাণ্ডে জন নকস্ প্রভৃতিও পোপের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করিয়া নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ক্যালভিনের অনুগামীরা "পবিত্রতাবাদী" (পিউরিট্যান) বলিয়া পরিচিত হন। সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপের বহু লোক ক্যালভিনের মতবাদ গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ধর্মের ভিত্তিতে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে "রিফরমেশন" বা ধর্মসংস্কারের প্রভাবে খ্রীস্টানগণ দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীনপন্থীরা ক্যাথোলিক আখ্যা ধারণ করেন এবং পোপের প্রতিবাদিগণ "প্রোটেস্ট্যান্ট" নামে পরিচিত হন। এই সময় হইতে বিভিন্ন মতবাদী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে ইহার অবসান হয়।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন : সামন্ত শক্তির পতন : আধুনিক যুগের ইউরোপ কতকগুলি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। দুই একটি বাদে ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত এবং রীতিনীতি; আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের শাসন সর্বত্র বিস্তারিত এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষাও সুনির্দিষ্ট। মধ্যযুগে এইরকম ছিল না। রাষ্ট্রের সীমা ছিল অনির্দিষ্ট; পরাক্রান্ত "নোবলস্" বা সামন্তগণ নিজ নিজ এলাকায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সুতরাং রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজার নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র। যুদ্ধের সময় সামন্তগণ তাঁহাকে নিজ নিজ এলাকা হইতে অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও পদাতিক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিত। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল। নোবলস্দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ব্যবসায়িগণ রাজার পক্ষ অবলম্বন করে। তাহাদের দেয় কর রাজশক্তির একটি প্রধান উৎস হইয়া দাঁড়ায়। জমিজমা হইতে আর ধনবৃদ্ধির আয় একমাত্র উৎস থাকিল না। ধনশালী হইয়া রাজারা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠনে সমর্থ হন, এবং গোলাবারুদ আবিষ্কারের ফলে এই সৈন্যবাহিনীকে কামান বন্দুকে সজ্জিত করেন। নোবলস্দের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাইল। অবশেষে রাজারা নোবলস্দের ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে অপসারণ করিয়া নিজেরাই বাধাহীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন একদিনে হয় নাই। ধীরে ধীরে ইহা ঘটিয়াছিল। এইভাবে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইংল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হইয়া উঠে। টিউডর যুগে সামন্তশক্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত ও বণিক শ্রেণীর সাহায্যে টিউডর নৃপতিগণ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। ফ্রান্সের ভেলয় বংশীয় রাজারা সমগ্র দেশকে রাজার কর্তৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সফল হন। ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার শাসনকালে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্পেন গড়িয়া উঠে। এই যুগেই স্পেনীয় নৌশক্তি ও নৌবাহিনীর বিকাশ ঘটে। ক্রমে ক্রমে ছোট বড় বহু ইউরোপীয় দেশ ষোড়শ শতকে রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা—অস্ট্রিয়া : মধ্য ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল অস্ট্রিয়া। আধুনিক যুগের প্রথম আড়াই শত বৎসরের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধ ছাড়াও ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য

আরও অনেকগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। কতকগুলি ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ইহাকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় নরপতি প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান (১৪৯৩-১৫১৯) পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে নির্বাচিত হইয়া জার্মানীতে আধিপত্যলাভ করেন। তিনি বারগেণ্ডির ও নেদারল্যাণ্ডের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মেরিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র ফিলিপের সহিত স্পেনীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার কন্যা জোয়ানের বিবাহ দিলেন। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপের হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চার্লস্‌ বারগাণ্ডি ও নেদারল্যাণ্ডের এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যু হইলে স্পেন ও ইটালীর অন্তর্গত নেপলস্‌ ও সিসিলি এবং স্পেনীয় আমেরিকান সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হইয়া বসেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকসিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি অস্ট্রিয়ার অধিকার লাভ করেন এবং একই বছর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদে বৃত হইয়া জার্মানীর উপরও আধিপত্যলাভ করিলেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইল। চার্লসের বাসনা ছিল ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি সম্পূর্ণ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের একচ্ছত্র অধিশ্বর হইবেন। কিন্তু ফ্রান্সের ভেলয় ও বুরবোঁবংশীয় রাজারা বংশানুক্রমে হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাইয়া যান।

স্পেন ঃ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস সিংহাসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনীয় সাম্রাজ্য ও নেদারল্যাণ্ডের রাজা হইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে চার্লসের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস তাঁহার ভ্রাতা ফার্ডিন্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরীর রাজপদে বৃত হন। চার্লসের সিংহাসন ত্যাগের পর তিনি পবিত্র রোমক সম্রাট বলিয়া নির্বাচিত হন। এদিকে ফিলিপ ইংলণ্ডের রানী মেরী টিউডরকে বিবাহ করিয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বের মাঝামাঝি তিনি পর্তুগাল দখল করিতে সমর্থ হন (১৫৮০ খ্রী) এইভাবে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথোলিক। এদিকে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ফিলিপ তাহাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করিলেন। ওলন্দাজগণ অসীম সাহসের সঙ্গে ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় লইয়া ফিলিপের সহিত প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের শাসনাধীন ইংলন্ডের বিবাদ বাধে। ইংলণ্ডকে সায়েস্তা করিবার জন্য ফিলিপ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্মাডা নামক বিখ্যাত নৌবহর পাঠাইলেন। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড় এবং ইংরেজ নৌসেনার কৌশলে আর্মাডা ধ্বংস হইয়া গেল। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপের দেহান্ত ঘটিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে স্পেন দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর থাকিলেও তাহার পূর্বেকার শক্তি, ঐশ্বর্য ও মর্যাদা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ফ্রান্সের উত্থান ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুঁরবো চতুর্থ হেনরী ও ত্রয়োদশ লুইএর অধীনে ফরাসী রাজশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার শেষ

পরিণতি হয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে (১৬৪৩-১৭১৫)। ইতিহাসে তিনি "গ্র্যান্ড মনার্ক" বলিয়া পরিচিত। এই সময় ফ্রান্স সর্ববিষয়ে ইউরোপের আদর্শস্থল বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বৈরাচারী রাজক্ষমতা তখন এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে চতুর্দশ লুই দাবি করিলেন তাঁহার ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত। এজন্য তিনি কাহারও নিকট দায়ী নন। রাজার সুখই প্রজার সুখ এই বিচিত্র ধারণা তিনি পোষণ করিতেন। স্পেনের পতন দেখা দিলে লুই ইউরোপে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি তাঁহার পৌত্র ফিলিপের স্পেনীয় সিংহাসনের দাবি লইয়া স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হইবে বলিয়া ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া প্রথম হইতেই লুই-এর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিল। স্পেনের উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধের সময় প্রাশিয়া, হ্যানোভার প্রভৃতিও লুই-এর বিরুদ্ধ পক্ষে যোগদান করে। ফ্রান্স এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধির দ্বারা এই রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ লুই-র মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র, পঞ্চদশ লুই নাম লইয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় ষাট বৎসর রাজত্ব করেন (১৭১৫—১৭৭৪)। তাঁহার রাজোচিত গুণাবলী বিশেষ কিছু ছিল না। অপরদিকে আড়ম্বরপ্রিয়তা ও বিলাসিতায় তাঁহার সমকক্ষ সেই যুগে ইউরোপের কোন রাজা ছিল না। এই পাপাচারী রাজার মৃত্যুর পনের বছরের মধ্যেই ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয়।

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার উত্থান ঃ প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ইউরোপীয় রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ সপ্তদশ শতাব্দীর অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রথম প্রশস্ত করিয়াছিলেন প্রথম ফ্রেডেরিক উইলিয়ম (১৬৪০-৮৮)। ইনি 'গ্রেট ইলেকটর" নামে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রেডেরিক রাজপদবী গ্রহণ করেন এবং পৌত্র দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন ও আর্থিক উন্নতি করিয়া প্রাশিয়ার জয়যাত্রার পথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক (১৭৪০-৮৬)-এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রাশিয়াকে জার্মানীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

রাশিয়াকে বহুকাল একটি প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইত। রোমানফ বংশীয় মহামতি পিটার (১৬৮২-১৭২৫) বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোট ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে সুইডেন এবং দক্ষিণে তুরস্ক—এই দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যকে পরাজিত করিয়া রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করেন।

অস্ট্রিয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮) ঃ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের কর্ণধার ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াসী হয়, এবং অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই যুদ্ধে নিজেদের জড়াইয়া ফেলে। ইংলণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয় এবং ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করে। এই যুদ্ধের সহিত ঈঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত থাকায় ইহা খুব জটিল আকার ধারণ করে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে একস্-লা-স্যাপেলের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ তৎকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। ইউরোপের অস্ট্রো-প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব এবং উপনিবেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সমাধান এই যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। ফলে এই চারিটি শক্তিই পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৎপর হইল। দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিপর্ব চলিয়াছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রস্তুতিপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে কূটনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে। ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড অস্ট্রিয়ার সহিত তাহার দীর্ঘ দিনের মৈত্রী ছিন্ন করিল এবং ফ্রান্স আবহমান কাল ধরিয়া যে অস্ট্রিয়া-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল তাহার অবসান ঘটাইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হইল।

১৭৬৩-এর গুরুত্ব ঃ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে একটি ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কূটনৈতিক বিপ্লবই এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থসংঘাত, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানীতে প্রাধান্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল এই যুদ্ধের আসল কারণ। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক স্যাক্সনী আক্রমণ করিলে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং অচিরেই আমেরিকা ও ভারতে ইহা প্রসারিত হয়। ইহাতে একদিকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ও স্যাক্সনী এবং অপর দিকে প্রাশিয়া ও ইংলণ্ড অংশ গ্রহণ করে। দীর্ঘ সাত বৎসর অবিরাম যুদ্ধ চলিবার পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি চুক্তির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। প্যারিসের চুক্তি (Treaty of Paris) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ইহাতে উপনিবেশ-সংক্রান্ত বিলি-ব্যবস্থা ছিল। হিউবার্টসবার্গের চুক্তি সম্পাদিত হয় অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও স্যাক্সনীর মধ্যে। প্রথমটির দ্বারা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের প্রভুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ১৭৬৩ বৎসরটি নানাদিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক, বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তাহার মীমাংসা হইল। ইংলণ্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া আমেরিকা ও ভারতে তাহার সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার পথ সুগম করিল। ফ্রান্সের পক্ষে এইসব অঞ্চলে তাহাকে বাধা দেওয়া আর সম্ভব হইল না। সামুদ্রিক ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড ফ্রান্সের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিল। জার্মানীতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের হিউবার্টসবার্গ-এর সন্ধি তাহার সমাধানের ইঙ্গিত দিল। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া সাইলেশিয়ার আশা ত্যাগ করিল অর্থাৎ প্রাশিয়ার শক্তি স্বীকৃত হইল। প্রাশিয়া যে জার্মানীতে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র তাহা প্রমাণিত হইল এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র জার্মানীতে এক নবযুগের সূচনা হইল। ফলে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য কমিয়া আসিতে থাকে এবং পরিশেষে অস্ট্রিয়াকে জার্মানী ছাড়িয়া চলিয়া

আসিতে হয়। মধ্য ইউরোপে সামরিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারও মীমাংসা হইল। প্রাশিয়া সামরিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারী হইল। সংক্ষেপে, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ ইউরোপে প্রাশিয়ার পূর্ণ অভ্যুদয় এবং উপনিবেশে ইংরেজশক্তির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধশেষে (১৭৬৩) ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে প্রথমেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা চোখে পড়ে।

ইংলণ্ড ঃ এই সময় হ্যানোভার বংশীয় রাজা তৃতীয় জর্জ ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা। তিনি খুবই ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। ফলে মন্ত্রিগণের সহিত অনেক সময়ে তাঁহার বিরোধ বাধিত। স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা স্থাপন করিবার জন্য তিনি উইলিয়াম পিট-এর ন্যায় মহাগণ-নায়ককে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করেন এবং বুট, নর্থ প্রভৃতির ন্যায় অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ফলে ইংলন্ডের রাজনীতিতে হুইগদলের আধিপত্যের অবসান ঘটে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ইউরোপ তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। প্যারিসের সন্ধির ফলে সে কানাডা, নোভাস্কোশিয়া, কেপ-ব্রিটন, গ্রেনেডা, টোবগো, সেন্ট ভিনসেন্ট, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ফ্লোরিডা প্রভৃতি অঞ্চল পাইল। ইংলণ্ড উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ফ্রান্স প্রমুখ অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করিতে সমর্থ হয়। আমেরিকা ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইল। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ ফ্রান্স তাহার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। আমেরিকা মহাদেশে ফরাসী-ভীতি দূরীভূত হইবার ফলে ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। তাহাছাড়া ইংলণ্ডের স্বার্থপর নীতির ফলে তাহার বন্ধু বলিয়া কেহ রহিল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় সে তাহার একমাত্র মিত্ররাষ্ট্র প্রাশিয়ার সমূহ বিপদের সময় প্রতিশ্রুত সাহায্য দেয় নাই। তাহার এইরূপ স্বার্থপর নীতির ফলে ইউরোপে ইংলণ্ডের বন্ধুরাষ্ট্র বলিয়া কেহ রহিল না। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইংলণ্ডের এই নিঃসহায় অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিব।

ফ্রান্স ঃ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন পঞ্চদশ লুই। তিনি কারণে-অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের ধনবল ও জনবল উভয়ই নষ্ট করিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাঁহার নজর ছিল না। ফ্রান্সের ভাগ্য অযোগ্য মন্ত্রীদের দ্বারাই নির্ধারিত হইতে থাকিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফ্রান্স। আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে সে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইল। এই সময় আমেরিকাস্থ ফরাসী সেনাপতি স্বীয় সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে ফ্রান্সের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে সমগ্র বাসস্থান যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছে তখন আস্তাবল রক্ষা করিবার চেষ্টা বৃথা। ইহা হইতে বুঝা যায় উপনিবেশগুলির প্রতি ফরাসী সরকারের কিরূপ মনোভাব ছিল। ফলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তিতে ফ্রান্সকে কানাডা

সমেত সমগ্র উত্তর আমেরিকা ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ভারতবর্ষেও তাহার অধীনে যে অঞ্চলগুলি থাকিল সেগুলি ইংরাজ-প্রভাবিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করিল। ইউরোপেও ফ্রান্স শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আর বিবেচিত হইল না। সংক্ষেপে, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্স ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা রহিল না। ইহার পর ইউরোপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র যেন পূর্বদিকে সরিয়া গেল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া—এই রাষ্ট্রত্রয় ইউরোপের রাজনীতি নির্ধারণ করিতে থাকিল। ফ্রান্স কেবলমাত্র দ্রষ্টা হইয়া রহিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড খণ্ডীকরণের ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনায় ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ পঞ্চদশ লুইর দুর্নীতিপূর্ণ এবং অকর্মণ্য শাসন ফ্রান্সে বিপ্লব ত্বরান্বিত করিল।

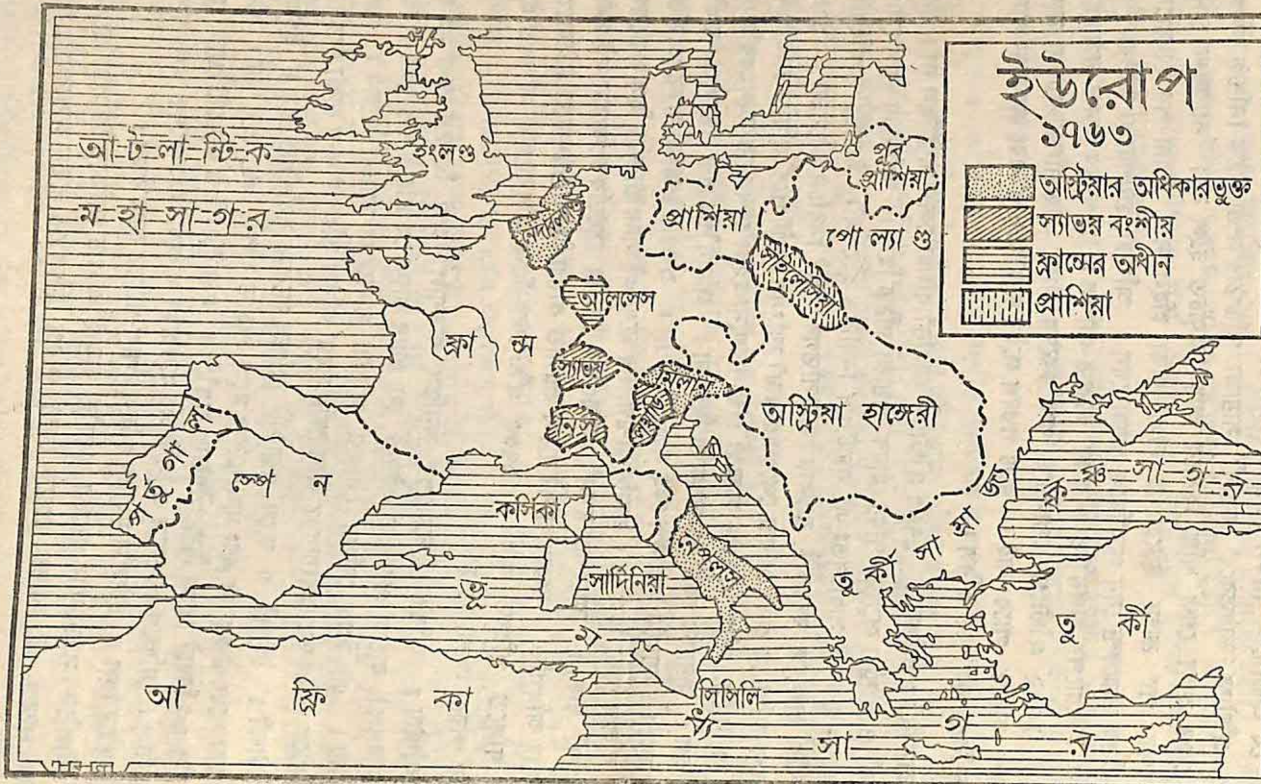
জার্মানী ঃ প্রাশিয়া ঃ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী বলিয়া কোন রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্র জার্মানী ও অস্ট্রিয়া জুড়িয়া পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের রাজারাই সাধারণতঃ এই সম্রাটপদে নির্বাচিত হইতেন। ইলেক্টর উপাধিধারী জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি রাজ্যের অধিপতিগণ সম্রাট নির্বাচন করিতেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রানী মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিস সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ যুগে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবলমাত্র নামে পর্যবসিত হইয়াছিল। সম্রাটের কোন শাসনক্ষমতা ছিল না। জার্মানীতে প্রায় তিনশত স্বাধীন রাজ্য ছিল। সম্রাটের হস্তক্ষেপ কেহ সহ্য করিত না। সুতরাং জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য বলিয়া কিছু ছিল না। জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই সময় প্রাশিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য। হোহেনজোলার্ন রাজবংশের দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ছিলেন এই সময়ে প্রাশিয়ার অধিপতি। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি প্রাশিয়াকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধিতে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

অস্ট্রিয়া ঃ অস্ট্রিয়া ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হইত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সে প্রমাণ করিল যে তাহার শক্তি তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই সময় মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়া সামাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়াকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন।

ইটালী ঃ ইটালী এ যুগে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের সমষ্টিমাত্র ছিল। ইটালী-বাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতি বলিয়া কিছু ছিল না। উত্তর ইটালীর এক বিরাট অঞ্চল ছিল অস্ট্রিয়ার অধীনে। মধ্য ইটালীতে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। দক্ষিণে নেপল্‌স ও সিসিলির যুক্তরাজ্য বুঁরবো রাজবংশের এক শাখার শাসনাধীনে ছিল। ইটালীর মধ্যভাগে ছিল পোপ-শাসিত রোম রাজ্য।

ইটালীতে সার্ডিনিয়ার স্যাভয় বংশীয় রাজাই একমাত্র জাতিতে ইটালীয় ছিলেন। ঊনিশ শতকে এই স্যাভয় বংশকে কেন্দ্র করিয়া ইটালীতে নূতন আশাবাদের সঞ্চার হইয়াছিল।

স্পেন ঃ স্পেনে বুঁরবো বংশই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাকে স্পেনীয় বুঁরোবা বংশ বলা হইত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয় এবং


ইউরোপ
১৭৬৩
অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত
স্যাভয় বংশীয়
ফ্রান্সের অধীন
প্রাশিয়া
আটলান্টিক মহাসাগর
ইংলণ্ড
প্রাশিয়া
পূর্ব প্রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
আলসেস
ফ্রান্স
স্যাভয়
মিলান
নিস
অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী
স্পেন
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
নেপলস
সিসিলি
তুর্কী সাম্রাজ্য
কৃষ্ণসাগর
তুর্কী
ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা

তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়: প্যারীর সন্ধির দ্বারা স্পেন হাভানা ও ফিলিপিনস্ ইংলণ্ডের নিকট হইতে অবশ্য ফিরিয়া পায়। তবে পর্তুগাল হইতে তাহাকে সৈন্য সরাইয়া লইতে হয় এবং যুদ্ধের সময় পর্তুগালে যে সব অঞ্চল স্পেন দখল করিয়াছিল সেগুলি পর্তুগালকে ফেরত দিতে হয়। স্পেনের গৌরব-সূর্য বহু পূর্বেই অস্তমিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাহার কোন মর্যাদা ছিল না। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চার্লস স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্পেনে বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনে সচেষ্ট হন।

রাশিয়া ঃ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়া প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পূর্ব প্রাশিয়া দখল করিয়া ব্রাণ্ডেনবুর্গেও প্রবেশ করে। জারিনা এলিজাবেথের হঠাৎ মৃত্যু না হইলে প্রাশিয়ার পক্ষে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধ প্রমাণ করিয়া দেয় ইউরোপীয় বিশেষতঃ পূর্ব ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া ক্যাথারিন নাম ধারণ করিয়া রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ কাল হইতে রাশিয়ার জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণ করিতে থাকে।

সুইডেন, ডেনমার্ক এবং হল্যাণ্ড ঃ এই তিনটি রাষ্ট্র একদা শক্তিশালী ছিল কিন্তু ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহারা দুর্বল রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড, প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের হস্তগত হয়।

পোল্যাণ্ড ঃ ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ইউরোপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। ইউরোপে তুর্কী অভিযানের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডই সর্বাপেক্ষা বেশী অন্তরায় ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহার দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৭৩৩ হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের সিংহাসন লইয়া এক ইউরোপীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ড এক আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হইলে এই সংগ্রাম আরও তীব্র হইল। রাশিয়া এই সময় পোল্যাণ্ডে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া নিজের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইহার পর রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া দুর্বল পোল্যাণ্ড রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয় (পোল্যাণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ ঃ ১৭৭২, ১৭৯৩, ১৭৯৫)। ফলে পোল্যাণ্ডের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

তুরস্ক সাম্রাজ্য—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ঃ এই অঞ্চলটি তুরস্কের অধীনে ছিল। একদা তুর্কী সাম্রাজ্য পরিব্যাপ্ত ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে, বর্তমানের রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস প্রভৃতি সকল বলকান রাজ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কীশক্তি নানা কারণে দুর্বল হইয়া পড়ে। রাশিয়া ইউরোপে তুরস্কের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। ফলে ইউরোপের ইতিহাসে তথাকথিত নিকটপ্রাচ্য সমস্যা দেখা দেয়।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ঃ রেনেসাঁর সূচনা হইতে যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা এবং বিজ্ঞানমুখী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানদীপ্তির যুগ প্রবর্তন করে। জ্ঞানদীপ্তির যুগকে বিচারের বা যুক্তির যুগও বলা যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা ছিল এই যুগের ভিত্তিভূমি। এই সময় চিন্তানায়কদের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য যাচাই করিয়া সত্যে পেঁছানই ছিল তাঁহাদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের রচনায় তৎকালীন সমাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠানবিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্তি সমকালীন রাজাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহাদের রাজকীয় ক্রিয়াকলাপে ইহার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা ধর্মীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ ফরাসী বিপ্লবের পঁচিশ বৎসর পূর্ববর্তী যুগটিকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন করা যায় যে হঠাৎ ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ একসঙ্গে জ্ঞানদীপ্ত ও প্রজাদরদী সংস্কারপন্থী হইয়া উঠিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র বংশগৌরব বৃদ্ধি ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র অটুট রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। এ কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রগৌরব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনে ব্রতী হন এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তবে তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের মতামতের উপর কোন মূল্য দিতেন না। ফলে তাঁহাদের প্রবর্তিত সংস্কারগুলি জনসাধারণ খোলা মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসন ইউরোপের কিরূপ রাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল ঃ প্রথমত, যেসব রাষ্ট্রে সামন্তপ্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লোপ পাইয়া রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল সেইসব দেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার বিশেষভাবে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যেসব দেশে নূতন মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিলেও এই শ্রেণীর এমন ক্ষমতা ছিল না যাহার ফলে তাহারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করিতে পারে সেরূপ দেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার দেখা দিয়াছিল। অর্থাৎ যে দেশে মধ্যবিত্ত ও বণিক শ্রেণী যত দুর্বল ছিল, সেই দেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ছিল তত প্রবল।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলি অন্য স্বৈরাচারের মধ্যে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না; যেমন ঃ—

সমকালীন দার্শনিক মতবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ঃ এই গুণটি তদানীন্তন প্রায় সকল স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাশিয়ার নৃপতি মহামতি দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক নিজেই সুলেখক ছিলেন, এবং সমসাময়িক দার্শনিকদের লেখা পড়িতে ও তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারকে (Voltaire) তিনি নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং বন্ধুর

ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের মধ্যে এই গুণটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি ঘোষণাই করিয়াছিলেন যে দর্শনশাস্ত্রই তাঁহার রাষ্ট্রনীতির নিয়ামক।

রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা ঃ এই যুগের শাসকবৃন্দ স্বৈরাচারী হইলেও রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা এক মহান্ আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। জনসাধারণের সেবা ও কল্যাণ সাধন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য—ইহা তাঁহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। ফ্রেডেরিক নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

চার্চবিরোধী নীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা ঃ এই সকল নৃপতিগণ সকলেই চার্চের ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই তখনও চার্চের ক্ষমতা ছিল। প্রায় প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংবাদপত্র চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। স্বভাবতই এই ক্ষমতা না কমাইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না। একারণে রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য জ্ঞানদীপ্ত নৃপতিগণ পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন।

শাসন সংস্কার ঃ প্রত্যেক জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী নৃপতি নিজ নিজ রাজ্যে নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন। বিচার বিভাগে তাঁহারা সংস্কার প্রবর্তন করেন ও দেশের আইন-সংহিতা প্রণয়ন করিবার ব্যবস্থা করেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নানারূপ পরিবর্তন আনয়ন করেন। নিজ নিজ রাজ্যে সামাজিক বৈষম্যগুলি দূর করিবার জন্যও তাঁহারা তৎপর হন এবং সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত করেন। তাঁহারা কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারের প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ এই সকল নৃপতিগণ প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যাহাতে প্রসার ঘটে তাহার জন্য চেষ্টা করেন। বন্দর নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, খাল খনন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁহারা দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ব্যর্থ হইল কেন ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ রাজ্য ও প্রজাবর্গের উন্নতি সাধনের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত, তাঁহারা সকলক্ষেত্রেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের মানসিক প্রাক্-প্রস্তুতির দিকে নজর দেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন কি প্রকারে প্রজাদের হিতসাধন হইবে তাহার একমাত্র বিচারক তাঁহারাই। এই কারণে তাঁহাদের প্রবর্তিত সংস্কারগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণ সন্দেহের ভাব পোষণ করিত। দ্বিতীয়ত, সংস্কারগুলি কার্যকর করিবার জন্য যেরূপ দক্ষ ও অনুগত সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল তাহা কোন দেশেই ছিল না। সমগ্র দেশে সংস্কারগুলি কার্যকর করা একা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তৃতীয়ত, জ্ঞানদীপ্ত

স্বৈরাচার একান্তভাবে নির্ভর করিত শাসকের ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর। কোন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণগুলি বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নাই। এই সকল কারণে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দ ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে সাধারণতঃ আমরা ফ্রেডেরিক দি গ্রেট, দ্বিতীয় যোসেফ ও ক্যাথারিন দি গ্রেটকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিন জনই কেবলমাত্র জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তদানীন্তন শাসকদের অনেকেই এই পর্যায়ে পড়েন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাও জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবের বাহিরে নহেন।

ফ্রেডেরিক দি গ্রেট (১৭৪০-১৭৮৬) ঃ প্রথম ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক—যিনি ইতিহাসে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট নামে প্রসিদ্ধ—প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৪০)। তাঁহার ৪৬ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল প্রাশিয়া তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

বাল্যকাল হইতেই ফ্রেডেরিক সাহিত্য-কলা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এইগুলি আবার তাঁহার পিতা ঘৃণা করিতেন। তিনি পুত্রের এই মনোবৃত্তিতে খুবই রুষ্ট হন এবং অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করিবার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এমন কি তিনি যুবক ফ্রেডেরিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত পুত্র ফ্রেডেরিক অবশ্য পিতার আদেশ শিরোধার্য করেন। তিনি শাসন ও সামরিক বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের সহিত জড়িত থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে স্থৈর্য ও সমন্বয় ঘটিয়াছিল অপরদিকে তিনি কূটনীতি ও রণচাতুর্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী সাহিত্যের খুব অনুরাগী। নাট্য, কলা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ সর্বজনবিদিত ছিল। সমসাময়িক চিন্তাধারার সহিত নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। সংক্ষেপে, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই তাঁহার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। শাসনকার্যের প্রতিটি বিষয়েই তিনি নিজেকে অবহিত রাখিতেন। প্রাশিয়ার স্বার্থকে তিনি সকল স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেন। রাজকীয় পদকে তিনি গৌরব, শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হিসাবে না ভাবিয়া ইহাকে দায়িত্বের ভিত্তি-ভূমি বলিয়া মনে করিতেন। একারণে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্যরূপে পরিচয় দিতেন।

অভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ পিতা প্রথম ফ্রেডেরিকের শাসনব্যবস্থাকে তিনি অধিকতর কার্যপ্রদরূপে গড়িয়া তুলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। তিনি কাহারও উপর দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সকাল ৫টা হইতে দৈনন্দিন রাজকার্য শুরু হইত এবং ইহা চলিত গভীর রাত্রি পর্যন্ত। শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি নীতি তিনিই নির্ধারণ করিতেন. রিপোর্ট পড়িতেন এবং সেইগুলির উত্তর দিতেন।

বিভিন্ন সংস্কার ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। অভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর তুলিয়া দেন এবং বেশ কয়েকটি সুদীর্ঘ খাল খনন করাইয়া অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। অপরদিকে রাজ্যের আর্থিক উন্নতি যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য আমদানীর উপর নানা বাধা নিষেধ আরোপ করেন। স্বল্পবিত্ত প্রজাদের শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি সরকারী ঋণের বন্দোবস্ত করেন।

বিচার ব্যবস্থার তিনি আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। সমগ্র রাজ্যে একই প্রকার বিচার-ব্যবস্থা যাহাতে প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় বিচারালয় স্থাপন করা হয় এবং রাজধানী বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বোচ্চ আদালত। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

যুক্তিবাদী দর্শনে প্রগাঢ় আস্থা থাকায় ফ্রেডেরিক তাঁহার প্রজাবর্গকে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করিবার অধিকার দান করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। শিক্ষার প্রসারে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং সরকারী উদ্যোগে প্রাশিয়ায় বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তিনি বার্লিনের বিজ্ঞান একাদামী পুনর্গঠন করেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ সিংহাসনারোহণকালে ফ্রেডেরিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথমত, প্রাশিয়া তখনও এক সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। তাহার ভৌগোলিক ঐক্য বলিয়া কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, জার্মানীতে হ্যানোভার ও অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্ররূপে বর্তমান ছিল। এই সমস্যাগুলির আশু সমাধানের জন্য তিনি যুদ্ধকেই প্রকৃত উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলেন। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলে একদিকে প্রাশিয়া যেমন সাইলেসিয়া লাভ করিল অপরদিকে এই যুদ্ধ প্রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপে আধিপত্যের স্থান প্রদান করিল। এই যুদ্ধের পর তিনি প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্রতী হন এবং দেশের নানাক্ষেত্রে প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওয়েস্টমিনস্টারের চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ঐ বৎসরই স্যাক্সনী আক্রমণ করিয়া সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের অবতারণা করেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভা প্রাশিয়াকে এই যুদ্ধে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করে। ইহার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি পশ্চিম প্রাশিয়া হস্তগত করেন। ফলে প্রাশিয়ার সহিত ব্রাণ্ডেনবার্গের সংযোগ সাধিত হইল এবং পূর্বে তাঁহার রাজ্যের যে ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না, ইহার দ্বারা সেই ঐক্য সম্ভব হইল। ফ্রেডেরিক তাঁহার শক্তিশালী পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা প্রাশিয়ার যে পরিমাণ আয়তন, সম্পদ, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা অনন্যসাধারণ। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ যখন ব্যাভেরিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করেন তখন ফ্রেডেরিক সর্বশক্তি দিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে অস্ট্রিয়া পুনরায় ব্যাভেরিয়া হস্তগত করিতে না পারে তাহার জন্য কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের সহযোগিতায় তিনি অস্ট্রিয়াবিরোধী এক রাষ্ট্রজোট গঠন করেন (১৭৮৫)।

প্রাশিয়ার উন্নতির মূলে ছিল ফ্রেডেরিকের দূরদর্শিতা, প্রগাঢ় রাজনৈতিক জ্ঞান এবং বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার দরুন প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় যোসেফ ঃ (১৭৬৫-১৭৮০ মাতার সহিত সহশাসক, ১৭৮০-১৭৯০ সম্রাট) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সমসাময়িক যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত দ্বিতীয় যোসেফ সগর্বে ঘোষণা করেন যে দর্শন শাস্ত্রই তাঁহার সাম্রাজ্যের বিধায়ক। কেবলমাত্র ঘোষণার মধ্যেই তিনি তাঁহার রাজকার্য সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। এই ঘোষণাকে রূপদান করিবার জন্য তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ দ্বিতীয় যোসেফ প্রবর্তিত প্রতিটি সংস্কার নিজ বৈশিষ্ট্যে মাধুর্যময় ছিল এবং জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের সমগ্র উদ্দেশ্যই ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বহুজাতি অধ্যুষিত, বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অনৈক্য দূর করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। তাঁহার এই ঈপ্সিত রাষ্ট্রে জাতিগত দ্বন্দ্ব বলিয়া কিছু থাকিবে না; ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে; বিচারে সমতা বিরাজ করিবে এবং সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্য থাকিবে না।

বিভিন্ন সংস্কার ঃ এই উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য যোসেফ বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করেন। প্রথমত, তিনি সাম্রাজ্যের জাতিনির্ভর পুরাতন বিভাগকে অবলুপ্ত করিয়া সাম্রাজ্যকে তেরটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশের শাসনভার একজন সামরিক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করেন। প্রদেশপাল বা গভর্নরের কাজ ছিল তাঁহার এলাকার মধ্যে আইন কার্যকর করা এবং কৃষককুলকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। যোসেফ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশকে কয়েকটি সার্কেলে এবং প্রত্যেকটি সার্কেলকে কয়েকটি টাউনশিপে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঞ্চলেই উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া একই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে ভাবগত ঐক্য আনিবার জন্য যোসেফ জার্মান ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। যোসেফ আশা করিয়াছিলেন যে একই রকম শাসন-ব্যবস্থা ও একটি রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যতাবোধ লোপ পাইবে।

জ্ঞানদীপ্ত মনোভাব ও যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত যোসেফ বিচার-ব্যবস্থা ও বিচারালয়গুলির সংস্কার সাধন করেন। নূতন যুগ ও চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রাচীন আইনগুলিকে নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করা হইল। রাজধানী ভিয়েনাতে সর্বোচ্চ আদালত এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপিত হইল। বিচারের ক্ষেত্রে অভিজাতদের বিশেষ সুবিধা লোপ করা হয়। বিচারের ক্ষেত্রে সমতা স্থাপন যোসেফের অক্ষয় কীর্তির অন্যতম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যোসেফ অভিজাতদের এবং যাজকদের করদানের অব্যাহতির ব্যবস্থা রহিত করেন। ইহা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের উন্নতিতে তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল।

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যোসেফের অবদান সর্বাধিক। তিনি ভূমিদাস প্রথা রহিত করিয়া কৃষকদের মুক্তি দেন এবং বেগার প্রথার জুলুম বন্ধ করেন। চাষীরা যাহাতে জমির মালিক হইতে পারে তাহার জন্যও আইনগত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যোসেফ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করেন।

যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতীক যোসেফ ধর্মযাজক তথা চার্চের ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্মীয় সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের ধর্ম ব্যবস্থায় পোপ এবং অন্যান্য যাজকদের ক্ষমতা দূর করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনটি অনুশাসন জারি করিয়া তিনি অস্ট্রিয়া হইতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পোপের প্রাধান্য লোপ করেন। ইহা ছাড়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সহনশীলতার নির্দেশ (Edict of toleration) ঘোষণা করিয়া ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাকে অবাধে নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার দেন। গোঁড়া ক্যাথলিকগণ অবশ্য তাঁহার এই নির্দেশের বিরোধিতা করিয়াছিল। যোসেফ কিন্তু তাঁহার ধর্মনীতির পরিবর্তন করেন নাই।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণেও যোসেফ অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। অস্ট্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করাই ছিল তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্য তিনি বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অস্ট্রিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত রাজ্যগুলি কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলির একত্রীকরণের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁহার এই প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ হওয়ায় ইহা কার্যকর হয় নাই। জার্মানীতে ব্যাভেরিয়া অধিকার করিতে না পারিয়া যোসেফ অস্ট্রিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর নজর দেন। এ বিষয়ে তিনি রাশিয়ার সাহায্য পাইলে সুবিধা হইবে বলিয়া রাশিয়ার সহিত একটি মিত্রতামূলক চুক্তিও সম্পাদিত করেন। এই চুক্তিতে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ইউরোপে তুরস্কের অধীনস্থ অঞ্চলগুলি ভাগাভাগি করিয়া লইবার কথা বলা হয়। রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যোসেফ কিন্তু কোন নূতন অঞ্চলই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার একক প্রাধান্যের বিরোধিতা করিয়া তিনি পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং পররাষ্ট্র নীতিতে যোসেফ বিশেষ কোনরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

ব্যর্থতা ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে যোসেফ ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার আদর্শ, চিন্তাধারা এবং প্রগতিশীল মন যুগের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ছিল যে তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা তাঁহার প্রজাবর্গের ছিল না। একারণে তাঁহার শুভ প্রচেষ্টার বিনিময়ে তাঁহাকে রাজ্যময় অশান্তি ও প্রজাদের অকৃতজ্ঞতার-সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। হয়ত একটু ধীরগামী হইলে অনেকগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন খুবই দ্রুতগতিতে—প্রথম পদক্ষেপ করিবার পূর্বেই তিনি দ্বিতীয় পদক্ষেপ করিয়া ফেলিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার সমাধির

উপর কি লেখা থাকিবে তাহাও তিনি ঠিক করিয়া যান। ইহাতে তাঁহার মনোবেদনা পরিস্ফুট হইয়াছে—"এই স্থানে এরূপ ব্যক্তি শায়িত রহিয়াছেন যিনি, যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতেই ব্যর্থ হইয়াছেন।" সময় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপলব্ধি না করাই যোসেফের ব্যর্থতার কারণ।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭৬২—১৭৯৬ খ্রীঃ) ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের তৃতীয় বৃহত্তম উর্বর ক্ষেত্র ছিল রাশিয়া। সপ্তদশ শতাব্দীতে পিটার দি গ্রেটের অসাধারণ কৃতিত্বে যে রাশিয়ায় পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে দ্বিতীয় ক্যাথারিন সেই রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ অভ্যন্তরীণ নীতিতে দ্বিতীয় ক্যাথারিন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ও দেদেরোর (Dederot)-এর সহিত তাঁহার নিয়মিত পত্রালাপ চলিত। রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় নানা মানবিক সংস্কার আনিয়া তিনি তাঁহার প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দেন। উদারনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রজাসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি স্থাপন করেন। দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য তিনি সমগ্র দেশটিকে ৪৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশের শাসনভার নিজের মনোনীত কর্মচারীর উপর দেন। তাঁহার নির্দেশ ছাড়া তাহারা কোন কাজ করিতে পারিত না।

ক্যাথারিনেরও ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। আবার স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া চার্চের অপ্রতিহত ক্ষমতা পছন্দ করিতেন না। স্বভাবত রাশিয়ায় চার্চের ক্ষমতা তিনি সঙ্কুচিত করেন। চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাশিয়ার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তিনি স্থাপন করেন।

ক্যাথারিনের পূর্বে রাশিয়ায় বিধিবদ্ধ আইনকানুন বলিয়া কিছু ছিল না। ইহার ফলে বিচারের নামে অহরহ প্রহসন চলিত। বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করিবার এবং দেশের প্রচলিত আইন-বিধি সংকলন এবং নূতন আইন প্রণয়নের জন্য তিনি একটি আইন কমিশন নিয়োগ করেন। অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায় ক্যাথারিন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী হাসপাতাল ও অধিক সংখ্যায় চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ক্যাথারিন নিজেই একজন সুলেখিকা ছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাদপদ হইয়া না থাকে সেজন্য তিনি চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজসভা ইউরোপের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির অন্যতম বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সময় তাঁহার আনুকূল্যে রুশ সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি ঘটে।

ক্যাথারিন রুশ-সমাজ-ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভূমিদাস প্রথা তুলিয়া দিবার কথা চিন্তা করেন কিন্তু তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে তাঁহার পক্ষে ইহা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য রাজকীয় খাস জমির ভূমিদাসদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি করিতে সক্ষম হন।

পররাষ্ট্র নীতি : দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রধানত তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত বৈদেশিক নীতির জন্য রাশিয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণের নীতি দ্বারা ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ক্যাথারিন তাহাকে সাফল্যময় সমাপ্তির দিকে লইয়া যান। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ শাসনকালে তিনি অনস্বীকার্যভাবে রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। কূটনীতিতে তিনি খুব পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির সার্থক রূপায়ণে বাধাস্বরূপ। এই কারণে তিনি এই চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থবিরোধের সুযোগ লইয়া নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করিয়াছিলেন। কখনো তিনি প্রাশিয়ার সহিত মিতালি করিয়া অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরোধিতা করেন, কখনো ইংলণ্ডের নীতির বিরোধিতা করিয়া ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট করেন।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন শুরুতেই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির প্রথম পদক্ষেপ হইল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ। ইহার দ্বারা তিনি ডুইনা এবং নিপার নদী পর্যন্ত রাশিয়ার সীমানা বিস্তৃত করেন। পোল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় ক্যাথারিন তুরস্কের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুসুক-কাইনার্ডজির (Kutchuk-Kainardji) সন্ধিতে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহার দ্বারা আজভ সাগর এবং কৃষ্ণ সাগরের তীরে রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। সর্বোপরি এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়া তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে কিনা দেখিবার অধিকার লাভ করে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক হইতে এই শর্তটি রাশিয়ার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ ইহার দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এইভাবে নিকট প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব হয়।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিন ক্রিমিয়া দখল করিয়া সেবাস্তপোলে নৌঘাটি স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ক সর্বত্র পরাজিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাসির (Jassy) সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তুরস্ক ক্রিমিয়া এবং ওচাকাফের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। ইহার পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সুযোগ লইয়া তিনি প্রাশিয়ার সহযোগিতায় পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিভাগ সম্পন্ন করেন। ইহার দ্বারা রাশিয়া পূর্ব পোল্যাণ্ড ও লিটিল রাশিয়া পায়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের তৃতীয় ও শেষ বিভাগের দ্বারা রাশিয়া ডুইনা ও গ্যালেসিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল লাভ করে।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানারূপ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তিনি জ্ঞানদীপ্তির পরিচয় দেন। তাঁহার অভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় শৃংখলা ও সংহতি স্থাপিত হয়। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার চেষ্টার ফলে রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী নৃপতিগণ

স্পেনের চতুর্থ ফার্ডিনান্ড ও তৃতীয় চার্লস উভয়েই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ফার্ডিনান্ড চার্চের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন এবং ইহাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে সমর্থ হন। অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৃতীয় চার্লস স্পেনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। দেশের আইনকানুন বিধিবন্ধ করা হয়। জমিদারদের সম্পর্কিত বিচারক্ষমতা নষ্ট করিয়া রাজকীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

পর্তুগালের রাজা প্রথম যোসেফও একজন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রথমেই ধর্মসংস্কারে মনোযোগী হন এবং পোপের আধিপত্য ও গোঁড়াধর্মের অত্যাচার বন্ধ করিয়া পরধর্ম-সহনশীলতার পরিচয় দেন। দেশে শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করিয়া তুলেন। সামাজিক অব্যবস্থা ও কুসংস্কারগুলি দূর করিবার জন্যও চেষ্টা করেন। পর্তুগাল হইতে তিনি দাসপ্রথা তুলিয়া দেন।

ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রেও এইযুগে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের দেখা মেলে। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার চার্লস এমানুয়েল, টাসকানির প্রথম লিওপোল্ড, নেপলসের ডন কার্লোস্ এবং চতুর্থ ফ্রেডেরিক এবং পার্মার ফার্ডিনান্ড ছিলেন জানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে নানারূপ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের ধারা ইংলন্ড ও ফ্রান্সে প্রবাহিত হয় নাই। ইহার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। এই দুইটি দেশে মধ্যবিত্ত ও বণিক-শ্রেণী ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যে সামাজিক পরিবেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব, উভয় রাষ্ট্রেই সে পরিবেশ বর্তমান ছিল না। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ প্রকৃত রাজা হইয়া স্বহস্তে প্রজাপালনের দায়িত্ব লইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হুইগ দলের হস্তে শাসনক্ষমতা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। ফলে ইংলণ্ডে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। এযুগে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এরূপ স্তরে পৌঁছাইয়াছিল যাহার ফলে সেখানে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার স্থাপনের উপায় ছিল না। ফ্রান্সের শক্তিশালী বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। তাহারা স্বৈরতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বৈরাচারী বুঁরবো রাজবংশ কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়িতে চাহিল না। পরে বিপ্লবের দ্বারা ফরাসী দেশের সমস্যার সমাধান হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় | শিল্প-বিপ্লব

শিল্পবিপ্লব কাহাকে বলে এবং কথাটির সার্থকতা—ইংলণ্ডে প্রথম দেখা দিবার কারণ, যান্ত্রিক আবিষ্কার, বাষ্পশক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, পথঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতি, ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প বিপ্লব, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিই ছিল মানুষের সম্বল। শিল্পগুলি ছিল মূলতঃ কুটির শিল্প। এই কুটির শিল্পজাত পণ্যের বাজার ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগের ফলে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনকে শিল্প-বিপ্লব নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শিল্প-বিপ্লব কথাটির সার্থকতা ঃ শিল্প-বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আকস্মিক ও চমকপ্রদ ভাবে দেখা দেয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনেকে ইহাকে শিল্প-বিপ্লব না বলিয়া শিল্পে ক্রমবিকাশ (Industrial Evolution) বলিয়াছেন। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনটি ধীরে ধীরে দেখা দিলেও ইহার সামগ্রিক প্রভাব অর্থনীতি, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহাকে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব বলা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত।

ইংলণ্ড প্রথম দেখা দিবার কারণ ঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল—কাঁচামাল, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বিস্তৃত বাজার এবং মূলধন। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রথম দেখা দেয়, কারণ—ইংলণ্ডের এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই অভাব হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অধীনে অনেক উপনিবেশ ছিল। সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষই তাহার কুক্ষিগত হইয়াছিল। অতএব এই সকল দেশ হইতে ইংলণ্ড প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল পাইত। আবার এই অঞ্চলে তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাহার উৎপাদিত জিনিসগুলি এখানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের মূলধনেরও অভাব হয় নাই। ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া যে অর্থ ও সম্পদ সঞ্চিত ছিল তাহা ইংলণ্ডের শোষণের ও লুণ্ঠনের ফলে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া গেল। এই অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ড শিল্পবিপ্লবের পথে সর্বাগ্রে অগ্রসর হইল। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের অনেক কৃষিভূমি চারণভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল ভূমিহীন কর্মপ্রার্থী বেকার কৃষক। শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলে ইহারা শ্রমিক বাহিনীতে পরিণত হইল। সস্তায় প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়ায় ইংলণ্ড শিল্পে অগ্রসর হইল। ইংলণ্ডের খনিজ সম্পদ (কয়লা ও লোহা) শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হইয়াছিল। তাহার প্রাকৃতিক বন্দর ও দেশের অভ্যন্তরে যাইবার জন্য অসংখ্য খাল, খাড়ি প্রভৃতি থাকিবার ফলে শিল্পজাত দ্রব্য অল্পায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া সহজ ছিল। এই সব কারণে ইংলণ্ডেই শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল।

যান্ত্রিক আবিষ্কার ঃ এদিকে বয়নশিল্পে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে বিরাট পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল এবং ইংলণ্ডের প্রধান কুটির শিল্প নষ্ট হইয়া গেল। সর্বপ্রথম জন কী (Key) নামক এক ব্যক্তি এক উন্নত প্রকারের মাকু আবিষ্কার করেন যাহার ফলে বয়নকার্য দ্রুততার সহিত সম্পাদিত হইত। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জেমস হরগ্রিভ্স্ নামক এক তাঁতী একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া নাম দেন স্পিনিং জেনি। এই যন্ত্রে এক সঙ্গে আটগাছা সুতা কাটা যাইত। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড আর্করাইট আবিষ্কার করিলেন ওয়াটার ফ্রেম। ইহাতে সুতা কাটিবার কার্যে জলশক্তি ব্যবহার করা হইল। ১৭৭৬-এ ক্রমটন আবিষ্কার করিলেন 'মিউল'। ইহার ফলে সুতা উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া বয়ন ক্ষমতাকে উন্নতির দিকে লইয়া গেল। সর্বশেষে কার্টরাইটের আবিষ্কৃত পাওয়ার লুম বয়ন-পদ্ধতি আরও সহজ ও দ্রুততর করিল। এই সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইবার ফলে বস্ত্র বয়নশিল্পে যুগান্তর আসিল। অল্প শ্রমে শীঘ্র এবং সস্তায় প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হইতে লাগিল এবং বিশ্বের বাজারে ইংলণ্ডের উৎপাদিত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল।

বাষ্পশক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ঃ উপরিউক্ত যন্ত্রগুলি একজনে চালাইতে পারিত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিজ্ঞানিগণ বাষ্পশক্তি-চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টমাস নিউকোমেন প্রথম বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন। ইহার পর জেমস্ ওয়াট নিউকোমেনের ইঞ্জিনের দোষগুলি দূর করিয়া উন্নত ধরনের একটি ইঞ্জিন উদ্ভাবন করিলেন। ফলে অল্প খরচে অনেক বেশি দ্রুততার সহিত কল চালান সম্ভব হইল। শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক বাষ্প-ইঞ্জিনশক্তির প্রয়োগ যান্ত্রিক যুগের সূচনা করিল। এদিকে নূতন যন্ত্রগুলি নির্মাণের জন্য প্রচুর লোহা ও কয়লার প্রয়োজন হইল। এই সময় রোবক্, কর্ট, ডার্বিস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লৌহ-শিল্পেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। কয়লার খনির কাজও বৃদ্ধি পাইল এবং কয়লা উত্তোলনের জন্য নানাবিধ যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভি-র আবিষ্কৃত সেফটি ল্যাম্পের ব্যবহারের দ্বারা খনিগর্ভে দুর্ঘটনা এড়াইয়া কাজ করা সহজতর হয়।

পথঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঃ পূর্বে ইংলণ্ডে যাতায়াতের ভাল রাস্তা ছিল না। অথচ কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের বাজারে পাঠাইবার সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল। এজন্য উত্তম পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এই সময় টেলফোর্ড ও ম্যাকঅ্যাডাম নামক দুইজন ইঞ্জিনিয়ার পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা আলকাতরা ও পাথরের টুকরা মিশাইয়া রাস্তা নির্মাণের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাহা অনুসরণ করিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু ভাল রাস্তা নির্মিত হইল এবং দেশের অভ্যন্তরে মালপত্র পরিবহণের কার্য সহজ ও সুলভ হইল। এই সময় জলপথে সস্তায় মাল পরিবহণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার জেমস্ ব্রিন্ডলি চমৎকার খাল খননের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই সমুদ্রগামী স্টীমার নির্মিত হইল এবং ইহার ফলে দেশ-বিদেশে সুলভে মাল প্রেরণ করার সুবিধা হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম স্টীমার নির্মিত হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ফালটন সাফল্যের সহিত প্রথম বাষ্পীয়

পোত নির্মাণ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাতায়াত ও মাল বহনের নিমিত্ত নিয়মিত স্টীমার চলাচল শুরু হয়।

যখন বিজ্ঞানীগণ বাষ্পীয় পোত নির্মাণ ও উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন রেল ইঞ্জিন নির্মাণের চেষ্টাও চলিতেছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেলগাড়ীর প্রাথমিক স্তর অতিক্রান্ত হইল উইলিয়ম হেডলি'র 'পাফিং বিলি'-র দ্বারা। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টিফেনসনের রেল ইঞ্জিন 'রকেট' চলিতে সক্ষম হইল। অল্পকাল মধ্যেই দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় যুগান্তর আসিল।

কৃষির ক্ষেত্রে ঃ এই সময়ে শিল্পের ন্যায় কৃষিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পূর্বে একখণ্ড জমিতে দুই বৎসর শস্য উৎপাদন করিয়া তৃতীয় বৎসর সার সঞ্চিত করিবার জন্য উহা পতিত রাখা হইত। এই ব্যবস্থায় প্রতি তিন বৎসরে এক বৎসরের ফসল নষ্ট হইত। এখন জানা গেল যে মূলের (root) আবাদ করিলে ভূমির উর্বরতা নষ্ট না করিয়া ফসল জন্মান যাইতে পারে, অথচ এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখিতে হয় না। অধিকন্তু গো, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু শীতকালে ঐ মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে। কথিত আছে ইংলণ্ডের মন্ত্রী টাউনসেণ্ড এই প্রকারে কৃষির উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই সময় বেক্‌ওয়েল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় গৃহপালিত পশুর সংমিশ্রণে উন্নত শ্রেণীর গো-মেষাদি উৎপাদিত হইতে লাগিল।

পূর্বে দেশের অনেক জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত ; সাধারণ লোকে ঐ জমিতে গরু, মেষ প্রভৃতি পশু চরাইত। এখন অধিকাংশ পতিত জমিই আবাদ হইয়া গেল। বহু অর্থ ব্যয়ে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল জমি হইতে বহু পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হইতে লাগিল। এই সময় জমির উৎপাদন শক্তি পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকার্য ক্রমেই অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া উঠিল বলিয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকগণ ক্রমশঃ নিঃস্ব ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেকে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ লইয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প-বিপ্লব ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব প্রসারলাভ করে। এই সব দেশের শিল্পোন্নতির প্রাথমিক যুগে অবশ্য ইংরাজ পরিচালক এবং ইংলণ্ডের মূলধনের ভূমিকা ছিল। বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ তৈয়ারী হয় ইংরেজদের সাহায্যে। তবে ফ্রান্সের পুঁজি খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। ফলে ফ্রান্সে শিল্প প্রসার খুব দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লোহ ও ইস্পাত শিল্পে জার্মানী খুবই উন্নতি করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণা আসে ইংলণ্ড হইতে। এখানে শিল্প-বিপ্লব একটু বিলম্বে শুরু হইলেও ইহার গতি তীব্রতর ছিল। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে নূতন নূতন কারখানা ও রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তাহার পশ্চিমাঞ্চলের অনধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। কালক্রমে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র তাহার শিল্পের বাজারকে রক্ষা করিবার জন্য এক নীতি ঘোষণা করে (মুনরো নীতি)। পরবর্তীকালে শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলের সহিত দক্ষিণাঞ্চলের যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাহার মূলে ছিল শিল্পবিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক প্রশ্ন।

সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতিতে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব ঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে ইংলন্ডের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শিল্প-বিপ্লব না ঘটিলে ইংলন্ডের পক্ষে বিশ্বের বাজারে সস্তার প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব হইত না। এই বিপ্লবের ফলেই উত্তর ইংলণ্ডের জনবিহীন প্রান্তরে বড় বড় শহর গড়িয়া উঠে; বিরাট বিরাট কারখানার উদ্ভব হয়। ইহার ফলে ইংলণ্ডে শহর-ভিত্তিক সভ্যতা শুরু হয়। সংক্ষেপে, কৃষি-প্রধান ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে সাধারণভাবে ব্যক্তি-মানুষের জীবন অনায়াসসাধ্য হইল। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যের ফলে হইল জীবনযাত্রার মান উন্নত। সাধারণ মানুষ পূর্বে যেগুলিকে বিলাস দ্রব্য হিসাবে মনে করিত সেগুলি এখন হইল তাহাদের আয়ত্তাধীন। সুতরাং শিল্প-বিপ্লব মানব-সভ্যতাকে স্থাপন করিল প্রগতির পথে।

শিল্প-বিপ্লব কেবলমাত্র প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিই পুষ্টি করে নাই, জনসাধারণের জীবনে অশেষ দুঃখ-কষ্ট লইয়া আসে। ইংলণ্ডে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন হইবার ফলে বহু ছোট ছোট জোতদার নিজেদের জমিজমা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা দিন মজুরে পরিণত হয়। বিত্তশালী লোকেরা এই সকল জমি ক্রয় করিয়া বড় বড় খামার স্থাপন করে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ-আবাদ করাইতে থাকে। কিছু সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক এই সকল ক্ষেত-খামারে মজুরের কাজ পাইল; কিন্তু অধিকাংশই বেকার হইয়া পড়িল। এই সব বেকার কৃষকগণ উপার্জনের আশায় দলে দলে শহরের কারখানায় কাজ পাইবার জন্য জমা হইতে লাগিল। এদিকে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের চাহিদা অল্প ছিল। সুযোগ বুঝিয়া কারখানার মালিকগণ অল্প মজুরিতে ইহাদের কারখানায় বেশি খাটাইয়া প্রচুর লাভ করিত। আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিতে মজুরদের কাজ করিবার নির্দিষ্ট সময় বলিয়া কিছু ছিল না; ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যাও ছিল অনেক। কারণ ইহাদের আরও অল্প মজুরিতে নিয়োগ করার সুবিধা ছিল। এরূপ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রমিকরা যাহা রোজগার করিত তাহাতে দুই বেলা পেট ভরিয়া আহারও তাহাদের জুটিত না। আবার কারখানার নিকটেই তাহাদের ছোট ছোট নোংরা ঘর লইয়া বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল হাড়ভাঙা খাটুনি, খাদ্যাভাব ও অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করিবার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য যেমন ভাঙিয়া পড়িল, তেমনি তাহাদের নৈতিক অবনতিও ঘটিল। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। কিন্তু প্রতিকারের পথ তখন তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। মালিকদের শর্তে অল্প মজুরিতে কাজ না করিলে তাহাদের উপবাস করিয়া মরিতে হইত। মালিকরা মজুরদের সুখ-দুঃখের কথা মোটেই চিন্তা করিত না; তাহারা লাভের অঙ্ক লইয়াই চিন্তা করিত। অতএব শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশের অপরিমিত সম্পদ মুষ্টিমেয়

ধনিক শ্রেণীর হাতে আসিয়া জমিতে লাগিল। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অর্থশালী হইয়া ক্রমশঃ আরও অর্থশালী হইতে থাকিল ; আর অপর দল যাহারা দেশের শতকরা নব্বুই ভাগ. তাহারা উত্তরোত্তর নিঃস্ব হইতে থাকিল। এইভাবে সমাজে মালিক ও শ্রমিক এই দুই পরস্পরবিরোধী দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল। ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিল।

রাজনৈতিক ঃ ইংলণ্ডে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রথমে ধ্বংসাত্মক পন্থায় প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রমিকগণ মনে করিয়াছিল যে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী কারখানার যন্ত্রপাতিগুলি। এইকারণে তাহারা দলবদ্ধভাবে কলকারখানা ভাঙিতে মনস্থ করে। ইতিহাসে ইহা **লুডাইট দাঙ্গা-হাঙ্গামা** (Luddite Riots) বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে কলকারখানাগুলির কোন দোষ নাই, কলকারখানার যাহারা মালিক তাহারাই দোষী। এই মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তাহারা অনুভব করিল। কিন্তু তৎকালীন ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যগ্র ছিল বলিয়া শ্রমিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের 'Combination Act' শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা পার্লামেণ্টের মাধ্যমেও কিছুই করিতে পারিত না কারণ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে তাহাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ থাকিল না। শ্রমিক শ্রেণী সুসংগঠিত হইল। শাসকশ্রেণী ইহাতে ভীত হইয়া পড়িল। ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ান গঠন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের এক আইন দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল (১৮২৫ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পরে পার্লামেণ্ট কয়েকটি কারখানার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়। নয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইল। এই সঙ্গে কারখানায় কাজের ঘণ্টাও নির্দিষ্ট করা হইল। নারীদের খনিগর্ভে কাজ করা বন্ধ হয় এবং তাহাদের জন্য কারখানায় কার্যকাল ১০ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ইংলণ্ডের ন্যায় ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সংস্কারের জন্য আন্দোলন দেখা দিল। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে নূতন নূতন শহর হইয়াছিল। আবার বহু পুরাতন শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ম্যাঞ্চেস্টার, সেফিল্ড, লীডস, বার্মিংহাম প্রভৃতি শহরগুলির একজন প্রতিনিধিরও নির্বাচনের অধিকার ছিল না। কোনও কোনও শহরে ভোটদাতার সংখ্যা এত অল্প ছিল যে ধনী ব্যক্তিরা অনায়াসে অর্থ দিয়া তাহাদের ভোট কিনিয়া লইতেন। একারণে পার্লামেণ্টে ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরাও এই সময় দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে উদ্গ্রীব হইল। শ্রমিক শ্রেণীরা মনে করিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাহারাও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইল। ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহাতে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী মোটেই লাভবান হয় নাই। নানাপ্রকার সম্পত্তিগত ও বাসস্থানগত অজুহাত দেখাইয়া শ্রমিক শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। তবে পুরাতন পার্লামেণ্টের স্বরূপ কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় আর বেশিদিন শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত

রাখা সম্ভব হইল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রমিক শ্রেণী তীব্র আন্দোলনের পর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করিয়াছিল।

সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয় তাহারই ফলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া জাতীয় সম্পদ সাধারণের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে অসাম্য দূর হয় এবং সকলে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। শ্রমিক শ্রেণী এই চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হইল কারণ সমাজতন্ত্রবাদই অসংখ্য শ্রমিকের শ্রমকে আসল উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করে এবং প্রচার করে যে, শ্রমিক শ্রেণীর হস্তেই যেদিন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বর্তাইবে সেদিন শিল্প-বিপ্লব প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

ঔপনিবেশিক নীতিতে পরিবর্তন ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। পূর্বে উপনিবেশগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত লুটতরাজের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা হইত। এখন এগুলিকে কাঁচামালের যোগানদার এবং শিল্পপণ্যের বিক্রয়স্থলরূপে গণ্য করা হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় সেই সকল দেশগুলির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার লইয়া শুরু হইল প্রতিযোগিতা। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বহু বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হইলেও ইহা স্থিতিশীল মানব-সভ্যতাকে গতিশীল করিয়াছে এবং ব্যক্তি-মানুষের জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্ন উপকরণ লইয়া আসিয়াছে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি; বিভিন্ন কারণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের কারণ, যুদ্ধের ফলাফল।

পটভূমি ঃ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর নূতন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে প্রধানতঃ স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই মহাদেশের উত্তরভাগ কিন্তু অনধিকৃত থাকিয়া যায়। এই সুযোগ আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে একটির পর একটি ইংরাজ উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। মোট সংখ্যা অনুসারে



ইহারা ত্রয়োদশ উপনিবেশ নামে পরিচিত। এগুলি যথাক্রমে হইল ভার্জিনিয়া, উত্তর কেরোলিনা, দক্ষিণ কেরোলিনা, পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্ক, নিউহাম্পসায়ার, ম্যাসাচু-সেটস; কনেকটিকাট, রোডসদ্বীপ, নিউ জার্সি, দেলোয়ার, মেরীল্যাণ্ড ও জর্জিয়া।

প্রথম উপনিবেশ ভার্জিনিয়া স্থাপিত হয় ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং সর্বশেষে স্থাপিত হয় জর্জিয়া (১৭১২)। এই উপনিবেশগুলি একই ছাঁচে গড়িয়া উঠে নাই। দক্ষিণে অবস্থিত ভার্জিনিয়া ও কেরোলিনা ছিল কৃষিপ্রধান। আফ্রিকা হইতে নিগ্রো দাসদের সাহায্যে এখানে চাষ-আবাদ শুরু করা হয়। স্বভাবতই এ অঞ্চলে জমি-নির্ভর আভিজাত্য দেখা দেয়। কিন্তু উত্তরের উপনিবেশগলিতে স্বাধীন ছোট চাষীর সংখ্যা অধিক ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্পপ্রবণতা ছিল অধিক শক্তিশালী। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মনোভাবও দানা বাঁধিয়াছিল। এই উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইংরাজ। তবে কিছু সংখ্যক ওলন্দাজ, আইরিশ, সুইডিশ, জার্মান, ফরাসী, স্পেনীয়, ইটালীয় ও পোর্তুগীজও ছিল। ইহারা কিন্তু ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিল। ফলে ত্রয়োদশ উপনিবেশে কালক্রমে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদ্ভব-ঘটে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ: পরস্পর হইতে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন থাকিলেও উপনিবেশগুলির মধ্যে ঐক্যভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ঐক্যভাব গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন শক্তি সাহায্য করিয়াছিল। প্রথমত, পরস্পরের মধ্যে ডাকচলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ধীরে ধীরে চিঠিপত্র, সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা আদান-প্রদানের মাধ্যমে উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ভাবগত ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র থাকিলেও একই ধাঁচের ছিল। প্রতিটি উপনিবেশে ইংলণ্ড-রাজ কর্তৃক একজন গভর্ণর নিযুক্ত হইতেন, তবে প্রকৃত ক্ষমতা থাকিত কলোনির নির্বাচিত আইনসভার হাতে। আইনসভার সিদ্ধান্ত ইংরাজ সরকার নাকচ করিতে পারিত সন্দেহ নাই কিন্তু তিন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইংলণ্ডের পক্ষে সদাসর্বদা উপনিবেশ শাসনে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। কালক্রমে ত্রয়োদশ উপনিবেশের অধিবাসিগণও সেই সব অধিকার ভোগে অভ্যস্ত হইয়া উঠে যেসব অধিকার ইংলণ্ডের জনগণ একে একে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করিয়াছিল। স্বায়ত্তশাসন ছিল এই উপনিবেশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরাতন জগতের আর্থিক দুরবস্থা, ধর্মান্ধতার অত্যাচার, অন্ধ সমাজের হাজার রকমের বন্ধন প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে অনুপস্থিত ছিল। নূতন জীবন গঠনের উদ্দীপনায় তাহারা ছিল ব্যস্ত। প্রাকৃতিক বাধা অপসারণ করা ছিল তাহাদের নিকট রোমাঞ্চকর অভিযানস্বরূপ। ইহার ফলে উপনিবেশগুলি ইংরাজ না হইয়া ক্রমশই 'আমেরিকান' হইয়া উঠিল এবং ইংলণ্ডের প্রতিপক্ষরূপে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল।

ইংলণ্ড উপনিবেশগুলির শিল্প-বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছিল। এইগুলি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হয়। উপনিবেশগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্য ইংলণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিত। ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে এরূপ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিবার অধিকার উপনিবেশগুলির ছিল না। ইস্পাত, উলজাত দ্রব্য, টুপী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য উপনিবেশবাসীরা নিজেদের কারখানায় উৎপন্ন করিতে পারিত না; এগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে হইত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি হইত তাহা প্রথমে ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইত এবং পরে সেখান

হইতে উপনিবেশগুলিতে যাইত। ইহাতে ঐসকল দ্রব্যের মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইত। আবার উপনিবেশগুলি হইতে তামাক ও তুলা কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই পাঠাইতে হইত, সরাসরি অপর কোন দেশে পাঠান যাইত না। ইহা ছাড়া উপনিবেশগুলির উপর নৌ-আইন (Navigation Act) বলবৎ থাকায় অপরাপর দেশের জাহাজে বোঝাই করিয়া উপনিবেশগুলির পণ্য রপ্তানির পথ বন্ধ ছিল। এই সব বাধা-নিষেধের ফলে উপনিবেশগুলিতে শিল্প গড়িয়া উঠিবার কোন উপায় ছিল না। ফলে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) আমেরিকায় ফরাসীদের ইংলণ্ডের হাতে পরাজয় ঘটে। ইংলণ্ড কানাডা দখল করিয়া লয়। কানাডা ইংলণ্ডের হস্তগত হওয়ায় ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে পরিবর্তন সূচিত হয়। এতদিন কানাডা হইতে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে তাহারা ভীত ছিল এবং একারণেই তাহারা ইংলণ্ডের উপর এতদিন নির্ভরশীল ছিল। তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ যে বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছিল তাহারা নীরবে সহ্য করিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তির পর ফরাসীভীতি যখন দূর হইল তখন ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব তাহাদের নিকট অসহ্য মনে হইল এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, যেদিন ইংরেজ সেনাপতি উলফ্ (Wolfe) আব্রাহাম পাহাড়ের শিখরের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া কানাডা জয় করিয়া লইলেন, সেদিন হইতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হইল।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে যখন এরূপ পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ উপনিবেশগুলির উপর কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ফলে উভয় পক্ষে বিরোধ শুরু হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখা দেয় নাই। ইহার কারণ হইল তাহারা ইংরাজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত কোন করকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করে নাই এবং তাহারা করগুলি না দিলেও ইংলণ্ড কিছু মনে করিত না। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ডের বহু ঋণ হইয়াছিল। আমেরিকায় অবস্থিত সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা ইংলণ্ডের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। অথচ উপনিবেশ-গুলিকে ফ্রান্স ও স্পেনের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর ও সামরিক বাহিনী আমেরিকায় রাখা আবশ্যক বলিয়া ইংরেজ সরকার মনে করিল। আর ইহার জন্য যা ব্যয় হইবে তাহা উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতে করের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লইল। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ এবং তাঁহার সরকার আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লইলেন এবং উপনিবেশবাসীদের তথায় বসতি স্থাপনের অধিকার নাই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহারা অ্যালিঘেনি পর্বতমালা পার হইয়া ঐ অঞ্চলে বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহাদের বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। পশ্চিমাঞ্চলের বিপুল সম্পদ হইতে উপনিবেশিকরা নিজেদের বঞ্চিত বলিয়া মনে করিল এবং তাহারা ইংরাজ সরকারের এই নীতি বানচাল করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল।

ঠিক এই সময় "কোয়ার্টারিং" আইন মারফত ইংলণ্ড হইতে নির্দেশ আসিল যে ইংরাজ সৈন্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় উপনিবেশবাসীদের সাহায্য করিতে হইবে। এই সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহার্থ ঔপনিবেশিকদের নিকট হইতে একটি কর আদায় করাও স্থির হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল পার্লামেন্টে "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট" নামক আইন পাশ করিলেন। আইনে স্থির হইল যে অতঃপর উপনিবেশগুলিতে রাজমুদ্রাঙ্কিত কাগজে দলিলপত্র লিখিতে হইবে এবং তজ্জন্য ইংরাজ সরকারকে মাশুল দিতে হইবে। ঔপনিবেশিকদের সম্মতি না লইয়া এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় আমেরিকায় লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং দলবদ্ধ হইয়া রাজমুদ্রাঙ্কিত কাগজ বর্জন করিল। তাহারা পূর্ব হইতেই ইংলণ্ডের স্বার্থপর বাণিজ্যনীতিতে উত্যক্ত হইয়াছিল। পরে এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য করিবার অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নাই, উপনিবেশগুলির আইনসভাসমূহেরই আছে। ইংলণ্ডের প্রধান নেতা উইলিয়ম পিট ও বার্ক প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিলেন যে পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি না থাকায় পার্লামেণ্টের পক্ষে আমেরিকার উপর কর নির্ধারণ বিধিসঙ্গত নহে।

স্ট্যাম্প অ্যাক্ট মাত্র এক বৎসর চালু ছিল। ঔপনিবেশিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে ইংরাজ সরকার ইহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল। প্রধান মন্ত্রী গ্রেনভিল পদত্যাগ করিলেন। ঔপনিবেশিকগণ খুবই উল্লাসিত হইল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরো কয়েকটি (আমেরিকানদের দিক হইতে) অযৌক্তিক আইন জারী করা হইল। ইংলণ্ডের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রকিংহাম এই সময় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ইহাতে বলা হয় যে উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য করিবার অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের আছে। তাঁহার এই প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল। ইহার ফলস্বরূপ রাজস্বমন্ত্রী টাউনসেণ্ড উপনিবেশগুলিতে কাচ, সীসা, রঙ, কাগজ এবং চায়ের উপর আমদানি শুল্ক বসাইলেন। এই মর্মে ঘোষণা করা হইল যে এই শুল্ক হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে উপনিবেশগুলিতে নিযুক্ত গভর্নরদের বেতন দেওয়া হইবে। এতদিন পর্যন্ত গভর্নরগণ কিন্তু উপনিবেশগুলির অর্থভাণ্ডার হইতেই বেতন পাইয়া আসিতে-ছিলেন। এই নূতন আইন দ্বারা ইংরাজ সরকার ঔপনিবেশিকদের বুঝাইতে চাহিল যে ইংরাজ সরকার উপনিবেশগুলিতে অধিকতর কর্তৃত্ব খাটাইতে চাহে। ইহা ঠিক যে, ইংরাজ সরকারের এই কর ধার্য ব্যাপারে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য যতটা না ছিল কেবল-মাত্র ইংলণ্ড যে তাহার উপনিবেশের উপর কর ধার্য করিতে পারে তাহাই প্রতিপন্ন করা।

টাউনসেণ্ডের আইনের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলিতে পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করিবার আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে শুরু হইল। ইংলণ্ড ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইল। ফলে বিবাদ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইংরাজ সরকার এই সময় ম্যাসাচুসেটসের আইনসভা ভাঙিয়া দিল এবং বোস্টনে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠাইল। ঔপনিবেশিকগণ ইহাকে প্ররোচনামূলক কার্য বলিয়া গণ্য করিল।

ইতিমধ্যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তিনি চা

ব্যতীত অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ নিজ প্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত কোন কর দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই সময় ভারতবর্ষ হইতে একখানি চা-বোঝাই জাহাজ ম্যাসাচুসেটস্ উপনিবেশের অন্তর্গত বোস্টন বন্দরে পেঁছিলে কয়েকজন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানের বেশে জাহাজে উঠিল এবং ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। আমেরিকানরা এই ঘটনাকে 'বোস্টন টি পার্টি' নামে অভিহিত করিল।

আমেরিকানদের এই কাজে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। তিনি বোস্টনকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যোগী হইলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রাজার নির্দেশে "ইনটলারেবল অ্যাক্টস" গৃহীত হইল। এই আইন অনুসারে ঠিক হইল যতদিন পর্যন্ত জলে ফেলিয়া দেওয়া চা-এর মূল্য মিটাইয়া দেওয়া না হইবে ততদিন পর্যন্ত বোস্টন বন্দর অবরুদ্ধ থাকিবে। আর ম্যাসাচুসেটসের শাসনভার ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত রাজকর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করা হইল। ইহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।


জর্জ ওয়াশিংটন

অধিকারপত্র রচনা ঃ জর্জিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া নগরে সমবেত হইলেন এবং নিজেদের দাবি ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডের পণ্য বর্জন স্থির করিলেন। এই প্রতিনিধি সভা **কংগ্রেস** নামে খ্যাত। যুদ্ধের সম্ভাবনায় তখন হইতেই সৈন্য সংগ্রহ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিল। কংগ্রেস ভার্জিনিয়ার অধিবাসী **জর্জ ওয়াশিংটনকে** আমেরিকান সৈন্যদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিল। নবনিযুক্ত সেনাপতির ন্যায় স্বদেশভক্ত কর্মবীর ইতিহাসে বিরল। রণপাণ্ডিত্য অপেক্ষা চরিত্র-মাহাত্ম্যেই তিনি আমেরিকার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, পরার্থপরতা এবং স্বদেশানুরাগ অতুলনীয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫—১৭৮৩) ঃ বোস্টন অঞ্চলে সর্বপ্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লেকসিংটন নামক স্থানে সংঘর্ষের পর ইংরেজ সৈন্য অতিকষ্টে ঔপনিবেশিকদের বাংকার্স হিল হইতে বিতাড়িত করিল। যুদ্ধে কখনো ইংরাজ কখনো আমেরিকানরা জয়লাভ করিতে থাকিল। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিকদের মন হইতে পূর্ব মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সহিত মিলিত থাকিবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হইল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধ সাত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথমে ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডের পরাজয় শুরু হয়। এই বৎসর ইংরাজ সেনাপতি বার্গয়েন স্যারাটোগা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সপ্তবর্ষব্যাপী

যুদ্ধের পরাজয়-কালিমা ক্ষালন করিবার জন্য ফ্রান্স উপনিবেশিকদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিল। জিব্রাল্টার অবরুদ্ধ হইল। পর বৎসর রাশিয়া প্রমুখ উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের শক্তিগুলি ইংরাজরা যাহাতে তাহাদের জাহাজগুলি শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র খোঁজা উপলক্ষে খানাতল্লাসি করিতে না পারে তাহার জন্য 'সশস্ত্র নিরপেক্ষ লীগ' নামে একটি সংঘ গঠন করে। ফলে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে একটি শত্রুভাবাপন্ন একতাবদ্ধ ইউরোপের সৃষ্টি হইল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ইয়র্ক টাউনে ইংরেজ সেনাপতি কর্নওয়ালিস (পরবর্তীকালে ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন) সসৈন্যে ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পেঁছিলে পার্লামেণ্ট যুদ্ধ বিরতির স্বপক্ষে মত দিল। ইহার পর কয়েক মাস ধরিয়া শান্তি চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্তা চলিল। তাহার পর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ইহা ছাড়া মিসিসিপির পশ্চিমে বহু আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চলটিও ইংলণ্ড আমেরিকানদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহাতে নূতন রাষ্ট্রের যে উত্তর সীমা নির্ধারিত হইল তাহা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে।

ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের কারণ ঃ অর্থ, সম্পদ ও সামরিক শক্তিতে উপনিবেশ-গুলি ইংলণ্ডের সমকক্ষ ছিল না। তবুও তাহাদের জয় হইল। ইহার কয়েকটি কারণ অবশ্যই ছিল। প্রথমত, ইংরাজ সরকার কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে নাই। ইহাতে ঔপনিবেশিকদের সুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ডের শত্রুগণ—ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ দিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সাহায্য ছাড়া ঔপনিবেশিকদের পক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইত। তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিকগণ স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল—কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যাইবে। আর ইংলণ্ড যুদ্ধ করিয়াছিল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য। ইংলণ্ডের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যও ছিল না। ইংরাজ নেতাগণ ইংলণ্ডের আমেরিকান নীতি সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। পিট ও বার্কের ন্যায় নেতারা ঔপনিবেশিকদের পক্ষে ছিলেন। চতুর্থত, ঔপনিবেশিকদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তি ছিল বলিয়া তাহারা ব্রিটিশপণ্য বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং স্বদেশী শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল। পঞ্চমত, ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার দূরত্ব তিন হাজার মাইল। এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া সেই সময় সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যথা-সময়ে ইংলণ্ড হইতে জাহাজে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠান খুবই অসুবিধাজনক ছিল। তাহা ছাড়া আমেরিকার অভ্যন্তরে পথঘাট সম্বন্ধে ইংরাজ বাহিনী বিশেষ অবহিত ছিল না। ষষ্ঠত, ওয়াশিংটনের প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি জয়লাভের অন্যতম কারণ। তিনি ঔপনিবেশিকদের মধ্যে এমন উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত করিয়াছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ঃ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব ফল—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামে এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের পত্তন। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে দৈবস্বত্ব (Divine Rights) রাজতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িল। জনগণের অধিকার সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হইবার ফলে সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের পথ সুগম হইল। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উপনিবেশগুলি ইংলন্ডের হস্তচ্যুত হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থাকে উন্নত এবং সুগঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করিল। ভারত সম্পর্কীয় নীতিতে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তৃতীয় জর্জ পূর্বকালের নৃপতিদের ন্যায় স্বহস্তে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। চতুর্থত, ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ বিপর্যয় আনিল। এই যুদ্ধে যোগ দিবার ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষ হইয়া গেল। ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিল। পঞ্চমত, স্পেন এই যুদ্ধে যোগ দিয়া কতকগুলি স্থান লাভ করিলেও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব তাহার আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলিতেও সঞ্চারিত হয়। ইহার ফলে স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতাসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেখা দিল। পরিশেষে বলা যায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল মানবমুক্তির ইতিহাসে এক সুদিনের সূচনা করে। বিশ্বের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও আশাহত মানুষ এই যুদ্ধ হইতে এক নূতন পথের সন্ধান পাইল। আমেরিকার মুক্তি-সংগ্রাম যে মহৎ ভাবাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল, ভারত প্রমুখ বহু দেশের মুক্তি এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহা এক অন্তবিহীন অনুপ্রেরণা যোগাইয়া গিয়াছে।

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থা, স্টেট্‌স জেনারেল আহ্বানের যৌক্তিকতা, কেন ফ্রান্সেই বিপ্লব ঘটিয়াছিল, স্টেট্‌স জেনারেলের অধিবেশন—বিপ্লবের সূচনা, ফরাসী বিপ্লরের কারণ, ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব, বিপ্লবের অগ্রগতিঃ সংবিধান সভার কার্যাবলী, ষোড়শ লুইর পলায়ন প্রচেষ্টা—প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব বৃদ্ধি, জাতীয় কনভেনসন, থার্মোডোরিয়ান কনভেনসন, নূতন সংবিধান, ডাইরেক্টরগণের শাসন, নেপোলিয়ন, নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান (১৭৯৬-৯৭), নেপোলিয়নের প্রাচ্য অভিযান (১৭৯৮-৯৯), কন্সালেটের প্রতিষ্ঠা, নেপোলিয়নের সংস্কার, কোড নেপোলিয়ন, দ্বিতীয় শক্তি-সংঘের সহিত যুদ্ধ, ইংলন্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তি, সম্রাট নেপোলিয়ন, ইউরোপীয় সমর—তৃতীয় রাষ্ট্রজোট, প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ, নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা, স্পেনের যুদ্ধ (১৮০৭-১৪)—নেপোলিয়নের পতনের সূত্রপাত, রাশিয়ার সহিত বিরোধঃ মস্কো অভিযান, চতুর্থ রাষ্ট্রজোট—নেপোলিয়নের পরাজয়, শত দিবস, ওয়াটারলুর যুদ্ধ নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ, ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব।

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থাঃ ফ্রান্সের বুরবোঁ (bourbon) বংশীয় রাজা চতুর্দশ লুই ইউরোপের ইতিহাসে 'দি গ্র্যান্ড মনার্ক' নামে পরিচিত। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৬৪৩-১৭১৫ খ্রীঃ)। এই সময় ফ্রান্স সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে পেঁছায়। অপূর্ব জাঁকজমকপূর্ণ ফরাসী রাজসভা সমসাময়িক ইউরোপের রাজন্যবর্গের ঈর্ষা ও অনুকরণের বস্তু ছিল। লুই প্রচার করিতেন যে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাবলেই (Divine Right) তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্সের রাজশক্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায় এবং উচ্চপদস্থ যাজকগণ রাজসভা অলংকৃত করিয়া এই অসীম ক্ষমতাশালী নৃপতির চাটুকারে পরিণত হন। ইহার বিনিময়ে তাঁহারা নানারকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। ব্যয়বহুল রাজসভার সমস্ত খরচপত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দুর্ভাগা কৃষককুলকে বহন করিতে হইত। চতুর্দশ লুইর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্বে রাইন নদী ও দক্ষিণে পিরানিজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিয়া ফ্রান্সকে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। রাজত্বের শেষদিকে তিনি স্পেন সহ ইহার সমগ্র অধিকৃত অঞ্চলগুলিও গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু লুইর আগ্রাসী নীতির ফলে ইউরোপে শক্তিসাম্য নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যগুলি সমবেতভাবে লুইর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ইহার ফলে লুইর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

লুইর স্বৈরাচারী শাসন ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছিল। কারণ তাঁহার জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা ও আগ্রাসী যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভাঙিয়া পড়ে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ইহার কোনরূপ প্রতিকার করিতে

পারেন নাই। এইভাবে চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে ফরাসী বিপ্লবের বীজ রোপিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ লুইর শাসনকাল

চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের পৌত্র পঞ্চদশ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ষাট বৎসর (১৭১৫-১৭৭৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজোচিত গুণাবলী বিশেষ কিছু ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর দিকে আড়ম্বরপ্রিয়তা ও বিলাসিতায় তিনি পিতামহকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য তিনি সরকারী পদ ও খেতাব বিক্রয় করিতেন এবং জাতীয় ঋণের মাত্রা তাঁহার শাসনকালে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণাম যে বিষময় হইয়া উঠিতে পারে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। শুনা যায় যে তিনি বলিতেন 'আমার জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিলেই হইল তাহার পর যদি মহাপ্লাবন আসে ক্ষতি নাই।' এই পাপাচারী রাজার মৃত্যুর পনের বৎসর পরে ফরাসী বিপ্লব রূপে এই মহাপ্লাবন সত্য সত্যই দেখা দেয়।

ষোড়শ লুই ঃ (১৭৭৪-১৭৯৩ খ্রীঃ) পঞ্চদশ লুইর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই ফ্রান্সের রাজা হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সের রাষ্ট্রজীবনের জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যে প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন ছিল তাহা তাঁহার ছিল না। তবুও তিনি দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৎকালীন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ তুর্গো (Turgot)-কে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। তুর্গো অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। প্রথমেই তিনি শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে অবাধ নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের উপর কর বসাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে তুর্গোর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আন্দোলন শুরু করে। এমনকি রানী আতোয়ানেৎও তাহাদের সহিত যোগ দেন। ফলে দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই তুর্গোকে পদচ্যুত করেন। তুর্গো এই সময় রাজাকে বলিয়াছিলেন—'মনে রাখিবেন স্যার ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের দুর্বলতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ ছিল।' তুর্গোর পর ষোড়শ লুই নেকার (Necker)-কে অর্থসচিব নিযুক্ত করেন। নেকার তুর্গোর ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী না হইলেও তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের দ্বারা ফ্রান্সকে দুর্ভাগ্যের হাত হইতে অন্তত সাময়িকভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তুর্গোর পথ অনুসরণ করিয়া তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন এবং অনাবশ্যক ব্যয়-বন্ধ করিয়া রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হইবার পূর্বেই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হইল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের প্রতি ঐকান্তিক ঈর্ষাবশত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের অধীনস্থ ঔপনিবেশিকদের অর্থ ও জনবল দিয়া সাহায্য করিল। ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করা কিন্তু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইল। কারণ ইহা তাহার দুর্বল আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাইল। এই অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য নেকার যখন অভিজাত সম্প্রদায়ের

উপর কর বসাইবার ও রাজসভার ব্যয় সংকোচের প্রস্তাব দিলেন তখন স্বভাবতই বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। ষোড়শ লুই অভিজাতদের চাপে পড়িয়া পূর্বে যেরূপ তুর্গোকে বিদায় দিয়াছিলেন সেইভাবেই নেকারকে পদচ্যুত করিলেন।

নেকারের পদচ্যুতির পর রাজস্ববিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব ক্যালোনকে (Calonne) দেওয়া হইল। তিনি সর্বনাশা সুদের হারে ঋণ লইয়াও আয়ব্যয়ের সমতাসাধন করিতে অসমর্থ হন। অবশেষে তিনিও সুবিধাভোগী শ্রেণীর উপর কর ধার্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জানাইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী ষোড়শ লুই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অব নোটেবলস্-এর অধিবেশন ডাকিলেন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণী নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ছাড়িতে অস্বীকৃতি জানাইয়া ক্যালোনের পদত্যাগ দাবি করিল। ফলে ক্যালোনও পদচ্যুত হইলেন। এই ভাবে পর পর তিনজন মন্ত্রী আর্থিক সংস্কারের চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। অতঃপর রাজা জনগণের উপর নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়া "পার্লামেণ্ট অব প্যারিস্" নামক বিচারসভার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু এই সভা কর আদায়ের জন্য নূতন প্রস্তাব অনুমোদন করিল না। উপরন্তু ইহার সভ্যগণ ঘোষণা করিলেন যে, ফ্রান্সের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত "স্টেট্স্ জেনারেল" ব্যতীত আইন অনুযায়ী কর স্থাপনের অধিকার অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাই। রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু জনসাধারণ প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিলে এবং স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বানের দাবী জানাইলে ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া এই দাবি মানিয়া লইলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নেকারকে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া স্টেট্স্ জেনারেল মহাসভা গঠনের জন্য নির্বাচনের আদেশ দিলেন। সুদীর্ঘ ১৭৫ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পুনরায় এই সভার আহ্বান যুগান্তকারী ইতিহাস-বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছিল।

স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বানের যৌক্তিকতা ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে লুই স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বান না করিলে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিত না। কিন্তু এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বানই-ফরাসী-বিপ্লবের একমাত্র কারণ ছিল না। বিপ্লব তখনই দেখা দেয় যখন সমাজে অসমাঞ্জস্য তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী সমাজে তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বান না করিলেও ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিত। বরঞ্চ লুই স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বান করিয়া রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

কেন ফ্রান্সেই বিপ্লব ঘটিয়াছিল ঃ প্রথমত, যে সব অভ্যন্তরীণ অবস্থায় বিপ্লবী মনোভাবের উদ্ভব ঘটে তাহা ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই কম-বেশি বর্তমান ছিল; সেক্ষেত্রে বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সেই কেন দেখা দিয়াছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত, ফ্রান্সে "বুর্জোয়া" শ্রেণীরূপে জনগণের যে অংশ ছিল তাহাকে আধুনিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। ইহাদের হাতে অর্থ ছিল এবং ইহারাই রাষ্ট্রীয় করের বোঝার অধিকাংশ ভাগ বহন করিত এবং রাষ্ট্র ইহাদের নিকট হইতে ঋণ পাইত। অভিজাত শ্রেণী নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত অথচ

রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব তাহাদের পালন করিতে হইত না। উপযুক্ত না হইলেও উচ্চ সরকারী পদগুলিতে তাহারাই অধিষ্ঠিত থাকিত। অথচ তাহাদের কুশাসনের ফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে "বুর্জোয়া" শ্রেণীকেই ভোগ করিতে হইত। আবার ইহারাই যখন একাধারে করদাতা ও ঋণ-দাতা ছিল তখন সরকার দেউলিয়া হইলে ইহাদেরই আর্থিক বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল অধিক। তাহা ছাড়া এই "বুর্জোয়া" শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগতিশীল হইবার দরুন মৌলিক পরিবর্তনের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড ভিন্ন ইউরোপের অন্যান্য দেশে এইরূপ প্রগতিশীল এবং সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় সে সকল রাজ্যের লাঞ্ছিত ও শোষিত জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে সুসংগঠিত হইবার সুযোগলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ফ্রান্সেই নিষ্পেষিত জনগণ সহজেই এই সঠিক নেতৃত্ব লাভ করিয়া সুসংবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ সব দেশে জমিদারগণ যেমন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত তেমনি তাহাদের রাষ্ট্রীয় কর্মে দায়িত্বও ছিল প্রচুর। এই সকল রাষ্ট্রে অভিজাতদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুবিধাভোগ দৃষ্টিকটু ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিবার ফলে ফ্রান্সের জনজীবনে সামন্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র ছিল না। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রচলিত দায়িত্বহীন সামন্ততন্ত্রকে ন্যায়বিরুদ্ধ ও গর্হিত বলিয়া মনে করিত এবং এই অন্যায় ব্যবস্থার বিলোপসাধনের জন্য বিপ্লবকেই একমাত্র পথ বলিয়া বাছিয়া লইল।

ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থাও তদানীন্তন ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিল এবং অন্যান্য দেশের কৃষকদের অপেক্ষা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার সাহস ও ইচ্ছা তাহাদের অনেক বেশি ছিল। চতুর্থত, ফরাসী দার্শনিক তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে ফরাসী সরকারের স্বৈরাচার ও প্রচলিত সমাজ-জীবনের অসাম্য, অনাচার ও দুর্নীতির প্রতি ফরাসী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিপ্লবের পথ সুগম করিয়াছিলেন। পঞ্চমত, পঞ্চদশ লুইর শাসনকাল হইতে ফরাসী রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। প্রাশিয়া বা রাশিয়ার মত ফরাসী স্বৈরতন্ত্র কর্মনিপুণ ও সার্বিক ছিল না। দুর্বল স্বৈরতন্ত্র কেবলমাত্র স্বৈর-তন্ত্রের অযোগ্যতাই প্রকাশ করিল না, ইহার প্রজাহিতৈষণার দিকও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠত, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফরাসীরা প্রত্যক্ষভাবে একদিকে স্বাধীনতার প্রেরণা ও অপরদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ হয়।

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্রান্স অর্থনৈতিক দিক দিয়া যেমন কঠিন অবস্থায় পড়িয়াছিল, ইউরোপের অন্যান্য দেশকে ঐরূপ অবস্থায় পড়িতে হয় নাই। অতএব বাস্তব পরিবেশ ও আদর্শের যুগপৎ মিলন ফ্রান্সেই সার্থকভাবে ঘটিয়াছিল বলিয়া এখানেই বিপ্লব প্রথম দেখা দেয়।

স্টেটস্-জেনারেল-এর জাতীয় ও সংবিধান সভায় রূপান্তর—বিপ্লবের সূচনা : স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন যথাসময়ে বসিল। এই মহাসভা বরাবর যাজক, অভিজাত ও জনসাধারণ—এই তিনটি 'estate' বা শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত

ছিল। প্রত্যেক 'estate'-এর একত্রে একটি করিয়া ভোট ছিল। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি 'estate' পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন কক্ষে গিয়া প্রস্তাবাদি আলোচনা করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীর মতামত ব্যক্ত করিতেন। কোন প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় শ্রেণী হিসাবে ভোট লওয়া হইত। সদস্য প্রতি একটি ভোট নীতি প্রচলিত ছিল না বলিয়া সাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব হইত না। কারণ প্রথম দুই শ্রেণী সকল সময়েই বিরোধিতা করিত। একারণে স্টেট্‌স্‌ জেনারেল অধিবেশন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ পুরাতন ব্যবস্থা নাকচ করিতে চাহিলেন এবং প্রত্যেক সদস্যের ভোট স্বতন্ত্রভাবে লওয়া হউক বলিয়া দাবি জানাইলেন। তাঁহারা আরও দাবি করিলেন যে তিন শ্রেণী একই সঙ্গে একই কক্ষে বসিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। ষোড়শ লুই ইহা স্বীকার করিলেন না। ফলে স্টেট্‌স্‌ জেনারেল আহ্বান করিয়া তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নিজের দোষে নষ্ট করিলেন। দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ অচল অবস্থার পর তিনটি শ্রেণী নিজেদের প্রকৃত গণ-প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিয়া অপর দুই শ্রেণীর সম্মতি ছাড়াই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৭ই জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ)। ঘটনাপ্রবাহের এই দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করিয়া ষোড়শ লুই ভীত হইয়া আর একটি ভুল পন্থা অনুসরণ করিলেন। তিনি অভিজাত শ্রেণীর পরামর্শে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জন্য স্টেট্‌স্‌ জেনারেলের অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ইহা জানানো হইল না। তাঁহারা যথারীতি অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া সভাকক্ষের দরজা বন্ধ দেখিলেন। ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিগণ অভিজাত বংশীয় বিপ্লবী নেতা মিরাবোঁ-র নেতৃত্বে ফিরিয়া না গিয়া নিকটবর্তী টেনিস-কোর্টে সমবেত হইলেন। তাঁহারা শপথ লইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, যতদিন ফ্রান্সের জন্য একটি নূতন সংবিধান তাঁহারা প্রণয়ন করিতে না পারিবেন ততদিন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া চলিবেন এবং কোনমতেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকিতে দিবেন না—ষোড়শ লুইর ভুল নীতির ফলে ইহা সম্ভব হইল। জনপ্রতিনিধিরা দেশের রাজাকে বাদ দিয়া ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কথা ভাবিতে শুরু করিল। দুর্বলচিত্ত লুই নিজের পূর্ব-নীতিতে অটল থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় স্টেট্‌স্‌ জেনারেলের অধিবেশনে সম্মতি দিলেন, তবে তৃতীয় শ্রেণীকে জানাইয়া দিলেন যে, পুরাতন প্রথার কোনরূপ পরিবর্তন চলিবে না। ইহার ফলে তৃতীয় শ্রেণী রাজার উপর আরও অধিক রুষ্ট হইল এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারকরূপে প্রচার করিয়া রাজার ক্ষমতা সীমিত করিবার প্রস্তাব তুলিল। অবশেষে লুই তৃতীয় শ্রেণীর দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু তখন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে এই সময় প্যারিসের জনতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহারা রাজধানীর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, এবং কুখ্যাত বাস্তিলের দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাস্তিলের পতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ও সামন্ততন্ত্রের পতন বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এখনও প্রতিবৎসর এই দিনটি ফ্রান্সের জাতীয় দিবসরূপে পালিত হয়। বাস্তিলের

পতনের পর প্যারিসের জনসাধারণ একটি 'কমিউন' (Commune) গঠন করিয়া রাজধানীর শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়া নাগরিকদের লইয়া এক জাতীয় বাহিনী গঠন করিল।

প্যারিসে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীতে অনুপ্রাণিত হইয়া ফ্রান্সের অন্যান্য শহর ও গ্রামে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কৃষকগণ অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর প্রাসাদ-দুর্গ ধ্বংস করিয়া দলিলপত্র পোড়াইয়া দিল। প্যারিসের ন্যায় নগরে নগরে কমিউন ও



বাস্তিল দুর্গের পতন

জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি হইল। গণ-বিদ্রোহের সংহারমূর্তি লক্ষ্য করিয়া বড় বড় জমিদারগণ প্রাণভয়ে সমস্তকিছু বিসর্জন দিয়া বিদেশে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে প্যারিসের বুভুক্ষু মহিলাদের এক গণমিছিল রাজপরিবারকে ভার্সাই হইতে বলপূর্বক প্যারিসে আনয়ন করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে ফ্রান্সের প্রাচীন শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটিল।

ফরাসী-বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ ঃ ফরাসী-বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ফরাসী-বিপ্লবের একাধিক কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ক্রমে এমন একটি অবস্থায় পেঁৗছিয়াছিল যখন তাহার জরাজীর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর কোন সার্থকতা ছিল না। এই বিপ্লব হঠাৎ ঘটে নাই। বহু ঘটনার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ফরাসী বিপ্লব দেখা দিয়াছিল।

রাজনৈতিক ঃ ফ্রান্সে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ছিল অসীম। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া কিছু ছিল না। ইহার ফল কিন্তু ভাল হয় নাই। রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে সেই ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে

প্রয়োগ করিবার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাশালী নরপতির। চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর (১৭১৫) ফ্রান্সের সিংহাসনে যাঁহারা আরোহণ করিলেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন দুর্বল চিত্তের; সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনটাই তাঁহাদের ছিল না। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরপর কয়েকবার পরাজিত হইয়া এবং উপনিবেশ হারাইয়া রাজতন্ত্র প্রজাদের নিকট হাস্যাস্পদ হয় ও তাহাদের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয়। শাসন বিভাগের অনাচার ও ব্যাপক দুর্নীতির সহিত অত্যাচার-অবিচারের শেষ ছিল না। শাসনক্ষেত্রে কোনরূপ সমতা ছিল না এবং শাসন-কাঠামো ছিল দাবার ছকের ন্যায় বহুধা-বিভক্ত। কর্তৃত্ব ছিল রাজকীয় পরিষদে, ক্ষমতা ছিল ত্রিশজন প্রাদেশিক পরিদর্শকের হাতে, বিচারকার্য সম্পন্ন হইত তেরটি পার্লামেন্ট এবং অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক আদালতের দ্বারা। ব্যক্তি মানুষের সম্পত্তি ও জীবনের কোন মূল্য বা নিরাপত্তা ছিল না। সাধারণ মানুষকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। রাজার বা তাঁহার প্রিয়পাত্রদের বিরাগ-ভাজন হইলেই যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখাইয়া লেত্রি ডি কেশে (Letter de cachet) নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দ্বারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইত। বিচারকগণ তাঁহাদের পদ পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে লাভ করিতেন অথবা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতেন। দুর্বল প্রতিবাদীদের নিকট হইতে অর্থ (fee) গ্রহণ করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। সুতরাং আইনের চোখে সকলে সমান ছিল না। তাহা ছাড়া, দেশে বিচারব্যবস্থার কোন সমতা ছিল না। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক্ পৃথক্ আইনবিধি প্রচলিত ছিল। ফলে অনাচার ও অবিচারের কোনরূপ প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

সামাজিক কারণঃ ফরাসী সমাজেও অসাম্যের অন্ত ছিল না। শ্রেণীবৈষম্য জাতীয় জীবনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, শিল্পী ও কৃষক প্রভৃতি নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ তৃতীয় শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রথম দুইটি শ্রেণীকে সুবিধাভোগী শ্রেণী বলা হইত। সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইঁহারাই সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন এবং দেশের অধিকাংশ ভূসম্পত্তির মালিকও ইঁহারাই ছিলেন। জমিদারী হইতে ইঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইত আবার অভিজাত বংশের সন্তানগণই চার্চের বড় বড় যাজক পদে নিযুক্ত হইতেন। চার্চের অধীনেও প্রভূত ভূ-সম্পত্তি ছিল। সুতরাং উচ্চপদস্থ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু নানা রকমের সুখ-সুবিধাই ভোগ করিতেন না, দেশের সহায়সম্পদও তাঁহাদের হস্তে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। অথচ ইঁহারা কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতেন না। এমন কি রাষ্ট্রকে দেয় কর হইতেও ইঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। অপর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মধ্যবিত্ত লোকজন রাষ্ট্রের সকল করভার বহন করিত এবং প্রয়োজনমত রাষ্ট্রকে রক্ষা ও ঋণদান করিয়া সাহায্য করাও তাহাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃবর্গই ফরাসী-বিপ্লবের উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিপ্লবের পূর্বে এই শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত ফরাসী সমাজে প্রচুর জটিলতা দেখা দিয়াছিল। বস্তুত সমাজের কোন স্তরই সম্পূর্ণরূপে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ ছিল না, যেমন যাজক শ্রেণী স্পষ্টতই দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ যাজকগণের পার্থিব সুখসুবিধা ভোগের প্রতি অধিক আসক্তি ছিল। ধর্মকর্ম বা জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি সাধনের দিকে ইঁহাদের কোন নজর ছিল না। ইঁহারা জনসাধারণেরও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত কর্তব্য নিম্নশ্রেণীর যাজকগণই সম্পাদন করিতেন অথচ তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু সরলস্বভাব কৃষকদের উপর এই নিম্নশ্রেণীর যাজকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিপ্লব দেখা দিলে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ইঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর সহিত যোগদান করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জন্মনির্ভর অভিজাতগণের মধ্যেও নানা রকমের বিভেদ দেখা দিয়াছিল। রাজধানীতে বসবাসকারী ঐ বিপুল ঐশ্বর্যশালী অভিজাত-দের সঙ্গে প্রদেশবাসী অভিজাতদের অহিনকুল সম্বন্ধ ছিল। আবার এই শেষোক্ত শ্রেণীর অভিজাতদের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিপ্লবের সময় ইঁহারাও তৃতীয় শ্রেণীর সামিল হন। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলেই যে সুবিধাবিহীন ছিলেন একথা বলা যায় না। ভোগী বিত্তবান ব্যবসায়ীকুল কম সুবিধাভোগী ছিলেন না। প্রচুর অর্থ ও সম্পদের মালিক হইয়া তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সরকারী পদ ক্রয় করিয়া রাজার সৃষ্ট এক নূতন অভিজাত শ্রেণীতে (Noblesse de robe) পরিণত হন। অবশ্য প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থায় ইঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে দুইটি বিরোধী দল ছিল। এক দল ছিলেন পার্লামেন্ট অব প্যারিসের সদস্য। তাঁহারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করিতেন। অপর দল মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদ লাভ করিয়া অতিশয় রাজভক্ত হইয়া পড়েন। বিপ্লবের প্রাক্কালে ইঁহারাই রাজ্যশাসনের ভার হস্তগত করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাক্-বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সের প্রথাগত সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্থলে নূতন রকমের শ্রেণীগত বিভেদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থগত-সংঘাত তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তথা-কথিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নততর ছিল তাঁহারা সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বিপ্লবকে স্বাগত জানান। আবার এদিকে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক-কুল তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। এদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শ্রেণীর বিপ্লববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ক্রমে স্পষ্ট হইয়া ওঠে এবং বিপ্লবের ধারাও বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। নিম্নপদস্থ যাজক, বিত্তহীন অভিজাত সন্তান, সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং জনসাধারণের মনে কিছুকাল ধরিয়া যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল অবশেষে ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা তাহা প্রজ্বলিত করে। বাড়বানলের এই মহাবহ্নি সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রাচীন রীতি-নীতি, সমাজব্যবস্থা এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সবকিছু বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের ধনী অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়কে কোনরূপ কর দিতে হইত না। সামন্ততন্ত্রের নীতি অনুসারে কৃষকগণ বেগার খাটিয়া মরিত আর ধনাঢ্য অভিজাতগণ নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত করিত। রাষ্ট্রের সমগ্র আয়ের প্রায় সমস্তটাই মধ্যবিত্ত সাধারণ প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। করধার্য সম্পর্কে কোন ন্যায়সঙ্গত নীতি ছিল না। প্রধানত তিনটি প্রত্যক্ষ কর জনসাধারণের উপরে ধার্য করা হইত যথা—টেইলি, ক্যাপিটেশন এবং ভিংটিয়েমে। এই করগুলি কখন কিসের উপর ধার্য হইত তাহা করদাতারা জানিত না। তাহা ছাড়া পরোক্ষ করের সংখ্যাও ছিল অগণ্য। ফ্রান্সের এক এক অঞ্চলে লবণের জন্য এক এক রকম দাম লওয়া হইত। টেইলি নামক কর কখনও জমির উপর ধার্য হইত, কখনও বা আয়ের বিভিন্ন উৎসের উপর। এরূপ ব্যবস্থা কোন ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কৃষকদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ সরকারকে ভূমিকর বা টেইলি হিসাবে, ২৮ ভাগ গীর্জা কর (Tithe) এবং সামন্ত প্রথা অনুযায়ী জমিদারদের প্রাপ্য কর হিসাবে দিতে হইত। ইহা ছাড়া, অনেকগুলি পরোক্ষ কর তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত, যেমন উৎপাদন শুল্ক ও লবণ শুল্ক। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গীও সঙ্কীর্ণ ছিল। অসীম শক্তিশালী বণিক্ সংঘগুলি (গিল্ড) দেশের সমস্ত শিল্প সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত। আবার এই সকল বণিক্ সংঘগুলি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। শিক্ষানবীশ কর্মীদের স্বাধীন কারিগর হইবার কোন সুযোগ ছিল না। হাড়ভাঙা খাটুনি ও অল্প মজুরী তাহাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ করভার, প্রাদেশিক শুল্ক, রাজপথ-নদীপথ ও নগর-শুল্ক প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। একারণে ব্যবসায়ীরা সরকারের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের কোন সমতা ছিল না বলিয়াই করধার্য সম্পর্কে কোন নীতি ছিল না। অথচ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। নিয়ন্ত্রণবিহীন কর সংগ্রহের পদ্ধতি জনসাধারণের আর্থিক বোঝা আরও ভারী করিয়া তুলিয়াছিল। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ছিল করসংগ্রাহকগণ। ইহাদের সহিত একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য সরকারের চুক্তি হইত। করসংগ্রাহকগণ এই চুক্তি অনুযায়ী সরকারকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিত। সরকারের দেয় অর্থের উপর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা সংগ্রাহকগণ পারিশ্রমিক হিসাবে আত্মসাৎ করিত। ইহার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য রাজাকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আরও বহু রকমের উদ্ভট ও অযৌক্তিক উপায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল অভিনব কর ও কর-সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতি রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক ছিল এবং আয়-ব্যয়ের সমতা না থাকায় রাষ্ট্রের রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ক্রমাগত ঘাটতি রাজস্ব সত্ত্বেও ফ্রান্স যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে ফ্রান্সের আর্থিক তহবিল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক মর্যাদা বলিয়া কিছু রহিল

না। রাজকোষ শূন্য হওয়াতে ঋণের পরিমাণ ক্রমেই স্ফীত হইতে থাকে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় ঋণের সুদ প্রদানেরও ক্ষমতা থাকিল না।

দার্শনিকদের প্রভাব ঃ ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিবার বহু পূর্বেই ভাব-জগতে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যে একটি স্বাধীন অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূল কথা হইল যে, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যেগুলি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে সেগুলিকে বাতিল করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং এই সকল দার্শনিক ও লেখকগণ তৎকালীন ফরাসী সমাজের নানাবিধ দোষ-ত্রুটি বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের উদ্ঘাটনে তৎপর হন। বিশেষত মোঁতেস্কিয়ো (Montesque), ভোলটেয়ার (Voltaire), রুশো (Rousseau), দিদেরোহ (Diderot) প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও মনীষীবৃন্দ তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত করিতে সাহায্য করেন।

মোঁতেস্কিয়ো (১৬৮৯-১৭৫৫) ঃ মোঁতেসকিয়োকে যুক্তিবাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা হিসাবে ধরা হয়। প্রথমে তিনি ব্যঙ্গ লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রচলিত দুর্নীতি, সহনশীলতা, সমাজের উচ্চ-শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত অভিজাত ও যাজকদের সুযোগ-সুবিধা ছিল তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু। তিনি কিছুকাল ইংলণ্ডে বসবাস করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ জন্মে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তক 'স্পিরিট অব লজ' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানিতে তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাজনের নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মত হইল, শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে। তাঁহার এই অভিমত পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও ফ্রান্সের বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অষ্টাবিংশখণ্ডে প্রকাশিত বিশ্বকোষ রচয়িতা রূপে পরিচিত (Encyclopaedists) একদল লেখকের মাধ্যমেও এই যুক্তিবাদ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত প্রগতিশীল মতবাদের প্রসার ঘটে। ইহার সম্পাদক ছিলেন দিদেরোহ (১৭১৩-১৭৮৪)। তাঁহার সম্পাদনায় বিশ্বকোষ গ্রন্থটি প্রগতিশীল জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ফিজিওক্র্যাটস (Physiocrats) নামে পরিচিত এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ নূতন ভাবধারা প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথা বলেন। তাঁহাদের এই মতবাদ লেজে ফেয়ার (Laissez Faire) মতবাদ নামে খ্যাত। তাঁহারা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংলণ্ডের এডাম স্মিথ ছিলেন এই মতবাদের পুরোধা। ফ্রান্সের কানা (Quesnay) ছিলেন ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যে অগ্রণী। প্রভাবশালী ফ্রান্সের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ফিজিওক্র্যাট মতবাদের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন।

ভোলটেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮) ঃ বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভোলটেয়ারের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার তীব্র কশাঘাতের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল

স্বৈরাচারের অন্যতম স্তম্ভ চার্চ। ভোলটেয়ারের বিদ্রূপ ও শ্লেষে শিক্ষিত লোকদের মানসিক প্রসারতা ঘটিল। "ঐ জঘন্য জিনিসকে ধ্বংস করিয়া দাও" ইহা তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করিতেন। তিনি প্রজ্ঞাশক্তির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতেন। তবে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন। ভোলটেয়ার প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপসাধনে ফরাসীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রুশো (১৭১২—১৭৭৮)ঃ ভোলটেয়ারের ন্যায় রুশো প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলিতেন, মানুষ স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বর্তমানে সর্বত্র তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁহার রাজনৈতিক মত ছিল যে, রাজা ঈশ্বর-দত্ত অধিকারের বলে রাজ্যশাসনের অধিকারী নহেন, প্রজারাই রাজাকে রাজ্য-শাসনের অধিকার দিয়াছে, এবং যে রাজা প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না তাঁহাকে বিতাড়িত করার অধিকার প্রজাদের আছে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কনট্রাক্ট সোস্যিয়াল' নামক গ্রন্থে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। বিপ্লবী ফ্রান্সে এই পুস্তকখানি চরমপন্থী বিপ্লবীদের নিকট বেদতুল্য গ্রন্থে পরিণত হয়। রুশোর জ্বালাময়ী লেখা ফরাসীদের মনে এক বিপুল উম্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেজন্য রুশোকে বলা হয় 'ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু'।

দার্শনিকদের রচনাবলী হয়ত বিপ্লব আনয়নে সরাসরি সাহায্য করে নাই, তথাপি তাঁহাদের রচনা ফ্রান্সের তৎকালীন ধর্ম ও শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতাকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সের উৎপীড়িত জনসাধারণ এই সব রচনার মধ্য দিয়া নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঘটনা বিশ্লেষণের দ্বারা তাহারা সমসাময়িক সরকার ও সামাজিক-প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দুর্দশার জন্য দায়ী করে। দার্শনিকদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া তাহারা এই দোষ-ত্রুটিগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে উদ্যোগী হয় এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও শ্রেণীহীন শোষণহীন সাম্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সমাজ-গঠনে উম্মুখ হইয়া উঠে।

ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার প্রভাবঃ ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ইংলণ্ডে এই বিপ্লব ঘটিবার ফলে প্রমাণিত হয় যে জনগণের ইচ্ছার দ্বারা রাজতন্ত্র সীমিত হইতে পারে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামও ফরাসী-বিপ্লবের পশ্চাতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। যে সকল ফরাসী যুবক আমেরিকার পক্ষে স্বাধীনতাসমরে যোগ দিয়াছিল তাহারা আমেরিকাবাসীদের নিকট হইতে এই শিক্ষালাভ করে যে প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রজারাই দেশ শাসন করিবার অধিকারী এবং প্রয়োজন হইলে বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া জনসাধারণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিল।

উপরিউক্ত কারণসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কাহারও মতে অর্থনৈতিক কারণই

বিপ্লবের জন্য মুখ্যত দায়ী। কাহারও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতাই ছিল বিপ্লবের মৌলিক কারণ। কিছু সংখ্যক মনে করেন, দার্শনিকগণ তাঁহাদের লেখার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। আবার অনেকে বিপ্লবের জন্য প্রধানত দায়ী করেন ফ্রান্সের সমাজ-ব্যবস্থাকে। সমাজে অভিজাত শ্রেণী যেরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত অপরাপর শ্রেণীগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। এই সকল দূর করিবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লব ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছিল। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ প্রাক্-বিপ্লব যুগের সামাজিক বৈষম্য ও অসাম্য এবং অর্থনৈতিক দুর্গতির ফলে যে শ্রেণী-সংঘাতের উপাদানসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল সেইগুলিকেই ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিপ্লবের অগ্রগতি : সংবিধান সভার কার্যাবলী : ১৭৮৯-এর অক্টোবর মাসে সংকট কাটাইয়া উঠিবার পর সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনায় মনোযোগী হয় এবং তাড়াতাড়ি নূতন সংবিধান প্রবর্তন করার চেষ্টা করে। নূতন সংবিধান প্রণয়নের ভূমিকাস্বরূপ ফরাসী জাতীয় সভা ইংলণ্ডের ম্যাগনাকার্টা ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার অনুকরণে মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিল (Declaration of the Rights of Man and Citizen)। এই ঘোষণাপত্রে ফরাসী নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ করা হয়। ইহাতে বলা হয় যে, মানুষ স্বাধীন ও সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত প্রজাদের মধ্যে নিহিত, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র, সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। বে-আইনীভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া সম্পত্তি ভোগের অধিকার, অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার স্বীকার করা হইল।

এই ঘোষণাপত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যুগে যুগে ফরাসী জনসাধারণকে ইহা প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই ঘোষণাপত্রে এমন কতকগুলি সার্বিক নীতি নির্ধারণ করা হয় যাহার উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় সভা ফরাসী সমাজ ও সরকারকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল। ইহাতে নাগরিকদের অধিকারসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কর্তব্যের ইহাতে উল্লেখ ছিল না। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইহা হইল মানবাধিকারের ঘোষণা, কেবলমাত্র ফরাসী জনসাধারণের কথাই ইহাতে চিন্তা করা হয় নাই ; সর্বদেশের শোষিত মানুষের কথা চিন্তা করিয়াই এই ঘোষণাপত্রটি রচিত হইয়াছিল। ঘোষণাপত্রটির এই সর্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতার মূল্য পরবর্তীকালে আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ঘোষণাপত্রে যে সব নাগরিক অধিকারগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করে। এই সকল অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহারা বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র প্রকাশের পর সংবিধান সভা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনা করিল। ইহাতে নূতন সংবিধানে বলা হইল যে ফ্রান্স নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হইবে। বংশগত রাজতন্ত্র অটুট রাখা

হইলেও রাজার ক্ষমতা সীমিত করিয়া দেওয়া হইল। যুদ্ধ-ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল ৭৪৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে। স্থির হইল যে, সভার সদস্যগণ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। জনসাধারণের ভোটাধিকার নির্ধারিত হইল নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ কর প্রদানের ভিত্তিতে। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় (Active and Passive) এই দুইভাগে ভাগ করা হইল। ইহার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র ৩৫ হাজার নাগরিক ভোটাধিকার পাইলেন। রাজাকে আইনসভায় গৃহীত আইন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার অধিকার অবশ্য দেওয়া হয়।

ফ্রান্সের পুরাতন প্রশাসনিক বিভাগ বাতিল করিয়া তাহার স্থানে সমআয়তন ও সমানাধিকারবিশিষ্ট ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট কয়েকটি জিলায় এবং প্রত্যেক জিলা কয়েকটি ক্যানটনে এবং একটি ক্যানটন কয়েকটি কমিউনে বিভক্ত হইল। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন শাসন কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকৃত হইল অপর দিকে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইল জনসাধারণ।

বিচার বিভাগেও পরিবর্তন সাধিত হইল। জমিদারদের বিচারালয়গুলি তুলিয়া দিয়া সর্বনিম্ন আদালত হইতে সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। বেআইনী ভাবে ধরপাকড় নিষিদ্ধ হইল এবং আটক ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার লোপ পাইল। জনসাধারণ বিচারক নির্বাচন করিবে স্থির হইল। একই আইন সমগ্র দেশে যাহাতে প্রচলিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল।

রাজস্ব বিভাগেও পরিবর্তন সাধিত হইল। 'কমিউন'গুলি নিজ নিজ এলাকার খাজনা ধার্য করিবার ও আদায় করিবার ক্ষমতা পাইল। পরোক্ষ কর বলিয়া কিছু রহিল না। কমিউনগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করিবে এবং ইহার জন্য প্রতিটি কমিউন স্থানীয় রক্ষী বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে ঠিক হইল। গ্রামাঞ্চল হইতে সামন্ত-জীবনের সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইল।

অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার ঃ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করা সহজসাধ্য ছিল না। বিপ্লব শুরু হইবার ফলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। জাতীয় সভা ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য চার্চের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল। এই সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের ভিত্তিতে আসাইনেট (Assignat) নামক একপ্রকার কাগজের নোটের প্রচলন করা হয়। ইহার ফলে সাময়িকভাবে সরকারের আর্থিক দুর্গতি দূরীভূত হইয়াছিল। জাতীয় সভা চার্চের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। যাজকাশ্রম ও ধর্ম সংগঠনগুলি ভাঙিয়া ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গৃহীত হইল। চার্চের ধর্মসম্বন্ধীয় কর আদায়ের ক্ষমতা আর রহিল না। যাজক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকারে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য 'Civil Constitution of the Clergy' রচিত হইল। ইহার দ্বারা স্থির হইল যে, অতঃপর বিশপ ও গ্রামের যাজকগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন। ধর্মযাজক নিয়োগ ব্যাপারে পোপের কোন ক্ষমতা রহিল না। Civil Constitution of the Clergy ধর্মভীরু কৃষক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া প্রতি-বিপ্লবী

শক্তিকে জোরদার করিয়াছিল। পোপ এই ব্যবস্থার নিন্দা করিলে ইহার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সংবিধান সভার কার্যাবলীর গুরুত্ব ঃ সংবিধান সভা বা জাতীয় পরিষদের কার্যাবলী ফ্রান্সে এক নূতন যুগের সূচনা করে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে যেসব বৈষম্যমূলক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেগুলির অবসান ঘটিল। ফ্রান্সের জাতীয় সভা যে সংবিধান রচনা করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র ফ্রান্সের ইতিহাসেই নহে, সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তাহা হইলেও সংবিধান সভার কার্যাবলী অবশ্য ত্রুটিশূন্য ছিল না। এই সভা বাস্তব অবস্থার দিকে বিশেষ নজর না দিয়া ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া সংবিধানে ও ইহার অন্যান্য কার্যাবলীতে নানাবিধ দোষত্রুটি থাকিয়া যায়।

ষোড়শ লুইর পলায়ন প্রচেষ্টা—প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব বৃদ্ধি ঃ সংবিধান সভা যখন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যস্ত, তখন ষোড়শ লুই মিরাবোঁকে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। মিরাবোঁ রাজাকে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া ফ্রান্সে রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে ষোড়শ লুইকে সুপরামর্শ দিবার আর কেহ রহিল না। ইতিমধ্যে ফরাসী জনসাধারণের ভাবমানসে রাজকীয় মর্যাদা হ্রাস পাইতে থাকে। ফরাসী সংবাদপত্রগুলি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে শুরু করিয়াছিল। প্যারিসের সর্বহারাদের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করা ষোড়শ লুইর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিলে তিনি সপরিবারে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন গোপনে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলেই ভেরেনেজ নামক স্থানে ধরা পড়িয়া গেলেন। ইহার ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হইল এবং তখন হইতে প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। ষোড়শ লুইর পলায়নের চেষ্টার সময় হইতেই কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ফরাসী বিপ্লবের সহিত জড়াইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ষোড়শ লুই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নূতন সংবিধান স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। সংবিধান সভার কাজ শেষ হইল। নূতন আইনসভা কাজ শুরু করিল।

আইনসভা ঃ নূতন আইনসভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন শাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। বিপ্লবের অন্যতম নেতা রোবস্‌পিয়ারের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সভার কেহই আইনসভার সদস্য হইতে পারিলেন না। নূতন আইনসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৪৫। তাঁহারা প্রথম হইতেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই ভাবে চারিটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। যাহারা নূতন সংবিধানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিল তাহাদের বলা হইত ফেঁয়ে়াঁ (Feuillants) বা সংবিধানপন্থী। তাহারা আইন-সভাকক্ষের দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ করিতেন। সভা-কক্ষের বাম দিকে যাহারা বসিত তাহাদের মধ্যে দুইটি দল ছিল—জেকোবিন ও জিরোদিস্ত। আর যাহারা সভাকক্ষের মধ্যস্থলের আসনগুলি দখল করিত তাহারা ছিল মধ্যপন্থী বা নিরপেক্ষ দল।*

---

* অধুনা রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দল বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ফ্রান্সের আইন-সভার সদস্যদের আসন গ্রহণের পদ্ধতি হইতে দেখা দিয়াছে।

আইনসভার কার্যাবলী ঃ আইনসভাকে প্রথমেই দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমত, ফ্রান্সের যে সকল ধর্মযাজক Civil Constitution of the Clergy স্বীকার করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, যে সব অভিজাত ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ফ্রান্সের শত্রুদের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির বিধান। Civil Constitution বিরোধী ধর্মযাজকগণ সরকারী বৃত্তি ও পেনসন হইতে বঞ্চিত হইলেন। দেশত্যাগী অভিজাতদের সম্বন্ধে স্থির হইল যে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেশে ফিরিয়া না আসিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং সরকারের হাতে ধরা পড়িলে চরম শাস্তি পাইবে। ষোড়শ লুই তাঁহার নূতন পরামর্শদাতাদের কথায় আইনসভার এই দুইটি প্রস্তাবই তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিলেন। বামপন্থী দল দুইটি ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং প্যারিসের জনতা ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজাকে প্রস্তাব দুইটিতে সম্মতিদানে বাধ্য করিল। ফরাসী বিপ্লবের শোণিতাক্ত ইতিহাস এইভাবে শুরু হইল।

বৈদেশিক সমস্যা ও রাজতন্ত্রের অবসান ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মনোভাব প্রতিকূল ছিল। বিপ্লব শুরু হইবার কিছুদিন পর্যন্ত ইংলণ্ড মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ মনোভাব অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবিগণ রক্তাক্ত পথ অনুসরণ করিলে ইংলণ্ড ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়। প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রথম হইতেই বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী সম্রাটের পলায়ন প্রচেষ্টা এবং গ্রেপ্তার ফ্রান্সের সহিত অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ ত্বরান্বিত করিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সমস্যা আরও জটিল ছিল কারণ ফ্রান্সের রাণী মেরী আঁতোয়ানেত ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভগ্নী। ভগ্নীর বিপদে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে পাড়ুয়া হইতে এক ঘোষণাপত্র (Manifesto of Padua) প্রচার করিয়া ফরাসী রাজার বিপদ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ইউরোপের রাজাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এবং প্রাশিয়ার রাজা পিলনিজ-এ তাহার পর এক বৈঠকে মিলিত হইয়া আর একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। ইহাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবিগণও ইহার বিরুদ্ধে সচেতন হইল। ফলে ইউরোপের সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রোলা ও ডেমোরিজের (Dumoriez)-নেতৃত্বে জিরোদিস্ত মন্ত্রীসভা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জেকোবিন দল কিন্তু যুদ্ধের বিরোধী ছিল। এই দল মনে করিল যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। কিন্তু তাহাদের মতামত গ্রাহ্য হয় নাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে সামান্য জয়লাভ করিলেও অচিরেই ফরাসী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। বিপ্লবী সৈন্যদলের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের ফলে উত্তেজিত হইয়া প্যারিসের মারমুখী জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ আইনসভায় আশ্রয় লইলেন। ইতিমধ্যে জনতা প্যারিসে বিপ্লবী কমিউন নামে এক নূতন সভা স্থাপন করিয়া প্যারিসের নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহারা রাজতন্ত্রের

উচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এইরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক ঘোষণা করিলেন যে, প্যারিসবাসী যদি রাজপরিবারের কোন ক্ষতিসাধনে তৎপর হয় তাহা হইলে তিনি তাহাদের শাস্তির বিধান করিবেন। এই ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আরও উত্তেজিত করিল। তাহারা আইনসভা আক্রমণ করিয়া সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য করিল। উচ্ছৃংখল জনতারই জয় হইল। রাজপরিবারের লোকেরা টেম্পল নামক কারাগারে বন্দী হইলেন। ষোড়শ লুইর পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় শাসনক্ষমতা জেকোবিন দল ও তাহাদের সমর্থকদের হস্তগত হয়। ইহারা বিপ্লব-বিরোধী এবং রাজভক্ত সন্দেহে শত শত নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ১৯৭১-এর ২রা হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া ইহা **সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড** (September Massacre) বলিয়া কুখ্যাত। ব্রান্সউইক ঘোষণার ইহাই ছিল বিপ্লবী ফরাসীদের উত্তর। আইনসভা বাতিল করিয়া পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে **জাতীয় কনভেনশন** আহ্বান করা হইল। ইতিমধ্যে বিপ্লবী প্যারিস রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের ক্ষমতার আসন হইতে সরাইয়া নিজেরাই ক্ষমতা হস্তগত করিল। দোঁতা সরকারী নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং প্যারিসের জনতার নেতা হইলেন মারাত। এই পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক ফরাসী যুবকবৃন্দ দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। ফরাসীদের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মাহ্ রসেয়াজ' (Marsailleiz) এই সময় রচিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা ছিলেন কবি রুজে দ্য লিল্ (Roujet de Lisle)। এই সঙ্গীত ফরাসীদের মনে এক অপূর্ব দেশপ্রেমের উম্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। নবমন্ত্রে উজ্জীবিত ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখে শত্রুসৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না। ভামির (Valmy) যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহারা ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

জাতীয় কনভেনশন (National Convention) ঃ ভামির যুদ্ধজয়ের পর আইনসভা 'কনভেনশন' নামে এক নূতন সরকারের পত্তন করিল। ইহার উদ্দেশ্যে ছিল ফ্রান্সের জন্য এক নূতন সংবিধান রচনা করা। কনভেনশনের সদস্যগণ প্রায় পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ভোট দিবার প্রবণতা ছিল না বলিলেই হয়। ইহাদের মধ্যে মাত্র দশমাংশ ভোট দিয়াছিল। আইনজীবীদের মধ্য হইতেই অধিকসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইলেন। ৭৫০ জন সদস্যের মাত্র দুইজন ছিলেন প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কনভেনশন শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সর্বপ্রথম জিরোঁদিন কনভেনশন (জুন ১৭৯৩ পর্যন্ত), এই সময় জিরোঁদিন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের পর জেকোবিনরা ক্ষমতা হস্তগত করিয়া একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করে (জুলাই ১৯৭৪ পর্যন্ত)। সর্বশেষে দেখা দেয় বিপ্লবী সরকারের চরমপন্থী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া যাহাকে বলা হয় থার্মিডোরিয়ান রিএকশন।

কনভেনশনের কার্যাবলী ঃ কনভেনশনের প্রথম কাজ হইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ। প্যারিসের জনতা রাজার মৃত্যুদণ্ড দাবি করিল। এই দাবিকে কেন্দ্র করিয়া কনভেন-

শনের সদস্যের মধ্যে কলহ ও মতপার্থক্য দেখা দিল। জিরোঁদিনরা রাজার প্রাণরক্ষা করিতে চাহিলে জেকোবিনরা তাহাদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করিতে থাকে। অবশেষে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে ষোড়শ লুই দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহা ২১শে জানুয়ারী ১৭৯৩-এ ঘটিল। গিলোটিন নামক যন্ত্রে তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হইল। লুই রাজকীয় মর্যাদার সহিত নির্ভিকভাবে মৃত্যুবরণ করিলেন। রানী আঁতোয়ানেত ও রাজকুমারের শিরচ্ছেদ করা হইল অক্টোবর মাসে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ ঃ জিরোঁদিন-পরিচালিত কনভেনশন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া এক ঘোষণা জারী করে। ইহাতে বলা হয় যে, বিপ্লবী ফ্রান্স ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে তাহাদের শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় সক্রিয় সাহায্য করিবে। ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ডের ফলে তাহারা আরও ভীতত্রস্ত হইল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যান্ড, স্পেন ও সার্ডিনিয়া এই ছয়টি শক্তি সংঘবদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ছয়টি রাষ্ট্রের এই জোটকে প্রথম ইউরোপীয় শক্তিসংঘ (First Coalition) বলা হয়। শক্তিশালী এই রাষ্ট্রজোটের সামরিক শক্তির নিকট ফরাসী সৈন্য প্রথমে পরাজিত হইতে থাকিল। ইহার জন্য জিরোঁদিন দলকে দায়ী করা হয়। জেকোবিনরা প্যারিসের ক্রুদ্ধ জনতাকে বশে আনিয়া তাহাদের ক্ষমতাচ্যুত করিল। কনভেনশনের ২৯ জন জিরোঁদিন সদস্য এবং দুইজন মন্ত্রী বন্দী হইলেন। ফ্রান্সের প্রদেশসমূহে জিরোঁদিনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহের সহিত কৃষক সম্প্রদায়ও যোগ দিল। নরম্যাণ্ডি, লিয়োঁ ও ভিত্তিকে কৃষক বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। বিদেশী শত্রুরাও এই সুযোগ ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইল।

সন্ত্রাসের রাজত্ব ঃ এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিল জাতীয় ঐক্যের। জাতীয় ঐক্যের বিরোধিতা যাহারা করিতেছিল তাহাদের দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিয়া যেমন শত্রুকে দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করা হইয়া থাকে, ঘরের শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রবর্তন করা হইল জননিরাপত্তা কমিটি (Committee of public safety) ও গিলোটিনের। কনভেনশনের দ্বারা রচিত প্রাথমিক সংবিধান দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া কনভেনশনই ঘোষণা করিল যে যুদ্ধ শেষ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত 'বিপ্লবী' অর্থাৎ অস্বাভাবিক সরকারের হস্তে ফ্রান্সের শাসন পরিচালনার ভার থাকিবে। এই বিপ্লবী সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিল। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হইল জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির উপর। কয়েক মাসের মধ্যেই জননিরাপত্তা কমিটিই প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স শাসন করিতে থাকিল। জননিরাপত্তা কমিটির শোণিতাক্ত শাসনকাল ইতিহাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) বলিয়া কুখ্যাত। সন্ত্রাসের রাজত্বের সংস্থাগুলির মধ্যে সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি, জননিরাপত্তা কমিটি, বিপ্লবী বিচারালয়, বিপ্লব স্কোয়ার এবং সন্দেহের আইন ছিল প্রধান। সন্ত্রাস-শাসনের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিবিপ্লবীশক্তি ধ্বংস হইল। ভবিষ্যতে যাহাতে কোন প্রতিবিপ্লব দেখা না দেয় তাহার জন্য প্রায় চারলক্ষ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বন্দী

করা হইল। ইহাদের বিচারের জন্য একটি বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কিছু-দিনের মধ্যেই প্রায় ৪০ হাজার লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ইহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। অবশ্য অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়েরও বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রাণ হারাইল।

বিপ্লবী সরকার দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখিবার জন্য জিনিসপত্রের আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। কমিটিদ্বয় বিপ্লবী রক্ষীদল ও সন্ত্রাসকে কাজে লাগাইয়া কৃষকদের নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করিল। বিপ্লবী জনতা কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা বিত্তবানদের উপর অধিক কর এবং সম্পত্তির পুনর্বণ্টন দাবি করিল। এমন কি তাহারা ক্যাথলিক ধর্মের আমূল পরিবর্তন চাহিল। কনভেনশন অবশ্য ইহাতে রাজী হইল না। ধর্মের ক্ষেত্রে কনভেনশনকে সতর্কভাবে চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথাবিরুদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করিতে কনভেনশন বাধ্য হইয়াছিল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্যারিসের সর্বহারাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও ইহা কার্যে পরিণত করা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল তবুও সর্বহারাগণ ইহাতে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

সন্ত্রাস-শাসনের ফলে ফ্রান্সে এককেন্দ্রিক সরকার স্থাপিত হয়। এই শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও বিপ্লবকে রক্ষা করা। জননিরাপত্তা কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিহত ও জলস্থলে ইউরোপীয় শক্তিজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিল। হত্যা, ভীতি প্রদর্শন ও জোরজবরদস্তি, সন্ত্রাস রাজত্বকালের শাসন পরিচালনার মূল নীতি ছিল। দেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লব দেখা দিয়াছিল; ক্রমে সেগুলি নিশ্চিহ্ন করা হইল। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা হইল বাধ্যতা-মূলক। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা কয়েক লক্ষতে দাঁড়াইল। এই সৈন্যবাহিনী সুদক্ষ সেনাপতিদের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিল। ইংলণ্ডের নৌবাহিনী তুঁলো হইতে বিতাড়িত হইল এবং ডানকার্কের অবরোধ ভাঙিয়া পড়িল। অস্ট্রিয়া অয়াটিগনিস্ নামক স্থানে পরাজিত হইল এবং প্রাশিয়া ফ্লুরাস-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফ্রান্সের হস্তে বেলজিয়াম ছাড়িয়া দিল। হল্যাণ্ড হইতেও শক্তিজোটের সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত হইল। হল্যাণ্ড ও স্পেন ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিয়া শক্তিজোট পরিত্যাগ করিল। বাজেল (Basel)-এর সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রাশিয়া রাইন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এইভাবে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া ব্যতীত শক্তিজোটের সকলেই ফ্রান্সের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে বারজন সদস্য লইয়া গঠিত জননিরাপত্তা কমিটির মধ্যে মতবিরোধ এইভাবে দেখা দিয়াছিল। দেঁতো (Danton) ও তাঁহার অনুগামীরা সন্ত্রাস-শাসনের অবসান চাহিলেন। দেঁতো ছিলেন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রথম শ্রেণীর সংগঠক। তাঁহার বিরোধিতা করিলেন জেকোবিন দলের অন্যতম নেতা রোবস্পিয়র। তিনি সন্ত্রাস-শাসনকে আরও নিপীড়নমূলক করিতে চাহিলেন। উভয় পক্ষের এই দ্বন্দ্বে

সাময়িকভাবে জয় হইল রোবস্পিয়রের। ফলে দাঁতো ও তাঁহার অনুগামীরা গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। দাঁতোর মৃত্যুর পর রোবস্পিয়র ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হইলেন। তিনি তাঁহার ক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি এক ঘোষণার দ্বারা বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের কর্মপদ্ধতি আরও সংক্ষিপ্ত করিলেন। ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় গিলোটিন হইতে থাকিল। এই নূতন সন্ত্রাস-শাসন স্বাভাবিক অবস্থাতেও চলিতে থাকে। ফলে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকই এই ত্রাসের অবসান চাহিল এবং রোবস্পিয়র-বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হইল। বিপ্লবী পঞ্জিকার থার্মিডোর মাসের দুইটি দিনে (২৭শে ও ২৮শে জুলাই, ১৭৯৪) রোবস্পিয়র ও তাঁহার অনুগামীদের বন্দী করিয়া গিলোটিন করা হইল। ইহা থার্মিডোরিয়ান প্রতিক্রিয়া (Thermidorian Reaction) নামে পরিচিত।

থার্মিডোরিয়ান কনভেনশন ঃ রোবস্পিয়রের পতনের পরে সন্ত্রাস-শাসনের অবসান ঘটিল। শাসনক্ষমতা দেওয়া হইল তিনটি কমিটির উপর। খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুরী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইল। সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব আইনবিধি প্রবর্তন করা হইয়াছিল সেগুলি এবং বিপ্লবী ক্লাব বা সমিতিগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই সময় দেশে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৭৯৫-এর মার্চ মাসে জনসাধারণের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাদের রোষবহ্নি দাবানলের ন্যায় দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। একদিন কনভেনশনের বৈঠক চলাকালীন জনতা দরজা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহারা ১৭৯৩-এর সংবিধান কার্যকর করিতে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি জানাইল। কিন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী এই জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কনভেনশনের বামপন্থী সদস্যগণ বন্দী হইলেন। জনতা পুনরায় কনভেনশন আক্রমণ করিল কিন্তু সদস্যগণ তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিল। বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার করিয়া গিলোটিন করা হইল। এই সুযোগে রাজতন্ত্রীরা সচেষ্ট হইল কনভেনসনের ক্ষমতা উচ্ছেদ করিতে। এই গোলযোগ দমন করিবার ভার পড়িল তরুণ বয়স্ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উপর। তিনি প্যারিসের রাস্তায় কামান বসাইলেন। আন্দোলনকারীদের উপর কয়েকবার গুলিবর্ষণের পরই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইল। কনভেনশনের কর্তারা নেপোলিয়নের দৃঢ় সংকল্প ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইলেন।

থার্মিডোরিয়ান কনভেনশন কয়েকটি কালজয়ী কার্যও করিয়াছিল। প্রথমত, ১৭৯০ হইতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সংকটের উদ্ভব ঘটে তাহা দূরীভূত হইল—চার্চকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল।

নূতন সংবিধান ঃ কনভেনশন ফ্রান্সের জন্য নূতন সংবিধানও প্রণয়ন করিয়াছিল। এই সংবিধানটিকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। ইহাতে সম্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়া ভোটাধিকার দেওয়া হইল। ১৭৯০-এর মানবাধিকার ঘোষণার পরিবর্তে অধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণা জারি করা হইল। ইহাতে প্রতিটি মানুষ একই প্রকার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—বাক্যটি বাদ দেওয়া হয়।

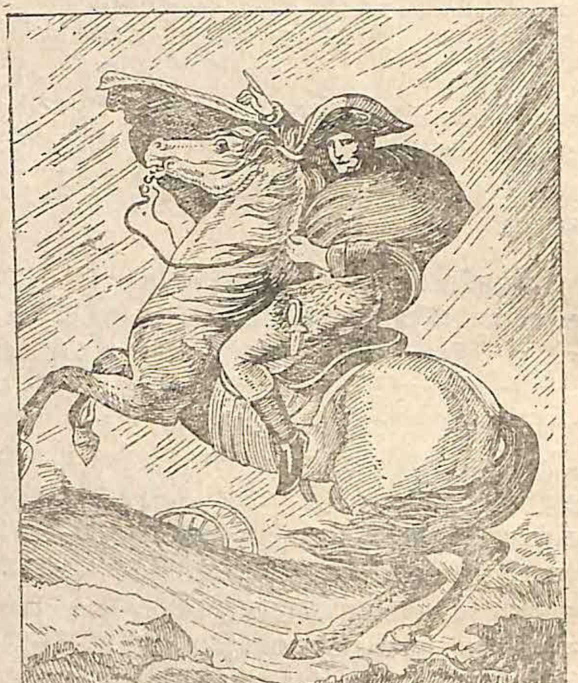
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দুইটি কক্ষের উপর দেওয়া হইল—৫০০ জন সদস্যবিশিষ্ট আইন পরিষদ এবং ২৬০ জন সদস্য-বিশিষ্ট কাউন্সিল অব এলডারস্। শাসনতান্ত্রিক

ক্ষমতা পাঁচজন ডাইরেক্টরের হাতে দেওয়া হইল এবং ইঁহাদের নামানুসারে এই সরকারের নাম হইল **ডাইরেক্টরী শাসন ব্যবস্থা**। আইন পরিষদ ইহাদের পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচন করিবে বলিয়া ঠিক হয়। ১৭৯১-এর সংবিধানে রাজাকে যে রকম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ইহাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বেশী ছিল। ডাইরেক্টরগণ মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারিতেন। পররাষ্ট্রনীতি, সমরবিভাগ, পুলিস ব্যবস্থা ও বেসামরিক শাসন ইঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। অটুট রাখা হইল ১৭৯১-এর শাসনতান্ত্রিক কাঠামো। তবে সন্ত্রাস-শাসন যাহাতে পুনরায় দেখা দিতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ডাইরেক্টরগণের শাসন: ডাইরেক্টরগণের শাসন মোট চারিবৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইঁহাদের শাসনকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। প্যারিসে জীবনযাত্রার মান অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭৯৫-এর নভেম্বরে মূল্যমান পাঁচহাজার গুণ বাড়িয়া যায়। গরীব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রহিল না। মেহনতী জনতার নেতা বহুবুফ (Baboeuf) এই সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক অভ্যুথান ঘটাইলেন। কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয়। বহুবুফ ও তাঁহার অনুচরদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় রাজতন্ত্রীরাও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিল। অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য ডাইরেক্টরী শাসন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিল এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকিল। ইটালীতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জয়যাত্রা ডাইরেক্টরী শাসনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিল। অধিকৃত অঞ্চল হইতে অর্থ আমদানির ফলে ফ্রান্সের আঁথিক অবস্থা স্থিতিশীল হইল। নেপোলিয়ন ইটালিতে কর বৃদ্ধি করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলেন এবং সেই অর্থ ফ্রান্সে পাঠাইলেন। ফলে ডাইরেক্টরগণ নেপোলিয়নকে অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহাদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতা রহিল না। সৈন্যবাহিনীর উপর তাঁহারা নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান অকর্মণ্য ডাইরেক্টরী শাসনের অবসান ঘটাইলেন এবং স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া নূতন এক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

নেপোলিয়ন: ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র কর্সিকা দ্বীপের আজাসিও নামক স্থানে এক ব্যবহারজীবীর গৃহে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি প্যারিসে সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীতে অধস্তন সেনাপতিরূপে প্রবেশ করেন। ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফরাসী দার্শনিকদের রচনা তিনি গভীর আগ্রহে পড়িতেন। দার্শনিক রুশোর মতবাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার বংশগত আভিজাত্য বলিয়া কিছু ছিল না। একারণে সামরিক বিভাগে উচ্চ পদে উন্নীত হইবার কোন সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সাম্যনীতি তাঁহার সম্মুখে এক অতুজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বিপ্লব শুরু হইলে নেপোলিয়ন ইহা হইতে সরিয়া থাকেন নাই। তিনি জেকোবিন দলের সভ্য হইলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তুঁলো (Toulon) বন্দরের উপর

ইংরাজ নৌবাহিনীর আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেন। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় তিনি জীবনে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। প্যারিসের উন্মত্ত জনতাকে অসিম সাহসের সহিত দমন করেন ও কনভেনশন সরকারকে রক্ষা করেন। তাঁহার সামরিক খ্যাতি ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে কনভেনসন কর্তৃক তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনাপতি পদে উন্নীত হন।



নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান (১৭৯৬-৯৭) **:** নেপোলিয়ন প্রথমেই ইটালী হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিবার জন্য সসৈন্যে ইটালী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সন্ধির শর্ত অনুসারে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার নিকট হইতে স্যাভয় ও নিস্ পাইল। সার্ডিনিয়ার পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন লম্বার্ডিতে প্রবেশ করিলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনী বাধা দিয়া বিফল হইল। তিনি সসৈন্যে মিলান শহরে প্রবেশ করিলে মিলান-বাসিগণ তাঁহাকে মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করে। ইহার পর তিনি আরকোলা ও রিভোলীর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া ভিনিস অধিকার করেন। এইরূপে উত্তর ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। নেপোলিয়ন পোপ অধিকৃত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইয়া পোপকে তোলেনশিও (Tolentio)-র সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি পোপের নিকট হইতে যে সব অঞ্চল হস্তগত করিলেন সেগুলির সমবায়ে সিজ-অ্যালপাইন প্রজাতন্ত্র নামে এক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপন করেন। ইটালী অভিযান সম্পূর্ণ হইবার পর নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরের দ্বারপ্রান্তে। অস্ট্রিয়ার সম্রাট উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহিত কম্পোফর্মিও (Campo-Formio)-র সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিশর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়া ফ্রান্সকে বেলজিয়াম ছাড়িয়া দিল এবং রাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ফ্রান্সের পূর্ব সীমানা স্বীকার করিয়া লইল। উত্তর ইটালীর লম্বার্ড ভিনিসিয়ার কতকাংশ, মডেনা প্রভৃতি অঞ্চল সিজ-

অ্যালপাইন প্রজাতন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হইল এবং জেনোয়ার লিগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র নামে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হইল তাহাও অস্ট্রিয়াকে স্বীকার করিতে হইল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবীদের ইংলন্ড ছাড়া আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। হল্যান্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। স্পেনও ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিল।

নেপোলিয়নের প্রাচ্য অভিযান (১৭৯৮-১৭৯৯) ঃ ইটালীতে অভাবনীয় জয়লাভের ফলে মাত্র ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক নেপোলিয়ন একজন প্রখ্যাত সেনাপতি হিসাবে সমগ্র ইউরোপ স্বীকৃতি পাইলেন। এদিকে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিবার পর ইংলন্ড ভিন্ন ফ্রান্সের আর শত্রু রহিল না। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ইংলন্ডের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল বলিয়া ফরাসীরা ইংলন্ড আক্রমণ করিতে পারে নাই। নেপোলিয়ন এইবার ইংলন্ডকে পরাভূত করিবার জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংলন্ডের শক্তির উৎস হইল তাহার বিস্তীর্ণ প্রাচ্য সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের সহিত যদি ইংলন্ডের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে ইংলন্ড হীনবল হইয়া পড়িবে; ফ্রান্সের পক্ষে তখন তাহাকে পরাজিত করা সহজ হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি মিশর জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ডাইরেক্টরগণ অনুমোদন করিলে তিনি জলপথে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মাল্টা দ্বীপ দখল করিয়া নেপোলিয়ন মিশরে উপস্থিত হইলেন। মিশরের মুসলমান শাসনকর্তা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে মিশর নেপোলিয়নের পদানত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন (Nelson) নীল নদের যুদ্ধে নেপোলিয়নের নৌ-বাহিনী ধ্বংস করিয়া দিলেন। ফ্রান্সের সহিত নেপোলিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু নেপোলিয়ন ইহাতে হতাশ না হইয়া সিরিয়া আক্রমণ করিলেন। সিরিয়ায় যখন তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তখন সংবাদ পাইলেন যে, ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্ক মিলিত হইয়া দ্বিতীয়বার ইউরোপীয় শক্তিসংঘ গঠন করিয়াছে। এই শক্তিসংঘের হস্তে ফরাসী সেনানায়কগণ বার বার পরাজিত হইতেছিল। এই অবস্থায় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নেলসনকে ফাঁকি দিয়া একখানি ছোট জাহাজে ফরাসী দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কন্সালেটের প্রতিষ্ঠা ঃ প্যারিসের অধিবাসিগণ নেপোলিয়নকে পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে। ফরাসী জনসাধারণের কোন অংশই ডাইরেক্টরী শাসনের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা এই শাসনের অবসান চাহিল। নেপোলিয়ন এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৭৯৯-এর ৯ই নভেম্বর তিনি এক অভ্যুত্থান ঘটাইয়া ফ্রান্সে ডাইরেক্টরী শাসনের ও ডিরেক্টরগণের পতন ঘটান এবং কন্সালেট নামক নূতন সরকার স্থাপন করেন। নেপোলিয়ন নিজেই নূতন সংবিধান রচনা করেন। ইহা হইতে নেপোলিয়ন যে কত বড় সংস্কারক ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন সংবিধানে জন-সাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; এমনকি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কোন উল্লেখ রহিল না। নেপোলিয়ন হইলেন প্রথম কন্সাল। তাঁহার হস্তে আইন প্রণয়ন ও সমগ্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইল। আইনের প্রস্তাবনা এবং মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী এবং

কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়োগ প্রথম কন্সালের মতানুযায়ী হইবে এই ব্যবস্থা হইল। ফলে নামে কন্সালেটের শাসন ব্যবস্থা হইলেও কার্যত ইহাতে প্রথম কন্সালের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অপর দুইজন কন্সালের কোন প্রকৃত ক্ষমতা রহিল না। তাঁহারা প্রথম কন্সাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন ঠিক হয়।

নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ নেপোলিয়ন আইন-পরিষদকে কাউন্সিল অব স্টেট, ট্রিবিউনেট, লেজিসলেটিভ বডি ও সিনেট—এই চারিটি সংস্থায় বিভক্ত করেন। পূর্বে আইন পরিষদের হাতে যে সব ক্ষমতা ও অধিকার ছিল সেগুলি এই চারিটি সংস্থার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। কাউন্সিল অব স্টেট শাসনতন্ত্রের মাথা স্বরূপ ছিল। নেপোলিয়ন ইহাতে কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতেন। এই সভার দুই রকমের দায়িত্ব ছিল—আইনের খসড়া প্রণয়ন করা এবং শাসন বিষয়ক মতপার্থক্য দূর করা। প্রথম প্রথম নেপোলিয়ন এই সভার বৈঠকে যোগ দিতেন, পরে ইহার কার্যাবলী সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখিতেন। ট্রিবিউনেট কেবলমাত্র প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিত। লেজিসলেটিভ বডি প্রস্তাবিত আইনটি ভোটাধিক্যে গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিত এবং সিনেটের কাজ ছিল আইনটি শাসনতন্ত্রের এক্তিয়ারের মধ্যে আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ বা বর্জন করা।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ঃ নেপোলিয়ন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন করেন নাই। প্রত্যেক জিলা বা ডিপার্টমেন্টের শাসন ব্যাপারে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিবার দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই সকল কর্মচারী তাহাদের কার্যাবলীর জন্য নেপোলিয়নের নিকট দায়ী থাকিত। এই সব কর্মচারীদের প্রিফেক্ট বা সাব-প্রিফেক্ট নামে অভিহিত করা হয়। বড় বড় কমিউনগুলির মেয়র নিযুক্ত করিতেন প্রথম কন্সাল। কমিউনগুলির শাসন কার্য পরিচালনার ভার ছিল মেয়রদের উপর। ছোট কমিউন-গুলিতে মেয়র নিযুক্ত করিতেন প্রিফেক্টগণ।

বিচার ও পুলিশ-বিভাগে সংস্কার ঃ বিচার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হইল। বিচারক নিয়োগে নির্বাচন পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়া হইল। ক্রমিক ক্ষমতাবিশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইল। আপিল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। একটি সুপ্রীম কোর্টও স্থাপিত হইল। পুলিশের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল না। বরং পুলিশকে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। ফলে যথেচ্ছ ভাবে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল।

অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য নেপোলিয়ন সবিশেষ চেষ্টা করেন। দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিবার জন্য ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স স্থাপিত হইল। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং কারিগরী উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হইল। সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য শুল্ক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইল। প্রত্যক্ষ কর ছাড়া অতিরিক্ত কোন প্রকার কর দেওয়া বন্ধ হইল। অবশ্য ব্যবসাদারগণ অতি মুনাফা যাহাতে না করিতে পারে সেদিকে নজর রাখা হইল। শাসন-কার্যের ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করা হইল।

সামাজিক সংস্কার ঃ সমগ্র দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করিবার জন্য নেপোলিয়ন বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সরকার নানারূপ গঠনমূলক কাজে

হাত দিলেন। ভূমিদাস প্রথা এবং সামন্ত প্রথার অবসান ঘটিল। বিপ্লবের ফলে ভূমি-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা অটুট রাখা হইল।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ঃ শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটিল। এই সময় ফ্রান্সের জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গঠন করা হয়। প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চারিটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত স্তরে ভাগ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল। প্রতিটি কমিউনে অন্তত একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুব্যবস্থা হইল। মাধ্যমিক ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নেপোলিয়ন ইউনিভারসিটি অব ফ্রান্স স্থাপন করেন।

সামরিক বিভাগ ঃ সামরিক বিভাগে নেপোলিয়ন আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। প্রতিভা ও দক্ষতাকে এই বিভাগে উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের সুশিক্ষিত করিবার জন্য সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার ঃ নেপোলিয়ন পোপের সহিত আপসে মিমাংসা করিতে সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পোপের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তিটিকে কনকরডাট (Concordat) বলা হয়। ইহাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। আরও ঠিক হয় যে উচ্চপদস্থ যাজকদের প্রথমে মনোনীত করিবেন প্রথম কন্সাল; তাঁহারা পোপের অনুমোদন লাভ করিলে ধর্মীয় শাসনাধিকার পাইবেন। নিম্নপদস্থ যাজকদের নিয়োগ করিবেন বিশপগণ কিন্তু ইহা প্রথম কন্সাল অনুমোদন না করিলে কার্যকর হইবে না। চার্চের সহিত আপসের ফলে একদিকে যেমন ফ্রান্সে ধর্মসম্বন্ধীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইল অপরদিকে তেমনি ধর্মপ্রাণ ফরাসী জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র তথা সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইল। নেপোলিয়ন অবশ্য ধর্মোপাসনার সর্বজনীন স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

কোড নেপোলিয়ন ঃ নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও স্থায়ী কাজ হইল—ন্যায়সংহিতা বা কোড নেপোলিয়নের প্রবর্তন। তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধনের জন্য এক অভিন্ন আইনবিধির সংকলনের জন্য মনোযোগী হন এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমগ্র দেশের জন্য এক আইনবিধি রচনা ও প্রবর্তন সম্ভব হয়। মোট পাঁচটি আইনবিধি লইয়া কোড নেপোলিয়ন রচিত হয়। কোড নেপোলিয়নে বিপ্লবের আদর্শ ও সুফলগুলি স্থায়ী আসন লাভ করে। আইনের চোখে সকলেই সমান—এই গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে এই বিধানাবলী রচনা করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহাকে অনুসরণ করিয়া প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়।

সরকারী কাজে নিযুক্ত যে সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী নির্দিষ্ট কর্তব্য-সাধনের দ্বারা আদর্শ দেশসেবার পরিচয় দিতে পারিবেন তাঁহাদের Legion of Honour প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্মানের বন্দোবস্ত করা হয়।

প্রথম কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়ন যে সব যুগান্তকারী সংস্কার প্রবর্তন করেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি কালজয়ী হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কারগুলি পর্যালোচনা

করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নেপোলিয়ন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিপ্লবের আদর্শের প্রতি তাঁহার মোটামুটি আস্থা ছিল। তিনি সাম্যনীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সংস্কারমূলক কার্যে হাত দিয়াছিলেন। আইনের সমদর্শিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, জাতীয় শিক্ষার প্রচলন, গুণানুসারে উন্নতির সুযোগ ইত্যাদির মানদণ্ড হইল সাম্যনীতি। কিন্তু এই সকল সুযোগ-সুবিধা ফরাসী জনসাধারণ পাইয়াছিল তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়া। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতা তিনি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চিহ্নও তিনি রাখেন নাই। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে সভ্য, রীতিবন্ধ ও সমুন্নত শাসন ব্যবস্থার পত্তন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শক্তি-সংঘের সহিত যুদ্ধ ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নীল নদের যুদ্ধে নেলসনের জয়লাভের পর ফরাসীদের শত্রুগণ পুনরায় ইংলণ্ডের সহিত যোগদান করে। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, তুরস্ক ও ইংলণ্ড মিলিত হইয়া দ্বিতীয়বার শক্তিসংঘ গঠন করিয়াছিল। এই শক্তিসংঘের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ফরাসী সেনানায়কগণ পরাজিত হইতে থাকে। এমন কি জার্মানী ও ইটালী হইতে ফরাসী সৈন্য সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল হইবার ছয় মাসের মধ্যেই কিন্তু যুদ্ধের গতি আবার ফিরিয়া গেল। ইংলণ্ড সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত বলিয়া নেপোলিয়নের সমস্ত রোষ অস্ট্রিয়ার উপর পড়িল। তিনি সেনাপতি মোরোকে (Moreau) জার্মানীর ভিতর দিয়া অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং নিজে ইটালী হইতে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কারের জন্য দায়িত্ব লইলেন। অসীম সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখাইয়া তিনি সসৈন্যে আল্পসের সেণ্ট্ বার্নার্ডে গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ম্যারেঙ্গোর (Marengo) যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। আবার সেনাপতি মোরো হোহেনলিণ্ডেন (Hohenlinden)-এর যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন। এই দুইটি চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে লুনাভেলে (Lunevilla) সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার দ্বারা নেপোলিয়ন ইটালীতে যে সব পরিবর্তন আনিয়াছিলেন সেগুলি এবং ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে হল্যাণ্ডকে বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তন ইত্যাদি অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। ইহা ছাড়া জার্মানীতে ফ্রান্সের আধিপত্যও অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে হইল। দ্বিতীয় শক্তি-সংঘেরও এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তি ঃ প্রথম কন্সাল হইয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাইবার ও ফ্রান্সের নৌ-শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। সান ডোমিনিগো দ্বীপে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন এবং উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত লুসিয়ানা নামক স্থানটি স্পেনের নিকট হইতে হস্তগত করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত নৌশক্তিতে পাল্লা দিবার মত দক্ষতা তিনি অর্জন করিতে পারিলেন না। এই কারণে ইংলণ্ডকে নির্বান্ধব করিবার জন্য কূটনীতির আশ্রয় লইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক ও স্পেন ইংলণ্ডের জাহাজ তালাসী অধিকারের প্রতিবাদকল্পে সংঘবদ্ধ হইল। ইংলণ্ড ইহাতে ভীত হইল না। বরঞ্চ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নেলসন

কোপেনহেগেনের যুদ্ধে দিনেমার নৌবাহিনীকে ধ্বংস করিলেন। সুতরাং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জলপথে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি অটুট রহিল। এই সময় নেপোলিয়ন অন্তত সাময়িকভাবে ইংলণ্ডের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহী হইলেন। ইংলণ্ডও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া রণক্লান্ত হইয়াছিল। ফলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে আমিয়াঁর (Amiens) সন্ধিপত্র দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির ফলে জলপথে ইংলণ্ডের ও স্থলপথ ফ্রান্সের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। ইংলণ্ড প্রতিশ্রুতি দিল সিংহল ও ট্রিনিডাড ব্যতীত অন্যান্য বিজিত দ্বীপ ও প্রদেশ পূর্বতন মালিকদের ফিরাইয়া দিতে। মাল্টা দ্বীপ ইতিমধ্যে ইংরেজদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাও এই সন্ধি-অনুসারে ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। ফরাসীরা বেলজিয়াম পাইল। রাইন নদী হইল তাহাদের রাজ্যের পূর্ব সীমানা।

সম্রাট নেপোলিয়ন ঃ নেপোলিয়নের প্রবর্তিত সংস্কারগুলি তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি তাহাতে সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন এজন্য ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি গণ-ভোটের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে আমরণ কন্সাল পদে বহাল করা হয়। দুই বৎসর পরে সেনেটের প্রস্তাব অনুসারে তিনি সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন (১৮০৪)। নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভা, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি ফরাসী জন-সাধারণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেনাপতি হিসাবে তিনি ফ্রান্সের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে লইয়া যান। জনসাধারণ তাঁহাকে ফরাসী বিপ্লব-সৃষ্ট নেতা হিসাবেই মনে করিত এবং তাঁহার হস্তে বিপ্লব-প্রসূত পরিবর্তনগুলি অটুট থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করিত। প্রথম কন্সাল হিসাবে তিনি যেভাবে ফ্রান্সের উন্নতি সাধন করেন তাহাতে জনসাধারণের প্রত্যাশা আরও দৃঢ় হয়। এই কারণে নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের ভূলুণ্ঠিত রাজমুকুট নিজে গ্রহণ করিতে চাহিলেন তখন জনসাধারণ তাঁহাকে ফ্রান্সের ত্রাতা হিসাবে তাহাদের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা রহিল না। নেপোলিয়ন সম্রাট হইবার ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক কিছু পরিবর্তন ঘটিল। তিনি রাজমর্যাদাও পছন্দ করিতেন। ফ্রান্সের জাতীয় পতাকায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হইল এবং নেপোলিয়ন ভক্তদের জন্য বিভিন্ন পদবী ও সম্মানের ব্যবস্থা হইল। তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য প্রিন্স পদবী অনুমোদন করা হইল। প্রবর্তন করা হইল বংশানুক্রমিক অভিজাত শ্রেণীর। অবশ্য ইহাদের বিশেষ অধিকার বলিয়া কিছু রহিল না। প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাঠামো মোটামুটি অটুট রাখা হইল।

ইউরোপীয় সমর—তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ঃ অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঃ

আমিয়াঁর চুক্তিটি ছিল প্রকৃতপক্ষে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। ইহাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয় নাই। নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের পথে প্রধান বাধা হইল ইংলণ্ড। ইংলণ্ড বুঝিল যে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান পুরাতন ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতারই নবরূপ। ফলে এই দুই পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রের মধ্যে অনিবার্যভাবে সংঘর্ষ শুরু হইল। নেপোলিয়ন ইংরাজ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। কারণ নৌশক্তির অভাবে ইংলণ্ডকে সরাসরি আক্রমণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়ন প্রথমেই

হল্যাণ্ড ও ইটালীতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানীতে বাধা সৃষ্টি করিলেন। ইহার উত্তরে ইংলণ্ড আমিয়াঁর সন্ধি-শর্ত অনুযায়ী মাল্টা দ্বীপ ত্যাগ করিল না এবং নেপোলিয়নকে এই মর্মে এক চরমপত্রাঘাত দিল যে হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও পিডমণ্ট হইতে ফরাসী আধিপত্য তুলিয়া লইতে হইবে। এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে আমিয়াঁ চুক্তির অবসান ঘটিল এবং যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থই এই যুদ্ধের মূল কারণ। স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিল। ইংরাজ নৌবাহিনী খুব তৎপরতার সহিত ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইল। ফরাসী নৌবাহিনী পর্যুদস্ত হইল। কিন্তু কেবলমাত্র নৌযুদ্ধের দ্বারা নেপোলিয়নের শক্তি ধ্বংস করা যাইবে না, একথা ইংলণ্ডের অজানা ছিল না। এই কারণে ইংলণ্ড ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে মিত্রের সন্ধানে রহিল। ফ্রান্সের হস্তে পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়া ক্ষুব্ধ ছিল। নেপোলিয়নের নিকটপ্রাচ্য ভূখণ্ডে অভিযানের ফলে রাশিয়া শংকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ইংরাজদের উদ্যোগে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নেপলস্ এবং ইংলণ্ডকে লইয়া ফ্রান্সবিরোধী তৃতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। ইউরোপীয় জনশক্তিকে রসদ জোগাইবার জন্য ইংলণ্ড অকাতরে অর্থব্যয় করিতে থাকিল। প্রাশিয়া নিরপেক্ষ রহিল। ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ প্রমুখ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের পক্ষে রহিল। তৃতীয় রাষ্ট্রজোট গঠনের সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন ইটালী সমরাঙ্গনের দায়িত্ব সেনাপতি ম্যাসেনার হস্তে অর্পণ করিয়া তড়িৎগতিতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উল্মের (Ulm) যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ট্রাফাল্গারের নৌযুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি নেলসনের হাতে ফরাসী নৌবাহিনী ধ্বংস হইল। ফলে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড অভিযানের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইল। স্থলভাগে সাফল্যকে ত্বরান্বিত করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন পথ ছিল না। তিনি অস্টারলিজের (Austerlitz) প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। নেপোলিয়ন বিজয়গর্বে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবেশ করিলেন। এমতবস্থায় অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং ফ্রান্সের সহিত প্রেসবুর্গের (Pressburg) সন্ধি স্বাক্ষরিত করিল। এই সন্ধির ফলে অস্ট্রিয়া ভেনিস, টাইরল, ডালমেসিয়া প্রভৃতি অঞ্চল নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়ন ইটালীর রাজা হিসাবে গণ্য হইলেন।

প্রাশিয়া ও রাশিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ঃ প্রাশিয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোটে যোগ দিবে না এবং নিরপেক্ষ থাকিবে ঠিক হইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকৃত হ্যানোভার দান করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে মনান্তর দেখা দিল। তৃতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হইবার সময় প্রাশিয়ার জনসাধারণ ইহাতে যোগ দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজা তখন নিরপেক্ষ থাকিতে মনস্থ করেন। অথচ অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটিবার ফলে তৃতীয় রাষ্ট্রজোট যখন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তখন দীর্ঘ দশ বৎসরের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া প্রাশিয়ার রাজা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নেপোলিয়ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া এনার (Jena) ও অরস্টাডের (Auerstodt) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করিয়া বার্লিনে

প্রবেশ করিলেন। সোনবার্ণের চুক্তিদ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। প্রাশিয়ার এক বৃহদংশ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইল।

এইবার আসিল রাশিয়ার পালা। অস্টারলিজের যুদ্ধের পরাজয়ের পর রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। কিন্তু পোল্যাণ্ডের দিকে ফরাসী সৈন্যের অগ্রগতি দেখিয়া রাশিয়া ভীত হইল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পরাজিত প্রাশিয়া সাহস সঞ্চয় করিল এবং রাশিয়ার সহিত যোগ দিল কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে (Friedland) রাশিয়া ও প্রাশিয়া উভয়ে চরম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙিয়া পড়িল। ফ্রিডল্যাণ্ডের জয়-পরাজয়ের পরে নেপোলিয়ন ও রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের এক সাক্ষাৎকার ঘটে; রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে পরিকল্পনা হইল ইউরোপ ভাগাভাগি করিবার। তিনটি পৃথক্ চুক্তির সমন্বয়ে টিলসিট (Tilsit) চুক্তি তৈয়ারী হইল। রাশিয়ার ক্ষতি হইল না কিন্তু ইহার বিনিময়ে প্রাশিয়ার স্বার্থ রাশিয়া বিসর্জন দিল। পশ্চিম জার্মানীর কিয়দংশ এবং হ্যানোভার লইয়া গঠিত হইল ফ্রান্সের অনুগত ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য। প্রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত পোল্যাণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত হইল গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারশ (Grand Dutchy of Warsaw)। চুক্তির একটি গোপন ধারা অনুসারে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে সুইডেনের নিকট হইতে ফিনল্যাণ্ড দখল করিবার সুযোগ দিলেন। রাশিয়া উত্তর ইউরোপে বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিহত করিতে স্বীকৃত হইল।

টিলসিটের সন্ধি স্থাপনের ঘটনা নেপোলিয়নের কূটনৈতিক দক্ষতার অবিসংবাদিত প্রমাণ-রূপে স্বীকৃত হইল এবং ইহার পরেই নেপোলিয়ন তাঁহার ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে পেঁছান। অস্ট্রিয়া পরাজিত; প্রাশিয়া ভূলুণ্ঠিত এবং রাশিয়া অনুগত মিত্রে পরিণত হইল। প্রেসবুর্গ, সোনবার্ন এবং টিলসিট সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপের বহু অঞ্চল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। সংক্ষেপে, সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ থাকিল না। কেবলমাত্র ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের সহিত কোনরূপ রফা করিতে রাজী ছিল না। এদিকে ইংলণ্ডকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করাও নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। এই কারণে তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করিলেন। নেপোলিয়নের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই অভিনব সংগ্রাম ইতিহাসে 'কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম' নামে পরিচিত।

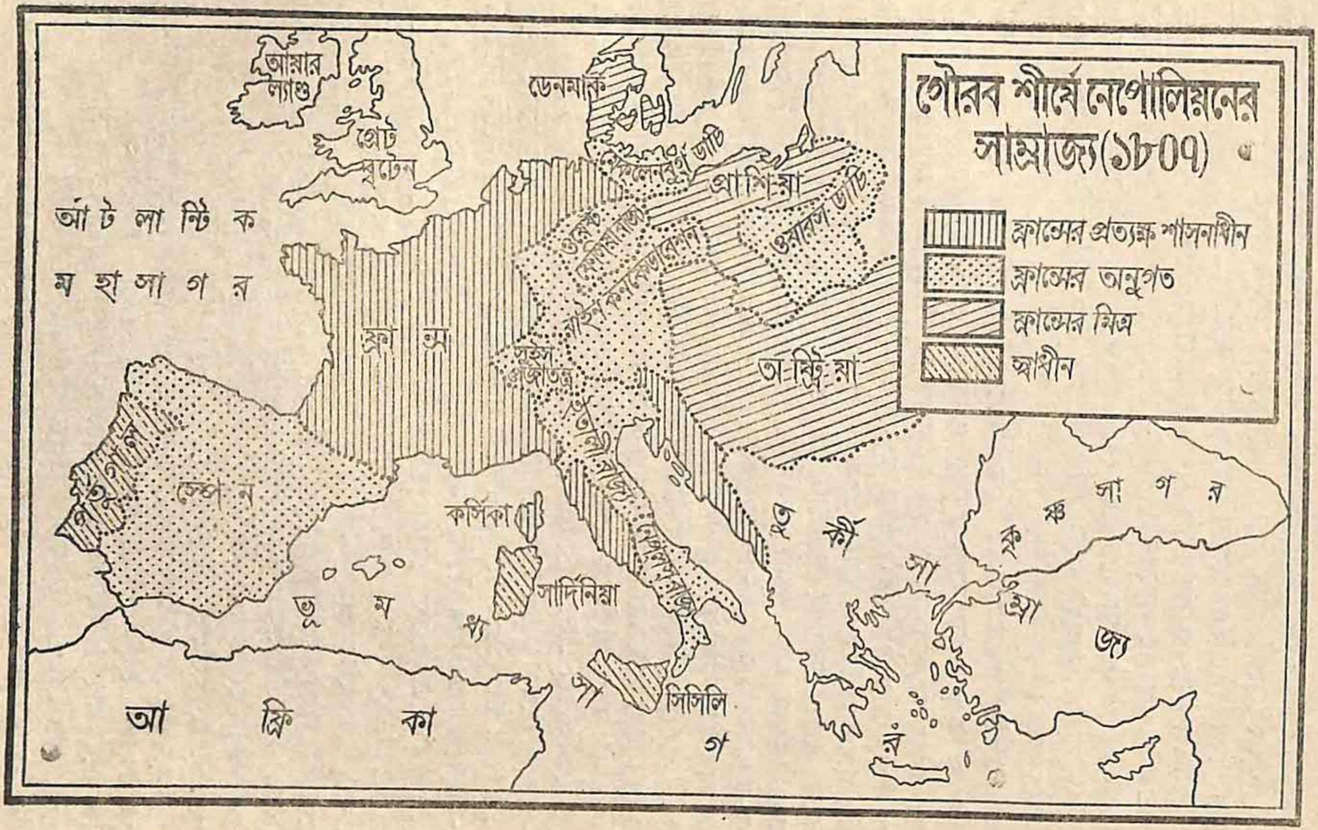
নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন : টিলসিটের সন্ধিতে ফরাসী সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। পশ্চিম ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া এই সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। উত্তরে উত্তর সাগর হইতে দক্ষিণে ইটালীয় পো নদী এবং দক্ষিণে পিরেনিজ পর্বত হইতে পূর্বে জার্মানীর রাইন নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ফ্রান্সের শাসনাধীনে আসে। ইহার বাহিরে অবস্থিত ছিল বহু অনুগত মিত্ররাষ্ট্র। উত্তর ইটালীর পূর্বতন সিজ্‌আলপাইন প্রজাতন্ত্র ইটালী রাজ্যে (Kingdom of Italy) রূপান্তরিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন স্বয়ং এই রাজ্যের রাজা ছিলেন; তাঁহার জনৈক প্রতিনিধি রাজ্যটি শাসন করিতেন। দক্ষিণ ইটালীর নেপল্‌স্ রাজ্যের রাজপদ তাঁহার ভ্রাতা যোসেফকে দেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতা লুই হল্যাণ্ডের রাজা হন। তাঁহার অপরাপর কয়েকজন

আত্মীয় এবং অনুগত সেনাপতিদের তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনভার অর্পণ করেন। সুইজারল্যাণ্ড তাঁহার অধীনে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গঠিত হইল। ইহা ছাড়া গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, স্পেন এবং পোপের রাজ্যও তাহার প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল। মধ্য ইউরোপে তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি জার্মানীর পুনর্গঠন করেন। পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, উরটেমবুর্গ, বাডেন এবং আরও কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র লইয়া তিনি রাইন রাষ্ট্রসংঘ (Confederation of the Rhine) গঠন করেন। এই রাষ্ট্রসংঘের রাজারা তাঁহাকে রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। ইহার সহিত পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। ফলে এক হাজার বৎসরের পুরাতন পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। পরে স্পেন ও পর্তুগাল দখল করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

নেপোলিয়ন ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চলে প্রাচীন রাজতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ-স্থাপনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে, প্রাচীন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জাতীয়তাবাদ প্রবল হইবে। এই জাতীয়তাবাদ-প্রসারের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল।

বর্তমান যুগে ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর কোন সম্রাট স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও ঔজ্জ্বল্য অস্বীকার করা যায় না সত্য তথাপি ইহা বলা যায় যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ত্রুটিমুক্ত ছিল না। প্রথমত, বহুজাতিভিত্তিক স্ববিরোধীতায় পরিপূর্ণ ও স্বার্থ-সংঘাতে জর্জরিত এই বিশাল সাম্রাজ্য তখনকার কালে একজনের পক্ষে শাসন করা অসম্ভব ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাইয়া নিজেরই স্বার্থহানী ঘটান। কারণ সাম্রাজ্যে কোন নূতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জটিল সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। ১৮০৭ হইতে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই সময়ে নেপোলিয়নকে তাঁহার সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহাকে পরাজিত রাষ্ট্র-গুলির বিরোধিতার মোকাবিলা করিতে হইয়াছিল; নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সব বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের ফলে তাঁহার শক্তি হ্রাস পায় এবং পরিণামে তাঁহার পতন অনিবার্য হইয়া উঠে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা (Continental System) ঃ নৌশক্তিতে ইংলণ্ডকে পরাজিত করা সম্ভব না হইলেও অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা তাহাকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া নেপোলিয়ন মনে করিলেন। এনার (Jena) যুদ্ধে প্রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে এবং রাশিয়ার সহিত টিলসিটের সন্ধির ফলে ইউরোপের উত্তর উপকূল ভাগ নেপোলিয়নের আওতায় আসে, আর এই পথেই ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বার্লিন ডিগ্রি ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বলা হইল যে গ্রেট ব্রিটেনকে অবরোধ করা হইয়াছে; তাহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা হইল। ব্রিটেনের পণ্য বা ব্রিটেন হইতে আমদানী যে কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হইবে।


গৌরব শীর্ষে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮০৭)
ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন
ফ্রান্সের অনুগত
ফ্রান্সের মিত্র
স্বাধীন
আয়ার ল্যাণ্ড
গ্রেট বৃটেন
ডেনমার্ক
আটলান্টিক মহাসাগর
ফ্রান্স
প্রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
সুইস প্রজাতন্ত্র
স্পেন
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
সিসিলি
তুর্কী সাম্রাজ্য
কৃষ্ণসাগর
ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা

সুতরাং মহাদেশীয় অবরোধ শুরু হইয়াছিল ব্রিটেনের রপ্তানীর উপর, আমদানীর উপর নহে। অর্থাৎ ইহাকে অবরোধ না বলিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জন বলা যাইতে পারে। ইংরাজ সরকার বার্লিন ডিগ্রির উত্তর হিসাবে "অর্ডার্স-ইন্ কাউন্সিল" জারি করিল। ইহাতে বলা হইল যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে কোন ইংরাজ বন্দরে ছাড়পত্র লইয়া যাতায়াত করিতে হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন "ফনতানব্লো" ও মিলান ডিগ্রির দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পরিবাহী জাহাজগুলি "অর্ডার্স-ইন্ কাউন্সিলের" নির্দেশ মানিয়া চলিলে সেগুলিকে ব্রিটিশ জাহাজ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মহাদেশীয় ব্যবস্থার সাফল্য ঃ নেপোলিয়নের নৌশক্তি প্রবল ছিল না। ফলে মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রথমে বিশেষ কার্যকর হয় নাই। তবে টিলসিটের সন্ধির পর এই ব্যবস্থা কঠোর হইয়াছিল এবং বৃটেনের আর্থিক ক্ষতিও হইতে থাকিল আর ঠিক এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে আমেরিকায় ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায়। ১৮০৮-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই অবস্থা চলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুরবস্থা হইতে ব্রিটেন কিছুটা রেহাই পায় উপদ্বীপের যুদ্ধের (Peninsular war) ফলে। নেপোলিয়নও তাঁহার মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিলেন। চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে নেপোলিয়ন নিজেই ব্রিটেনের সহিত ফরাসী মদ্য ও সিল্কের বিনিময়ে এবং উচ্চ শুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি দিলেন। এই লাইসেনস্ পদ্ধতি "ত্রিয়াননের" ডিগ্রি দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। ভাগ্রামের (Wagram) যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন ইউরোপের উপর নূতন করিয়া তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেশীয় অবরোধ পূর্বাপেক্ষা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিবার সুযোগ হইল। তিনি ফনতানব্লোর দ্বিতীয় ডিগ্রি দ্বারা (১৮১০) ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করিবার নির্দেশ দিলেন। বে-আইনী আমদানী বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করা হইল। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে এবং গ্রেট ব্রিটেন শীঘ্রই এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দেশে বেকারের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল। বহু কল-কারখানা বন্ধ হইয়া গেল। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনকে গম আমদানী করিতে হইল। নেপোলিয়ন গ্রেট ব্রিটেনের আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে আত্মসমর্পণের দিন গুণিতে থাকিলেন। তিনি ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডকে সোনার বিনিময়ে ইংলণ্ডকে গম সরবরাহ করিবার অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি দিয়া তিনি ভুল করিয়াছিলেন। ইহা বন্ধ রাখিতে পারিলে ইংলণ্ডের অবস্থা কি হইত বলা শক্ত।

কিন্তু মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা পরিশেষে ব্যর্থ হয়। ইহার ব্যর্থতার পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়ন এই ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে ও একটানাভাবে বলবৎ রাখেন নাই। দ্বিতীয়ত, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার পরাজয় ঘটিলে ইংলণ্ডও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা যতটা খারাপ বলিয়া মনে করিতেন ততটা খারাপ ছিল না। এই সময় ইংলণ্ড শিল্পে যেরূপ উন্নতি করিয়াছিল সে সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন না। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থা দ্বারা নেপোলিয়ন

কেবলমাত্র ইংল্ডকে ধ্বংস করিতে চাহেন নাই, তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে ইউরোপের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমণি করা। কিন্তু এই সময় ফ্রান্সে যেরূপ শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার দ্বারা ইউরোপের চাহিদা মিটানো সম্ভব ছিল না। ফরাসী অর্থনীতিও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইউরোপের দেশগুলিরও চড়াদামে ফরাসী পণ্য কিনিবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতেই তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে, ফলে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যও বন্ধ হইয়া যায়। ফ্রান্সের মাহরসালজ (Marsailles), বর্দো প্রভৃতি বন্দরগুলি অকেজো রহিল এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল। শেষের দিকে ফরাসী শিল্পপতিরাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকিবার ফলে বিশেষ কার্যকর হয় নাই। নেপোলিয়নও এই ব্যবস্থা একটানাভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন নাই। আবার ইহার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়িতে হয়। স্বভাবতই তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং নেপোলিয়নের শাসনের অবসান কামনা করিতে থাকে। ইহাদের শাস্তি দিবার জন্য নেপোলিয়ন অন্যায় ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তাঁহাকে ধন ও জনক্ষয়কারী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

স্পেনের যুদ্ধ (১৮০৭-১৮১৪)—নেপোলিয়নের পতনের সূত্রপাত: নেপোলিয়ন জোর করিয়া ইউরোপীয় দেশগুলিকে তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে জনসাধারণকে আর্থিক দুর্গতিতে পড়িতে হয়। ইহার ফলে সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে পর্তুগালে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পর্তুগাল ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইতিহাসে ইহা উপদ্বীপের যুদ্ধ (Peninsular war) নামে পরিচিত।

পর্তুগালকে মহাদেশীয় ব্যবস্থার আওতায় আনিবার প্রচেষ্টা এবং সেই সূত্রে স্পেনকে অধীনে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই উপদ্বীপের যুদ্ধের সূচনা। বহুকাল হইতে পর্তুগাল ইংলন্ডের মিত্ররাষ্ট্র ছিল। নেপোলিয়নের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পর্তুগাল এই মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিল। ফলে নেপোলিয়ন পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফরাসী সৈন্য সহজেই পর্তুগাল অধিকার করিল। কিন্তু পর্তুগালকে অধীনে রাখিতে হইলে স্পেন অধিকারের প্রয়োজন ছিল। সে কারণে নেপোলিয়ন স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এই সময় স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস ও তাঁহার পুত্র ফার্ডিন্যান্ডের মধ্যে কলহ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন মধ্যস্থতার ভান করিয়া উভয়কে তাঁহার নিকট নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করিতে বলিলেন। ইহার পর তিনি স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লসকে পেনসন দিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং পুত্র ফার্ডিন্যান্ড কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। স্পেনের সিংহাসন এইভাবে খালি হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইলেন।

নেপোলিয়নের এই বেআইনী কাজ স্পেনবাসী নীরবে স্বীকার করিয়া লইল না। স্পেনের জনসাধারণের উপর ক্যাথলিক চার্চের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। স্পেনীয় যাজকগণ

জনসাধারণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হন। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া ইংলণ্ড পর্তুগাল ও স্পেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লির* নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য ফরাসীদের পরাজিত করিয়া পর্তুগাল ত্যাগ করিতে বাধ্য করে (১৮০৮)। যোসেফ বোনাপার্টও স্পেন হইতে পলায়ন করেন। ইংরাজ সেনাপতি স্যার জন মুর সসৈন্যে স্পেনে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহী স্পেনবাসীদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন নেপোলিয়ন স্বয়ং স্পেনে উপস্থিত হইয়া রাজধানী মাদ্রিদ পুনরধিকার করিলেন এবং করুণা (Coruuna)-র যুদ্ধে মুরকে পরাজিত করিয়া ইংরেজদের স্পেন হইতে বিতাড়িত করিলেন (১৮০৯)। পর্তুগাল কিন্তু ইউরোপে ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি হইয়া রহিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার ওয়েলেসলি টানাভারার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ফরাসী প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি লিসবনের নিকট 'টরেস ভেদ্রাস' (Torres Vedras) নামক একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে আশ্রয় লইলেন। পর্তুগালে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করিতে ব্যর্থ হইয়া ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বাহিনী পর্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া স্পেনে চলিয়া আসিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিলে স্পেন হইতে বহু ফরাসী সৈন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেল। তখন সুযোগ বুঝিয়া ওয়েলেস্‌লি সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া স্পেনীয়দের সহিত একজোটে স্যালামেঙ্কার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এবং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। যোসেফ ও ফরাসী বাহিনী স্পেনের উত্তর সীমান্তে আশ্রয় লইল। পরবৎসর আর্থার ওয়েলেসলি ভিত্তোরিয়া নামক স্থানে ফরাসী বাহিনীতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া স্পেন হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিলেন। স্পেনে নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল।

স্পেনীয় সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া ঃ স্পেনীয় জাতীয় জাগরণ ও প্রতিরোধ স্পেনেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহার তরঙ্গ ইউরোপে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে অনুভূত হইল। অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে নেপোলিয়ন স্পেন হইতে দ্রুত অগ্রসর হইয়া অস্ট্রিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ভিয়েনা দখল করিলেন। ভাগ্রামের (Wagram) যুদ্ধে অস্ট্রিয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ১৮০৯-এর জুলাই মাসে ভিয়েনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়াকে রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হইল। সৈন্যবাহিনী হ্রাস করিতে এবং মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে অস্ট্রিয়া স্বীকৃত হইল। অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মারিয়া লুইসাকে নেপোলিয়ন বিবাহ করিলেন।

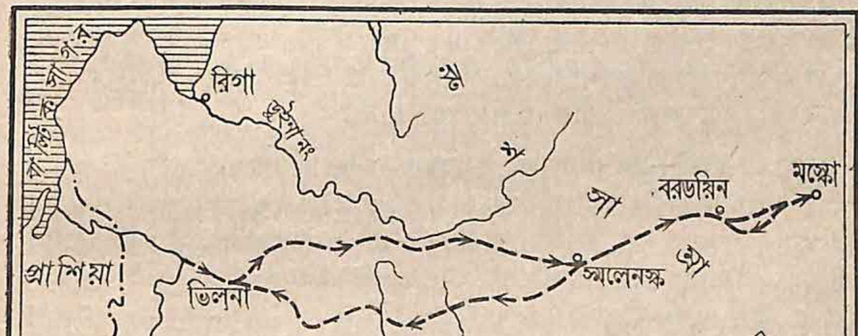
ইতিমধ্যে প্রাশিয়ায় সংস্কার আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রাশিয়ার রাজা বাধ্য হইয়া বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রাশিয়াকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

রাশিয়ার সহিত বিরোধ ঃ মস্কো অভিযান ঃ এদিকে আলেকজাণ্ডারের সহিত নেপোলিয়নের বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হইল না। ইহার পিছনে অনেকগুলি কারণ

*ইনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা ছিলেন। পরে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে অভিহিত হন এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন।

ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে যতটা সাহায্য চাহিয়াছিলেন তাহার প্রতিদানে কিন্তু তিনি আলেকজাণ্ডারকে ততটা সাহায্য করিতে চাহিলেন না। অর্থাৎ টিলসিটের সন্ধির পর দুইজনের মধ্যে যে সমঝোতার ভাব দেখা দেয়, কয় বৎসরের মধ্যেই তাহার ভাঙন পরিলক্ষিত হয়। কার্যকালে দেখা গেল রাশিয়ার দায়িত্ব বেশি এবং ফ্রান্সের দাবি বেশি। আর ইহা যখন স্পষ্টভাবে দেখা দিল তখন নেপোলিয়নের সহিত রাশিয়ার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইল।

দ্বিতীয়ত; পর্তুগাল ও স্পেনে ফরাসী বাহিনী যেভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা দেখিয়া নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে জার আলেকজাণ্ডারের যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিল। তৃতীয়ত, পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে নেপোলিয়ন ও জারের ভুল বোঝাবুঝি হইল। গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ স্থাপন জার রুশ-বিরোধী বলিয়া মনে করেন। চতুর্থত, নেপোলিয়ন জারের ভগ্নিপতি ডিউক অব ওল্ডেনবার্গের নিকট হইতে ওল্ডেনবার্গ রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে জার নেপোলিয়নের প্রতি রুষ্ট হন। সর্বোপরি নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার কারণ হইল মহাদেশীয় ব্যবস্থা। জার এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্য নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যিক



সম্পর্ক ছিন্ন করিলে রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। সুতরাং তিনি মহাদেশীয় ব্যবস্থা মানিতে চাহিলেন না। তিনি নেপোলিয়নকে একটি চরম পত্র পাঠাইলেন। তিনি দাবি জানাইলেন যে, রাশিয়ার স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকার ও সীমান্তবর্তী দেশগুলি হইতে ফরাসী-সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। এই পত্র পাইয়া নেপোলিয়ন জারের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি দুর্বিনীত জারকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় ছয়লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী লইয়া ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন

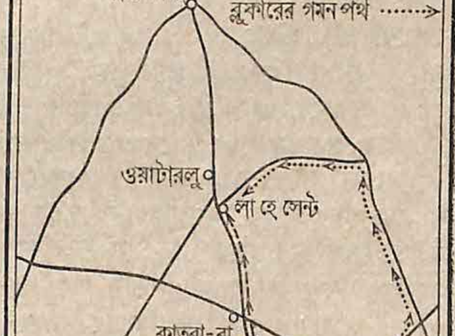
মাসে রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। রাশিয়ান সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পশ্চাদ-পসরণ করিতে লাগিল এবং সংগে সংগে অগ্নিসংযোগ করিয়া সমগ্র পরিত্যক্ত অঞ্চল ধ্বংস করিয়া দিল; যাহাতে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী কোন রসদ অথবা আশ্রয় না পায়। যুদ্ধের ইতিহাসে ইহাকে 'পোড়া-মাটি' নীতি বলা হয়। মস্কো অভিযানের পথে একমাত্র উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হইল বরডিয়নে। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেন এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে উপনীত হইয়া তিনি রুশ সৈন্যের বদলে এক বিরাট ধ্বংসস্তুপ দেখিতে পাইলেন। রুশ বাহিনী যুদ্ধ না করিয়া আরও পিছনে সরিয়া গেল। নেপোলিয়ন রাশিয়ার এক প্রকাণ্ড অঞ্চল দখল করিলেন সত্য কিন্তু তিনি রুশবাহিনী ধ্বংস করিতে পারিলেন না। সুতরাং রাশিয়া জয় করা হইল না। অবশেষে নেপোলিয়ন বুঝিতে পারিলেন যে, খাদ্য ও রসদের অভাবে দীর্ঘকাল মস্কোতে অবস্থান করা নিরাপদ হইবে না, এদিকে শীত শুরু হইলে সমস্ত দেশ যখন বরফে আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে তখন ফরাসী সৈন্যদলের বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া নেপোলিয়ন ভগ্নমনে ফরাসী বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। ১৯শে অক্টোবর ১৮১২ আরম্ভ হইল বিখ্যাত প্রত্যাবর্তন। রাশিয়া হইতে ফিরিবার পথে দুরন্ত শীত, তুষার ঝটিকা, খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব এবং দুর্ধর্ষ রুশ সৈন্যের চারিদিক হইতে অবিরাম আক্রমণে নেপোলিয়নের বাছাই সৈন্যবাহিনী 'গ্র্যাণ্ড আর্মি' ধ্বংস হইল। ছয়লক্ষ ফরাসী সৈন্যের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। রাশিয়া আক্রমণের ফলে নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, এই আঘাত তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও পূরণ করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ রাষ্ট্রজোট—নেপোলিয়নের পরাজয়ঃ রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিপর্যয়ের সংবাদে নেপোলিয়ন-বিরোধিগণ উল্লসিত হইল। তাঁহার পরাজয়ের সংবাদ পাইবামাত্র ইংলণ্ডের উদ্যোগে রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাষ্ট্রজোট গঠন করিল। নেপোলিয়ন ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি অপরিসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া লুটজেন, বুটজেন (Lutzen and Butzen) এবং ড্রেসডেনের যুদ্ধে জয়ী হইলেন। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত লিপজিগের (Leipzig) বিরাট যুদ্ধে তিনি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধকে জাতিসমূহের যুদ্ধ (Battle of Nations) বলা হয়। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের সমগ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার তথাকথিত মিত্র রাষ্ট্রগুলি শত্রুপক্ষে যোগ দিল। মহাদেশীয় ব্যবস্থারও অবসান ঘটিল। মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া প্যারিস দখল করিল। নিরুপায় হইয়া নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে ইটালীর অনতিদূরে ক্ষুদ্র এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হইল। যোড়শ লুই-এর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (যোড়শ লুইর দুর্ভাগা শিশুপুত্র সপ্তদশ লুই সিংহাসন আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। ফরাসী বিপ্লবে তিনি প্রাণ হারান) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন সরকারের সঙ্গে মিত্রপক্ষ প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া ১৭৯৩-এর ফরাসী সীমান্ত মানিয়া লইলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য ভিয়েনাতে এক সম্মেলন বসিল।

শত দিবস (The Hundred Days)ঃ নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগের পর মিত্রশক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে পলায়িত অভিজাতগণ

(Emigre) দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে। এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন নেপোলিয়ন। তিনি হৃত সিংহাসন ফিরিয়া পাইবার আশায় মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মার্চ ফ্রান্সে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীগণ তাহাদের প্রিয় বোনাপার্টের সমর্থনে দাঁড়াইল। ফরাসী সৈন্য বাহিনীও তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। অষ্টাদশ লুই আবার ফ্রান্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এলবা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রায় তিনমাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; এই রাজত্বকাল 'শত দিবস' (The Hundred Days) নামে খ্যাত।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ ১৮১৫ঃ এদিকে নেপোলিয়নের পুনরাগমনে মিত্রপক্ষ নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ শত্রু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। এই সময় মিত্রপক্ষ ফ্রান্সকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ব্রিটিশ ও প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী; পূর্ব দিক হইতে অস্ট্রিয়ান ও রুশ বাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করিবে বলিয়া ঠিক হয়। ব্রিটিশ ও প্রাশিয়ান আক্রমণ অধিক বিপজ্জনক মনে করিয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে বেলজিয়ামে উপনীত হইলেন। ব্রিটিশ ও প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী যাহাতে মিলিত হইতে না পারে তাহার জন্য নেপোলিয়ান পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাহাদের পরাজিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ব্লুকারের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীকে লীয়ীতে পরাজিত করেন এবং তাঁহার সেনাপতি মার্শাল নে কাত্‌রা-ব্রা (Quatre Bras)-এ ওয়েলেসলির নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন এই সময় কল্পনা করিতে পারেন নাই যে পরাজিত উভয় বাহিনী আবার মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। ফলে যথাযথভাবে এই দুইবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন হইতে তিনি বিরত থাকেন। তিনি ফরাসী সেনাপতি গ্রুসেকে ব্লুকারের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন বটে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে গ্রুসে যথাসময়ে প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর সহিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মিলিত হইবার পথ বন্ধ করিতেপারিলেন না।



ইহার পর বহুবিশ্রুত ওয়াটারলু-র (Waterloo) প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হইল (১৮ই জুন, ১৮১৫)। প্রথমদিকে নেপোলিয়নই জয়লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু মধ্যাহ্নের পর ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী আসিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার ফলে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়া গেল। নেপোলিয়ন ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সাহসিকতার তুলনা হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। ফরাসী পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হইল বিপুল। ইহার পর

উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপোলিয়ন পশ্চিম ফ্রান্সে অবস্থিত রোসফোর (Rochefort) বন্দরে অবস্থিত ব্রিটিশ জাহাজ বেলারফোনের ক্যাপ্টেনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজ সরকার আটলান্টিক মহাসাগরের সেণ্ট হেলেনা (St. Helena) দ্বীপে তাঁহাকে নির্বাসিত করিল। পাঁচ বৎসরাধিক কাল সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত জীবন যাপন করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের দেহান্ত ঘটে।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ: নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ তাঁহার চরিত্র ও নীতির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে যে রাজনৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার নীতিতে যে ভুল-ত্রুটি ছিল তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; অবশ্য অনেক পরে। সেণ্ট্ হেলেনায় নেপোলিয়ন তাঁহার নির্বাসনকালে সখেদে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পতনের কারণ তিনটি—স্পেনের সহিত যুদ্ধ; পোপের সহিত কলহ এবং মস্কো অভিযান। ইহার সহিত আরও কয়েকটি কারণ যোগ করা যাইতে পারে—মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা; ইউরোপের রাজন্যবর্গের সহিত অশালীন ব্যবহার; সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি; ইংলণ্ডের নৌশক্তি এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

স্পেনের সহিত যুদ্ধ: স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া নেপোলিয়ন চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে স্পেনবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় স্পেনবাসীর জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগে এবং তাহারা জীবনপণ করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্পেনবাসীর এই জাতীয় প্রতিরোধ নেপোলিয়ন ধ্বংস করিতে পারেন নাই; বরঞ্চ নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁহার এই নীতিকে স্পেনীয় ক্ষত (Spanish ulcer) নাম দেন। এই দুষ্টক্ষত হইতে রক্তমোক্ষণের ফলেই তাঁহার সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

পোপের সহিত কলহ: প্রথম কন্সাল থাকাকালীন নেপোলিয়ন পোপের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁহার রাজ্য দখল করেন। এমন কি পোপকে তিনি বন্দী করিয়া ফ্রান্সে লইয়া আসেন। পোপের প্রতি তাঁহার এই দুর্ব্যবহার ইউরোপের ক্যাথলিক জনসাধারণ ভাল চোখে দেখে নাই। ফ্রান্স ও স্পেনের গোঁড়াপন্থী ক্যাথলিকগণ নেপোলিয়নের প্রতি বিরক্ত ও রুষ্ট হয়। স্পেনের ধর্মভীরু জনসাধারণের নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার ইহা ছিল অন্যতম কারণ। পোপের প্রতি খারাপ ব্যবহারের ফলেই ইহা সম্ভব হয়।

মস্কো অভিযান: রাশিয়ার সহযোগিতার প্রকৃত মূল্য উপেক্ষা করিয়া রাশিয়াকে শত্রুতে পরিণত করা নেপোলিয়নের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। তাঁহার রুশবিরোধী নীতির ফলে জার তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন। রাশিয়াকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া রুশদেশ আক্রমণ করেন। শীতে, অনাহারে ও রুশদের আক্রমণের ফলে তাঁহার বহু লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মস্কো অভিযানের ফলে ইহা ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিবার সুযোগ

পাইল। তাঁহার মস্কো অভিযান বিফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মুক্তি সংগ্রাম' (war of Liberation) শুরু হয়।

ইউরোপের রাজন্যবর্গের সহিত অশালীন ব্যবহার ঃ নেপোলিয়ন ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে না করিয়া তাঁহার আশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন। নিজেকে তিনি সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া জাহির করেন। ইউরোপের নৃপতিবর্গ ইহা অপমানজনক বলিয়া মনে করিত। তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। এই নবজাগ্রত রাজশক্তি নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম করেণ।

সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি ঃ সেনাপতি হিসাবে নেপোলিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এই সব অঞ্চলে প্রচার করেন এবং এই সব অঞ্চলের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বভাবতই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাকে মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কিন্তু সম্রাট হইবার কিছুদিনের মধ্যেই নেপোলিয়ন এই নীতির পরিবর্তন ঘটান। তিনি অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে মনে করিলেন। জাতীয়তাবাদের আদর্শের সহিত তাঁহার সাম্রাজ্যের আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিল। নেপোলিয়ন এই নবজাগ্রত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিলেন না। ফলে তাঁহার পতন ঘনাইয়া আসে।

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঃ (কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম) ঃ ইংলণ্ডকে ধ্বংস করিবার জন্য নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তন করেন কিন্তু ফলে তাঁহার নিজের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়। এই নীতি যখন তিনি কার্যকর করিতে সচেষ্ট হন তখন তাঁহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্লভ ও দুর্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের শাসন ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই তাঁহার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

ইংলন্ডের নৌশক্তি ঃ ইংলণ্ডের নৌশক্তির প্রাধান্য নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় থাকিলেও সমুদ্রবক্ষে বারংবার তিনি ইংলণ্ডের নৌশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ ইংলণ্ডের নিরাপত্তা আনয়ন করে। নেপোলিয়ন অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংলণ্ডকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও ভাঙিয়া পড়িয়াছিল ইংলণ্ডের নৌ-শ্রেষ্ঠত্বের জন্য।

বিশ্বাসঘাতকতা ঃ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের তথাকথিত মিত্রভাবাপন্ন নরপতিগণ ও নেপোলিয়নের ফরাসী বন্ধুবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সেনাপতি বারনাডোৎ, কুটনীতিজ্ঞ তলারোঁ ও পুলিশ-প্রধান ফুচে-র নাম উল্লেখ করা যায়। ফ্রান্সের নাগরিক হইয়াও ইঁহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নেপোলিয়নের সিংহাসনে স্থায়িত্বের প্রধান শর্ত ছিল—নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে জয়লাভ যাহা নেপোলিয়নের মত প্রতিভার পক্ষেও টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে যাঁহারা পূর্বে তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতেন তাঁহারাও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অনুসরণ করিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ঃ নেপোলিয়নের পতনের পরে ফ্রান্সে পুরানো বুঁরবো রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পুরাতন বিধিব্যবস্থা আর ফিরিয়া আসে নাই।

ফরাসী বিপ্লবের সুফলগুলি অটুট থাকে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, ভূমিদাসত্ব, সামাজিক বৈষম্য, চার্চের প্রাচীন ক্ষমতা, বৈষম্যমূলক করব্যবস্থা ; দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের অযোগ্যতার হাত হইতে ফ্রান্স মুক্তি পাইল। ফ্রান্স ইউরোপের বিপ্লবী চিন্তাধারার পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হইল। ফ্রান্সে শাসনতন্ত্র ক্রমেই গণতান্ত্রিক হইতে থাকে এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃতি লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শ ফ্রান্স হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন শাসন ও সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণের সর্বজনীন অধিকার—এই সব মৌলিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইল। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র নিন্দিত হইল এবং উদারনৈতিক মতবাদ ও গণতন্ত্র আদর্শরূপে গৃহীত হইল। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া জার্মানী, ইটালী, তুরস্কের অধিকৃত বল্কান অঞ্চলের জনসাধারণ রাজনৈতিক ঐক্য ও বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার সক্রিয় আন্দোলন চলিতে থাকে। কোড নেপোলিয়নের ফলে আইনের চোখে সকলে সমান এই আদর্শ প্রবর্তিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসেও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। ইহার প্রাণ-কেন্দ্র ফ্রান্সে হইলেও এই বিপ্লব একমাত্র ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইহার আদর্শের এমন কি এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রসার ঘটে। কালক্রমে এই সকল দেশের জনসাধারণ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। যে সকল অঞ্চল বিদেশীর শাসনাধীনে ছিল সে সব অঞ্চলের জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। বিপ্লবের বহুঘোষিত 'স্বাধীনতা', 'সাম্য' ও 'মৈত্রী' বিশ্ব ইতিহাসকে এক নূতন পথে পরিচালিত করে। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ 'স্বাধীনতা'-র অর্থ করিল জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও ভূমিদাস প্রথার অবসান। 'সাম্যের' অর্থ করিল বিশেষ সুবিধার বিলোপ ও 'মৈত্রী' বলিতে বুঝিল জাতীয়তাবাদ।

ভিয়েনা সম্মেলন, বিভিন্ন সমস্যা, প্রধান নীতিগুলি, ভিয়েনা ব্যবস্থা ও তাহার সমালোচনা, ইউরোপীয় সংঘ, বিভিন্ন বৈঠক, ব্যর্থতার কারণ, মেটারনিক ব্যবস্থা।

ভিয়েনা সম্মেলন : লিপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত ও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবার পর বিজয়ী শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সম্মিলিত হন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব প্রাক্ নেপোলিয়নের যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠার। কিন্তু নেপোলিয়নের পুনরাগমনে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্য সাময়িক-ভাবে স্থগিত রাখিতে হইল। ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাকে সেন্ট্ হেলেনায় নির্বাসন দিয়া ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ভিয়েনায় পুনর্মিলিত হইলেন (৮ই জুন, ১৮১৫)। ফ্রান্সের প্রতিনিধিও এখানে স্থান পাইলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস এই বৈঠকে অভ্যর্থনা সমিতির ভূমিকা গ্রহণ করেন; অস্ট্রিয়ার চান্সেলার মেটারনিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। রাশিয়ার জার ও প্রাশিয়ার রাজা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য রাজনীতিকদের মধ্যে ইংলণ্ডের ক্যাসালরি (Castlereagh) ও ডিউক অফ ওয়েলিংটন, প্রাশিয়ার স্টেন ও হার্ডেনবুর্গ ও ফরাসী প্রতিনিধি তলারোঁ-র (Talleyrand) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভিয়েনা সম্মেলনের সমস্যা : ভিয়েনা সম্মেলন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। প্রথমত, ইউরোপকে পুনর্গঠিত করার সমস্যা; দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ ফরাসী-ভীতি হইতে ইউরোপকে রক্ষা করা; তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ভবিষ্যতে লাভালাভের প্রশ্নে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেইগুলিকে রূপায়িত করা; চতুর্থত, পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ; পঞ্চমত, জার্মানীর পুনর্বিন্যাস, এবং সবশেষে ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য রক্ষা করার সমস্যা। পোল্যাণ্ড ও স্যাক্সনির অধিকার লইয়া রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এরূপ প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল যে, তখন অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাশিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করে। এই তিন রাষ্ট্রের দৃঢ় মনোভাব দেখিয়া রাশিয়া পোল্যাণ্ডের উপর তাহার দাবির কিছুটা কমাইল, অনুরূপভাবে প্রাশিয়াও স্যাক্সনির উপর তাহার দাবি কমাইতে বাধ্য হইল।

প্রধান নীতিগুলি : তদানীন্তন সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ তিনটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেন, যথা (ক) শক্তিসাম্যের নীতি (balance of power); (খ) আইনগত উত্তরাধিকার নীতি (Legitimacy) এবং পুরস্কার ও শাস্তিদানের নীতি (reward and punishment)। সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিলেন যে, উপযুক্ত শক্তি বণ্টনের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ : শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগের সময় সর্বাগ্রে আসিল ফ্রান্সের কথা। নূতন ফরাসী রাজ্য গঠিত হইল ১৭৯০-এর সীমারেখাকে ভিত্তি করিয়া।

ফ্রান্স ভবিষ্যতে যাহাতে আর শান্তি বিঘ্নিত করিতে না পারে তাহার জন্য প্রথমতঃ ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি পাঁচ বৎসরের জন্য বিজয়ী বাহিনীর দখলে থাকিবে, এবং ফ্রান্সকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে শক্তিশালী করা হইল। উত্তর সীমান্তে হল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করিবার জন্য অস্ট্রিয়ার অধিকৃত বেলজিয়ামকে লইয়া হল্যাণ্ডের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। পূর্ব সীমান্তে প্রাশিয়াকে দেওয়া হইল রাইন অঞ্চল। জার্মানীতে একটি যৌথ রাজ্য ব্যবস্থা (Confederation) গঠন করা হইল ও সমগ্র জার্মানীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৯। এই যৌথ রাজ্যের সভাপতি হইল অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া হইল সহ-সভাপতি। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব আলপাইন অঞ্চলে পিডমণ্টকে শক্তিশালী করিবার জন্য ইহার সহিত জেনোয়াকে জুড়িয়া দেওয়া হইল।

আইনগত উত্তরাধিকার নীতির প্রয়োগ ঃ এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন ও দুই সিসিলি রাজ্যেবুরবোঁ বংশীয় রাজারা সিংহাসন ফিরিয়া পাইল। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশ, সার্ডিনিয়া ও পিডমণ্টের স্যাভয় বংশ তাহাদের স্বাধিকার ফিরিয়া পাইল। মধ্য ইটালীতে পোপের পূর্ব অধিকৃত অঞ্চল ফিরাইয়া দেওয়া হইল। রাইন অঞ্চলের বিতাড়িত জার্মান রাজারাও নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই নীতি প্রয়োগ করা হইল না। যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যেসব উপনিবেশ ইংলণ্ড দখল করিয়াছিল, সেগুলি আর ঐ সমস্ত দেশকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। তেমনি ভেনিস ও জেনোয়ায় প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই উঠিল না।

ক্ষতিপূরণ ও শাস্তিদান নীতির প্রয়োগ ঃ বিজয়ীদের ক্ষতিপূরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চল ছাড়াও পোমারানিয়া, স্যাক্সনির দুই-তৃতীয়াংশ, ওয়েস্টফেলিয়া, পোজেন, থর্ন এবং ড্যানজিগ দেওয়া হইল। রাশিয়া পাইল পোল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ অংশ এবং সম্পূর্ণ ফিনল্যাণ্ড। অস্ট্রিয়া বেলজিয়ামের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইটালীতে লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া টাইরল, সালসবুর্গ প্রভৃতি অঞ্চলও অস্ট্রিয়া পাইল। ইহার ফলে আল্পস্ হইতে এড্রিয়াটিক পর্যন্ত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। ইটালীর টাস্কানি, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও হ্যাপসবুর্গ বংশীয়রা শাসন করিবার সুযোগ পাইল। সুইডেন পাইল নরওয়ে এবং ব্যাভেরিয়াও কয়েকটি অঞ্চলের মালিক হইল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড মাল্টা, মরিসাস, হেলি-গোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু এবং সিংহল দ্বীপ লাভ করিল। ফ্রান্সকে শাস্তিস্বরূপ বিজিত অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহার সীমানা সঙ্কুচিত হয়। ক্ষতিপূরণের বোঝাও তাহার উপর চাপান হইল। তবে তাহাকে কোন চরম শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই ইহার কারণ হইল জার আলেকজাণ্ডার ইহা চাহিলেন না এবং ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ বিশপ ট্যালেরার তৎপরতা। নেপোলিয়নকে সাহায্য করার অপরাধের শাস্তি হিসাবে স্যাক্সানির কিছু অংশ কাড়িয়া লওয়া হইল। ডেনমার্ক-এর নিকট হইতে নরওয়ে লইয়া সুইডেনকে পুরস্কৃত করা হইল।

সমালোচনা ঃ ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে বহু ঐতিহাসিক কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ-প্রবর্তিত

তিনটি নীতি সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নাই। যেমন, আইনগত উত্তরাধিকার নীতির জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপ্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, শাস্তিদান নীতি সুবিধামত প্রয়োগ করা হয়। ডেনমার্ক স্যাক্সনি যে অপরাধে শাস্তি পাইল ব্যাভেরিয়াও সেই অপরাধে অপরাধী ছিল কিন্তু শাস্তি পাইল না। তৃতীয়ত, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেশি উৎসাহী ছিল। অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইহা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের কথা একেবারে চিন্তা করা হয় নাই। চতুর্থত, বৃহৎ চতুঃশক্তি জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের সংযুক্তি ঘটায়। এজন্য পরে বেলজিয়ামবাসিগণ বিদ্রোহ করে এবং তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে ইটালী ও জার্মানীতে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঐ দুইটি অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক ঐক্য না আসা পর্যন্ত ঐ দুইটি দেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। পঞ্চমত, শক্তিসাম্য ও আইনগত উত্তরাধিকার নীতি দুইটি অনুসরণ করিয়া ভিয়েনা ব্যবস্থার রচয়িতারা ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা অষ্টাদশ শতকের মৃতপ্রায় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করিতে গিয়া যুগধর্মকে অগ্রাহ্য করেন। এমন কি তাঁহারা শিল্প-বিপ্লবের যুগান্তকারী ফলাফলের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। ভিয়েনা ব্যবস্থার শর্তগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐগুলিতে অর্থনৈতিক বিষয়ের নামগন্ধও নাই। কেবলমাত্র রাষ্ট্রগুলির সীমানা সংক্রান্ত বিষয়েই ইহা পরিপূর্ণ। এ কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসকে ভিয়েনা ব্যবস্থা ভাঙিবার ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ভিয়েনা ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্তের সবটুকুই নিন্দার যোগ্য একথা বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভংগি লইয়া ভিয়েনা সিদ্ধান্তকে বিচার করিলে ভুল হইবে। প্রথমত, যে জাতীয়তাবাদের অবহেলা ভিয়েনা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ, সেই জাতীয়তাবাদ তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া নেপোলিয়ন পরাজিত হইয়াছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের অবদান ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং ভিয়েনা সিদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিরাছিল, পদদলিত করিয়াছিল বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেও কার্যতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। বরঞ্চ বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলন সেগুলি অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যেমন, রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া। নেপোলিয়ন পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, ভিয়েনা সিদ্ধান্তে তাহা স্বীকৃতি পায়। জার্মানীতে নেপোলিয়ন যে রাজনৈতিক পরিবর্তন লইয়া আসেন তাহাও বহুলাংশে টিকাইয়া রাখা হয়। সেখানে একটি যৌথ রাজ্য গঠন হইতে ইহা বুঝা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পরিবতনকে কিছুটা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। যেমন, যে সব দেশে কোড নেপোলিয়ন প্রচলিত হইয়াছিল সে সব দেশে তাহা টিকিয়া রহিল। অর্থাৎ এই সুবিখ্যাত আইন-সংহিতায় যে সামাজিক বা

অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকৃতি পাইয়াছিল সেগুলি হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হইল না। তৃতীয়ত, ভিয়েনা সিদ্ধান্তের রচয়িতাদের অবাধে কাজ করিবার উপায় ছিল না। নেপোলিয়নবিরোধী যুদ্ধকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত অনেকগুলি সন্ধি, বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দেয় প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি তাঁহাদের মান্য করিতে হইয়াছিল। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে, ভিয়েনা শান্তি ব্যবস্থা পুরাতন সন্ধিগুলির সঙ্কলন ও পুনরনুমোদন ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা স্মরণে রাখিলে ভিয়েনা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনার তীব্রতা কমিয়া যাইতে বাধ্য। চতুর্থত, ইউরোপে শান্তি স্থাপনে ভিয়েনা সিদ্ধান্তের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কারণ কয়েকটি বিষয়ে ভিয়েনা সিদ্ধান্ত তথা ভিয়েনা সম্মেলনকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। খুব কম সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন বহু সমস্যার সমাধান করে। ইহার সিদ্ধান্তকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির যৌথ গ্যারান্টির আওতায় রাখা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসেও ইহা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির সম্পাদনকালে ভিয়েনা সম্মেলনে প্রথম প্রবর্তিত যৌথ গ্যারান্টির নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। পঞ্চমত, ভিয়েনা ব্যবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল। সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের সহিত জেনোয়ার সংযুক্তি ঘটায় এ রাষ্ট্রটি ইটালীর একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। পরে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। জার্মানীতে প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করিবার ফলে প্রাশিয়ার পক্ষে ভবিষ্যতে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ভিয়েনা ব্যবস্থাকে একটি বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। তবে ইহার রচয়িতারা স্থিতাবস্থা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন স্বীকার করিতেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হইয়া পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল তখন ইহারা ভিয়েনা ব্যবস্থার দোহাই দিয়া এই সকল আন্দোলন ধ্বংস করিতে তৎপর হন। স্বভাবতই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ইহার শত্রু হইয়া দাঁড়ান। ফলে প্রতি দেশে আন্দোলন শুরু হয় এবং পরিশেষে ভিয়েনা ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে।

ইউরোপীয় সংঘ (Concert of Europe)ঃ ফরাসীভীতি নেপোলিয়নের পতনের পর এবং ভেয়েনা সম্মেলনের পরও দূরীভূত হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যাহাতে শান্তি ব্যাহত করিতে না পারে তাহার জন্য সর্ব-ইউরোপীয় পর্যায়ে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। প্রধান চারিটি শক্তি (ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া) পরস্পর এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত করিল। ইহাকে চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance) বলা হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে মিলননীতি স্থাপিত হইল তাহাই Concert of Europe বা ইউরোপীয় সংঘ নামে খ্যাত। ইউরোপের কূটনীতিবিদ্ ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স যাহাতে আর সমগ্র ইউরোপের শান্তিকে বিনষ্ট করিতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বৃহৎ চারিটি রাষ্ট্র উদগ্রীব ছিল। তাহাদের একতার মধ্য দিয়াই ইউরোপীয় সংঘ-এর উদ্ভব ঘটে। রাশিয়ার আলেকজাণ্ডারের পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) এবং মেটারনিক-ক্যাসালরির 'চতুঃশক্তি চুক্তি' এই পরিকল্পনার দুইটি অংশ।

পবিত্র চুক্তি অবাস্তব ছিল এবং কেবলমাত্র ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ রহিল। সে কারণে চতুঃশক্তি চুক্তিই 'ইউরোপীয় সংঘ'-এর মূল ভিত্তি। চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী কনসার্টের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বলিয়া ধরিতে হইবে।

ভিয়েনা ব্যবস্থার রচয়িতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভিয়েনা ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। একারণে যে দিন ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে (নভেম্বর ১০ই, ১৮১৫) ঠিক সেই দিনই তাহারা নিজেদের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছিল। এই চুক্তির দ্বারা চতুঃশক্তি মিতালিকে টিকাইয়া রাখা হইল। এই চারিটি শক্তি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিল যে তাঁহারা তাহাদের সর্বশক্তি দিয়া ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবে ; ইউরোপে শান্তি অব্যাহত রাখিবে। ইউরোপের শান্তি রক্ষা করিবার জন্য তাহারা মাঝে মাঝেই বৈঠকে বসিবে এবং জাতির স্বার্থ, সাধারণ স্বার্থ এবং ইউরোপের সামগ্রিক শান্তি রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে।

ইহার রূপান্তর : ইউরোপীয় সংঘের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। সমস্যাপীড়িত ইউরোপে ইহা নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। কারণ জনসাধারণের তখন একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল শান্তি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ইউরোপীয় সংঘ প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রে পরিণত হইল। ইউরোপের সাধারণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়া স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের স্বার্থ রক্ষা করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল। এই ক্রমাবনতি ইউরোপীয় সংঘের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাইল।

বিভিন্ন বৈঠক : ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আইলা-স্যাপেলে সংঘের প্রথম সভা আহ্বান করা হয়। ফ্রান্স হইতে মিত্রপক্ষের সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়। ফ্রান্সকে ইউরোপীয় সংঘে যোগদান করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ ফ্রান্স প্যারিস সন্ধির শর্তসমূহ অতি দ্রুত পালন করিয়াছিল। এইভাবে চতুঃশক্তি চুক্তি প্রকৃত পক্ষে পঞ্চশক্তি চুক্তিতে পরিণত হইল। এই বৈঠকে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছিল সেগুলির সু-মীমাংসা হইল। যেমন, সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের অভিযোগের মীমাংসা, মোনাকোর রাজাকে ভালভাবে দেশ শাসন করিতে নির্দেশ দান, হেসির ইলেকক্টরকে রাজা উপাধি ধারণ করিতে বাধা দান প্রভৃতি ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গ একজোটে কাজ করিতে পারিয়াছিল। সুইডেনের রাজার নিকট কৈফিয়ত চাওয়া হইল, জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাডেনের উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান করা হইল। ব্যাভেরিয়া এই রাজ্যটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুদের আক্রমণ নিবারণের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সহিত অন্যান্য শক্তিগুলির মতানৈক্য দেখা দিল। ফলে, প্রথম বৈঠকেই ইউরোপীয় সংঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের লক্ষণ দেখা গেল এবং চতুঃশক্তি চুক্তিতে ভাঙন শুরু হইল।

ট্রপো বৈঠক (১৮২০) : ইউরোপীয় সংঘের সদস্যদের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তাহা কিছুদিনের মধ্যে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে স্পেন, পর্তুগাল, পিডমণ্ট ও নেপলস্-এ গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় যাহার ফলে এইসব দেশের অত্যাচারী রাজারা উদারপন্থী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার

জার স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদে খুবই বিচলিত হন এবং এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্য দিয়া ১৫০০০ রুশ সৈন্য পাঠাইতে চাহেন। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স রুশপ্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কিন্তু স্পেনের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই যখন নেপলস্-এ বিদ্রোহের সংবাদ মেটারনিকের নিকট পেঁছাইল তখন তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। যদি বিদ্রোহীরা নেপলস্-এ জয়ী হয় তাহা হইলে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব চলিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কা তিনি করিলেন এবং নেপলস্-এর বিদ্রোহ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কনসার্টের একটি বৈঠক সত্বর আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কনসার্টের সকল সদস্যই বিপ্লব-বিরোধী ছিল বলিয়া এই সব বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ট্রপো নামক স্থানে মিলিত হইল।

মেটারনিক তখন ইউরোপীয় সংঘের অবিসংবাদী নেতা। একারণে নেপলস্-এর বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যাহা দাবি করিলেন তাহা ইংলন্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বীকার করা হইল। স্পেনের বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে ফ্রান্সের দাবি কিন্তু মুলতবী রহিল। তাহাছাড়া বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া একটি নীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ইউরোপীয় সংঘের নামে একটি ঘোষণাপত্র জারী করা হইল যাহাকে **ট্রপো ঘোষণাপত্র** (Troppau Protocol) বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন মেটারনিক স্বয়ং। ইহাতে বলা হইল যে রাজার স্বেচ্ছাকৃত দান ভিন্ন কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন স্বীকার করা হইবে না। যদি কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক কোন শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করে তাহা হইলে ঐ রাষ্ট্রটিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করা হইবে না এবং ইউরোপীয় সংঘ ঐ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রটিতে পূর্বেকার শাসন ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবে। ইংলণ্ড এই ঘোষণাটিকে বিপ্লব অথবা সংস্কার বন্ধ করিবার অজুহাতে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সনন্দ বলিয়া মনে করিল। এই কারণে ইংলন্ড ট্রপো ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইংলন্ডের বিরোধিতার জন্য ট্রপো বৈঠকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হইল না। এই বৈঠক কয়েক মাসের জন্য মুলতুবী রাখা হইল। এই মুলতবী অধিবেশন বসিল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে **লাইবেক** নামক স্থানে। এই বৈঠকে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং এই কারণে তাহাকে নেপলস্ ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ দমন করিবার অধিকার দেওয়া হইল। অস্ট্রিয়া খুব সহজেই নেপলস্ ও পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করিল। নেপলস্-এর সিংহাসনে অত্যাচারী বুরবোঁ বংশীয় শাসক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ভেরোনার বৈঠক (১৮২২)ঃ ইউরোপীয় সংঘের তৃতীয় সম্মেলন ভেরোনাতে অনুষ্ঠিত হয়। স্পেন ও গ্রীসের বিদ্রোহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইবার জন্যই এই বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছিল। এই বৈঠকে ফ্রান্সকে স্পেনের বিদ্রোহ দমনের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হইল এবং ফরাসী সৈন্য খুব সহজেই স্পেনের গণ-বিপ্লব দমন করিল। ইংলণ্ড স্পেনে ফরাসী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। ইতিমধ্যে আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এইসব বিদ্রোহী-

উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া হুমকি দেখাইলে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন যে ইংলণ্ড এরূপ কার্যে সক্রিয়ভাবে বাধা দিবে। এইসঙ্গে ইংলণ্ড স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মনরো তাঁহার সুবিখ্যাত নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ঘোষণা করিলেন (১৮২২)। তাঁহার নামানুসারে এই নীতিটিকে 'মনরো নীতি' বলা হয়। এই নীতিতে উল্লেখ করা হইল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই বরদাস্ত করিবে না। এই সময় গ্রীকগণ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্তই লওয়া হইল না। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রীকদের সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইহাতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে অনুমান করিয়া ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া ইহার বিরোধিতা করিল। এই কারণে ভেরোনা বৈঠকে গ্রীক সমস্যাকে চাপা দেওয়া হইল। ভেরোনা বৈঠকেই ইউরোপীয় সংঘের কার্যতঃ অবসান ঘটিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক সমস্যা সমাধানের জন্য রাশিয়ার জার সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে এই বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সংঘের ব্যর্থতার কারণ ঃ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় সংঘ বা কনসার্টই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু ইহা কার্যকর হয় নাই। ইহার ব্যর্থতার কারণ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় সংঘের সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই ইহার পতনের বীজ নিহিত ছিল। প্রথমত এই সংঘটি কয়েকটি স্বৈরাচারী বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত হইয়াছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কোন স্থান ছিল না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত ভাবধারার বিরোধী ছিল। বিপ্লব ও প্রগতিশীল আন্দোলন বা মতবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণার ফলে তাহারা ইউরোপে যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। ফলে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। দ্বিতীয়ত; সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধেই অধিক সজাগ ছিল। তাহাদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থবোধ বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে 'খোলা মন' লইয়া কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই অধিবেশনে যোগ দেয় নাই। মতানৈক্যের ফলে তাহাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়ত; ইংলণ্ড প্রথম হইতে আপন স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল; ইউরোপীয় সংঘের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সে কিছুই করে নাই। ট্রপো ঘোষণার বিরোধিতা করিয়া ইংলণ্ড সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিল কিন্তু স্বৈরাচারী সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলী রোধ করিতে সে ব্যর্থ হয়। ভেরোনাতে ইংলণ্ডের মতামত অগ্রাহ্য করা হয়। ইংলণ্ড তখন ইউরোপীয় সংঘের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইংলণ্ডের এই মনোভাব ও সংস্রব ত্যাগ ইউরোপীয় সংঘকে শক্তিহীন করিয়াছিল। সবশেষে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ মনোভাব এই সংঘের পতন ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছিল। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইউরোপীয় সংঘ সর্বপ্রথম যৌথ নিরাপত্তা নীতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছিল। আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন প্রচণ্ড শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ইহা ছিল প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

মেটারনিক ব্যবস্থা (Metternich System)

মেটারনিক অস্ট্রিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মেটারনিকের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ প্রতিভাবলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কূটনীতিতে ঐ সময় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার মনোবল ও কূটনীতি নেপোলিয়নের পরাজয়ের পথ সুগম করিয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৫) সময় হইতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পর্যন্ত (১৮৪৮) তিনিই ছিলেন ইউরোপীয় রাজনীতিতে অবিসংবাদী নেতা। এই কারণে এই যুগটিকে মেটারনিকের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং তাঁহার সময়ের ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেটারনিক ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত। তিনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সাধুতা, নৈতিকতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণের রাজনীতিতে কোন স্থান নাই বলিয়া তিনি মনে করিতেন।


প্রিন্স মেটারনিক

লক্ষ্য ও নীতি

মেটারনিকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি পতনোন্মুখ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে এমন কোন ঘটনা ঘটিতে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না যাহাতে বহুজাতিভিত্তিক অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে। ইহার জন্যই তিনি তাঁহার বহুনিন্দিত মেটারনিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন ইহা করা অসম্ভব। অস্ট্রিয়ায় জাতীয় ঐক্য বলিয়া কিছু ছিল না। ক্রোট, শ্লাভ, জার্মান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগায়ার, পোল, রুথেন ও সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এখানকার অধিবাসী ছিল। এই জাতিগুলির মধ্যে যে অনৈক্য ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিলেন। তিনি জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন চালাইয়া যাইবার নীতি গ্রহণ করিলেন (Policy of Divide and Rule)। মেটারনিক ব্যবস্থার দুইটি রূপ আমাদের চোখে পড়ে—অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইহার সক্রিয় রূপ এবং অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে : মেটারনিক ব্যবস্থার অন্যতম নীতি ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে কোনরূপ সংস্কার আন্দোলন যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। বিদেশ

হইতে যাহাতে প্রগতিবাদী ভাবধারা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য তিনি অস্ট্রিয়ার চারিদিকে শুল্ক-প্রাচীর স্থাপন করিলেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইলেন। গোয়েন্দা পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং সভাসমিতি করিবার অধিকার হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুলিশী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি কঠোর হস্তে দমন করিলেন। ফলে বহু লোককে নির্বাসন, কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল। অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনৈক্য ও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার বিভাজন ও শাসননীতি কার্যকর করিলেন। এই নীতির বাস্তব পরিণতি দেখা গেল যখন তিনি জার্মান কর্মচারী ও সেনাদলকে রাখিলেন হাঙ্গেরী-প্রদেশে আর হাঙ্গেরীয়দের নিয়োগ করিলেন ইটালীর লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য। অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতি যাহাতে একই রাজশক্তির আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য তিনি বহু দমনমূলক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

জার্মানী ও ইটালীতে মেটারনিক ব্যবস্থা: জার্মান কনফেডারেশনের ডায়েটের সভাপতি ছিল অস্ট্রিয়া। তিনি এই কনফেডারেশনকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহার কুখ্যাত ব্যবস্থাকে কাজে লাগাইলেন। জার্মানীতে এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে যাহাতে এমন কোন একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে না পারে তাহার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা লওয়া। ইহার জন্য জার্মানীতে তিনি জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক আন্দোলন ধ্বংস করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা উপলব্ধি করেন। জার্মান কনফেডারেশনের ডায়েটের মাধ্যমে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সিদ্ধ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল সাহিত্যিক কোটেজবুয়েকে হত্যা করা হইলে মেটারনিকের পক্ষে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ধ্বংস করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি জার্মানীর কার্লসবাড নামক স্থানে জার্মান কনফেডারেশনের ডায়েটের এক সভা আহ্বান করিলেন এবং এখানে সমবেত জার্মান রাজাদের উদারনৈতিক জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। বিপ্লবভীতিকে জাগাইয়া তিনি এই বৈঠকশেষে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণে জার্মান রাজাদের রাজী করাইলেন। এই সিদ্ধান্তগুলিকে কার্লসবাড আদেশসমূহ (Carlsbad Decrees) বলা হয়। ইহার দ্বারা জার্মানীতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুপ্তচর রাখা হইল। উদারপন্থী অধ্যাপকগণ বিতাড়িত হইলেন। বাক্-স্বাধীনতা হরণ করা হইল এবং বিপ্লবী সংগঠনের প্রতি নজর রাখিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হইল। এমন কি জার্মানীর কোন রাষ্ট্রে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিলে কনফেডারেশনের পক্ষ হইতে অস্ট্রিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে বলিয়া জার্মান নৃপতিবর্গ স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সময় প্রাশিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি লইয়া ব্যস্ত ছিল বলিয়া জার্মানীতে মেটারনিক ব্যবস্থা জয়যুক্ত হইল।

জার্মানীতে কনফেডারেশনের ডায়েট মারফত মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থা কার্যকর করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইটালীতে জার্মান কনফেডারেশনের ন্যায় কোন রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। একারণে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপন করিতে মেটারনিকের সবিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যে হ্যাপসবুর্গ বংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মাধ্যমে মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থা প্রবর্তন

করিতে চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া গুপ্ত পুলিশ সংস্থার মাধ্যমেও তিনি তাঁহার ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইটালীতে তাঁহার ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নিরক্ষরতা, গুপ্ত পুলিশ সংস্থা, নৃপতিবর্গের মধ্যে অনৈক্য ও স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র। ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই সময় অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে এই সব অত্যাচারী রাজারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য মেটারনিকের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থা ইটালীতে প্রবর্তন করিলেন। ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হইল, সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হইল। কিন্তু ইহাতেও মেটারনিক সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি যৌথ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু পোপ ও সার্ডিনিয়ার রাজার বিরোধিতার জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই। এ কারণে ইটালীতে তাঁহার ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে সমস্ত গণ-আন্দোলন দমন করা। তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে অস্ট্রিয়ায় তাঁহার প্রবর্তিত স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা টিকিয়া থাকিবে না যদি না ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা টিকাইয়া রাখা হয়। একারণে তিনি ইউরোপীয় সংঘের মাধ্যমে তাঁহার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। ইউরোপীয় সংঘের যে সব বৈঠক বসিয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটিতে মেটারনিক ছিলেন প্রধান এবং মূল শক্তি। তিনি ইউরোপীয় সংঘকে (Concert of Europe) বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণ-আন্দোলন দমনে ও পূর্বতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যবহার করেন। এদিক হইতে ট্রপো প্রটোকলকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার সক্রিয় রূপ হিসাবে গণ্য করা যায়। মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি দৈনন্দিন বিবরণ জানিবার জন্য গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করেন এবং প্রতিটি দেশে তাঁহার অনুচরদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঃ মেটারনিক ব্যবস্থা কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। যে বিপ্লবকে তিনি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল এই বিপ্লব। তিনি নিজেই অস্ট্রিয়া হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিলেন। মেটারনিকের ব্যবস্থা যে স্থায়ী হইতে পারে না তাহা প্রথম হইতেই বুঝা যায়। তিনি বিপ্লবকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু বিপ্লবের পিছনে বিপ্লবীদের যে সব দাবী ছিল সেগুলির প্রতি তিনি নজর দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন নাই। উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি তাহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই। একারণে তিনি দমননীতির সাহায্যে গণ-অভ্যুত্থান প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে, মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থার দ্বারা মানবসমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। একারণেই তাঁহার ব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িল। তিনি তাঁহার ব্যবস্থার দ্বারা ঘড়ির কাঁটা একটু পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তিনি ঘড়িটাই থামাইয়া ফেলেন এবং ভাঙিয়া ফেলেন।

যুগটির স্বরূপ, ফ্রান্স ঃ অষ্টাদশ লুই, দশম চার্লস, জুলাই বিপ্লব, জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ; ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, বিভিন্ন কারণ, গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহার প্রথমার্ধে শিল্প-বিপ্লব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে নূতন সমাজ-বিন্যাস ঘটিয়াছিল তাহাকে গতিশীল সমাজ বলা যায়। প্রথমে ইহা পশ্চিম ইউরোপে এবং পরে মধ্য-পূর্ব ইউরোপে বিস্তারলাভ করে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো এই গতিশীল সমাজব্যবস্থাকে তাহার নিজস্ব আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইল। ফলে এই যুগটিতে অসংখ্য বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিপ্লবগুলিকে জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিকবাদের বাহিঃ-প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই যুগটিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই প্রবল ছিল বলিয়া গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্রবাদের জয় সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলেও এই যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব, অপর জাতির শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাপুঞ্জের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ইহার ফলে গ্রীস ও বেলজিয়ামবাসিগণ তাহাদের জাতীয় সরকার গঠন করিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য রাজ্যে অবশ্য জাতীয়তাবাদকে সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে অনেকে এই যুগটিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ফ্রান্স (১৮১৫-১৮৪৮) ঃ ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস নানাদিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগ ফ্রান্সের ইতিহাসকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির দ্বন্দ্বের বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স এই যুগেই শিল্প বিপ্লবের খারাপ ও ভালো উভয় দিক সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই যুগের ফ্রান্স একান্তভাবে সমৃদ্ধিশালী। বিভিন্ন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ ফ্রান্সের তথা ইউরোপের সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করেন।

১৮১৫ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা ছিলেন বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লস। এই সময় ফ্রান্স বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করা বুরবোঁ নরপতিদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দেয়। ইহাকে জুলাই বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ বংশ চিরতরে ফ্রান্সের সিংহাসন হারায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ওরলাও বংশীয় লুই ফিলিপ ফ্রান্সের রাজা হন। ফরাসী জনসাধারণ এই রাজবংশের পরিবর্তনকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু লুই ফিলিপ তাহাদের হতাশ করিলেন। তাঁহার ১৮ বৎসরের শাসনে ফরাসী জনসাধারণ যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা পুনরায় বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইয়াছিল। ১৮৪৮এর ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দিল তাহার ফলে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল।

জুলাই বিপ্লবের কারণ ঃ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সমকালীন ফ্রান্সের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। জুলাই বিপ্লব প্রধানতঃ দশম চার্লস কর্তৃক অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত সনন্দ বাতিল করা এবং তাঁহার সনন্দবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ইহার ক্ষেত্র বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে ষোড়শ লুইর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই আরোহণ করেন। স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ না করিয়া বিপ্লবী যুগের অবদান সংবলিত এক চার্টার বা সনদের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার শাসন শুরু করেন। আর এখানেই তাঁহার রাজত্বের সহিত পূর্বেকার বুরবোঁ রাজাদের শাসনের পার্থক্য ছিল। তিনি যে অধিকারের সনন্দ ঘোষণা করিলেন তাহাতে আইনের চোখে সকলে সমান এবং গুণানুসারে চাকরী পাইবার যোগ্যতা স্বীকার করা হইল। বে-আইনী গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ হইল। ক্যাথোলিক ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত পাইলেও ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হইল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। সংক্ষেপে, অষ্টাদশ লুই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সহিত প্রাচীন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধনে সচেষ্ট হন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কিন্তু অভিজাত বংশীয়দের ও যাজক সম্প্রদায়ের ইহা পছন্দ হইল না। তাহারা বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে তৎপর হয় এবং প্রাচীন সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধারের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ডিউক অব বেরি (Duc de Berry) আততায়ীর হস্তে নিহত হন। উগ্র রাজতন্ত্রী দল বামপন্থীদের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে এবং অষ্টাদশ লুইর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। তাঁহারা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করিয়া মতামত প্রকাশের অধিকারকে ব্যাহত করে। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যাজকদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতিকে এমনভাবে জটিল করা হয় যাহাতে অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে। অষ্টাদশ লুইর প্রধানমন্ত্রী ভিলেল (Vellel) পর্যায়ক্রমে 'পুরাতন আমল' ফ্রান্সে ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। এই প্রকার অবস্থার মধ্যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অষ্টাদশ লুইর দেহান্ত ঘটে।

অষ্টাদশ লুইর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস-রূপে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে পুনরায় স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করা। তিনি অভিজাতদের ও ধর্মযাজকদের প্রাচীন অধিকারগুলি পুনরায় বলবৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। যে সমস্ত অভিজাত ও যাজক দেশত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ফলে সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন তিনি তাহাদের মোটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিলেন। চার্চকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব চার্চকে সমর্পণ করিলেন। ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র পুনঃ-প্রবর্তনের চেষ্টা করিলে আইনসভার উচ্চ পরিষদ বাধা দিল। ফলে ইহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই সময় সংবাদপত্রগুলি তাঁহার নীতির সমালোচনা করায় তিনি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ন্যাশানাল গার্ড ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু সৈনাদের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন না। ইহার ফলে তাঁহার পতন ত্বরান্বিত হইল।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দশম চার্লস বহু নিন্দিত এবং জনসাধারণের চক্ষুশূল পোলেনিয়াকে (Polignac) প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিলেন। পোলেনিয়া ছিলেন প্রতিক্রিয়ার দৃঢ় সমর্থক। জাতীয় সভা তাঁহার কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিল। ইহার প্রত্যুত্তরে রাজা আইনসভা ভাঙিয়া দিলেন। নব নির্বাচিত আইনসভায় উদারনৈতিক দল আরও বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হইলেন। এই সভাও যখন রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর সমালোচনা করিল তখন এই সভাও ভাঙিয়া দেওয়া হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ জুলাই প্রধানমন্ত্রী পোলেনিয়ার পরামর্শে রাজা দশম চার্লস নবনির্বাচিত আইনসভা ভাঙিয়া দিলেন; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইল; নির্বাচনী আইন সংশোধন করিয়া ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উদারনৈতিক মধ্যবিত্তদের বাদ দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে ভোটদাতাদের সংখ্যা সমগ্র ফ্রান্সে এক লক্ষ হইতে মাত্র ২৫ হাজারে দাঁড়াইল এবং শেষ অর্ডিন্যান্সের দ্বারা নূতন ভোটার তালিকা অনুযায়ী আইনসভার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইল। এই সকল বিশেষ ঘোষণার ফলে চার্লসের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। তিয়ার (Thiers)-এর নেতৃত্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তিয়ার এই সংবিধান-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। সংবিধানপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও চার্লসের এই স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সমালোচনা করিল। প্যারিসের জনসাধারণ 'মন্ত্রিসভা নিপাত যাউক' 'সনন্দ দীর্ঘজীবী হউক' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখরিত করিল। সংক্ষেপে, প্যারিসে বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ২৮শে জুলাই প্যারিসে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিপ্লব তিন দিন স্থায়ী ছিল। এই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিল প্রাক্তন সৈনিকরা, গুপ্ত সমিতির সদস্যরা, প্রজাতন্ত্রিগণ এবং ছাত্রদল ও শ্রমিক শ্রেণী। বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমিত ছিল। সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে অস্বীকার করিলে চার্লসের পক্ষে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

ফলাফল ঃ রাজতন্ত্র-বিরোধী জনতা জুলাই বিপ্লবকে সফল করিলেও আইনসভার সদস্যগণ ও প্যারিসের ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘিষ্ঠরা প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তাহা ছাড়া ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল নৃপতিবর্গের বিরুদ্ধে সেই সময় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে বুরবোঁ বংশের অন্যতম শাখা ওরলাওঁ বংশের লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। লুই ফিলিপ জনসাধারণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চার্টার অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে দেশ শাসন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ফ্রান্সে বিশেষ দেখা যায় না। এক রাজবংশের পরিবর্তে আর এক রাজবংশ স্থাপিত হইল। কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে এই বিপ্লব যে ফ্রান্সে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। প্রথমত, লুই ফিলিপ রাজা হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি বিপ্লবের ফলে রাজা হইলেন। এই কারণে তিনি যে রাজতন্ত্র স্থাপন করিলেন তাহা পূর্বেকার বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমচরিত্রের ছিল না। তিনি হইলেন

নাগরিক রাজা। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা কংগ্রেস ও ইউরোপীয় সংঘ এতদিন জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়াছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গকে মানিতে বাধ্য করিয়াছিল। জুলাই বিপ্লব সেই নীতির বলিষ্ট প্রতিবাদ। লুই ফিলিপের সিংহাসনে আরোহণ ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত আইনগত উত্তরাধিকার নীতিকে চরম আঘাত হানিল। ইহার সঙ্গে ভগবৎদত্ত রাজক্ষমতার, যাহা বুরবোঁ রাজবংশের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল তাহারও অবসান ঘটিল। তৃতীয়ত, অভিজাত ও যাজকদের ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দশম চার্লস ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন চার্লসের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তেমনি অন্যদিকে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল। চতুর্থত, প্রতিনিধিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল এবং আইন-প্রণয়নের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা ইহার উপর বর্তাইল। তাহা ছাড়া, জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হইতে বাহির হইয়া আসিল। ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিপ্লবের ফলাফলে অনুপ্রাণিত হইয়া বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, ইটালী, জার্মানী, স্পেন ও পর্তুগালের দেশপ্রেমিকগণ পুনরায় জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল যে সব শক্তি পনের বৎসর ধরিয়া বিপ্লবের স্রোত নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এখন হঠাৎ তাহার প্রবাহে স্বভাবতই তাহারা আতঙ্কিত হইল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া: ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের পরেই অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে বিপ্লবের সূচনা হইল। ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে এই দেশটি হল্যান্ডের সহিত যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুইটি দেশের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এজন্য হল্যান্ডবাসী ডাচ বা ওলন্দাজদের শাসন বেলজিয়ামবাসীদের অসহ্য বোধ হইয়াছিল। তাহারা হল্যান্ডের অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বিদ্রোহ করিল। ফ্রান্স ইহাকে সমর্থন জানাইল, ইংলন্ডও এই ক্ষুদ্র দেশের দুর্ভোগ দূর করিতে উৎসাহ দেখাইল; রাশিয়া, অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াও এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইল না। অবশেষে লন্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যান্ডবাসিগণও এই সময় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ করিল; কিন্তু তাহারা বেলজিয়ামবাসীদের মত সাফল্য অর্জন করিতে পারিল না। দূরবর্তী ইংলন্ড ও ফ্রান্স তাহাদের কোন সাহায্য করিল না। প্রাশিয়া বা অস্ট্রিয়াও তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিল না। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কঠোর হস্তে পোল-বিদ্রোহ দমন করেন। ইটালীতেও এই সময় জাতীয়তামূলক বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল কিন্তু তাহা তেমন কার্যকর হয় নাই। স্যাক্সনি, হ্যানোভার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নানা দাবিদাওয়া পূরণের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করিলে ঐ সব রাজ্যের রাজারা ভীতত্রস্ত হইয়া তাহাদের বিভিন্ন দাবি স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় অবশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থানে মেটারনিক ভীত হইলেন। তিনি জার্মান কনফেডারেশনের ডায়েটের অধিবেশন আহ্বান করিলেন এবং

ডায়েটকে বিপ্লব-বিরোধী আইন পাশ করিতে বাধ্য করিলেন। যে সব জার্মান রাজ্যের রাজারা জনসাধারণের চাপে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা এই সুযোগে নূতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া পুনরায় স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইলেন। স্পেন ও পর্তুগালের জনসাধারণ অংশিকভাবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করিল। অবশ্য ইহার পিছনে কেবলমাত্র জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ছিল না, স্পেনে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থাও এই পরিবর্তনের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। সুইস্ যৌথরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ক্যান্টনের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের নাম-গন্ধ ছিল না। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এই সব ক্যাণ্টনের জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করে। ফলে ক্যাণ্টনগুলির শাসনকর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দাবি স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ডেও শুনা গিয়াছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল শাসকগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিকে আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই প্রথম সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইল।

জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য ঃ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে জুলাই বিপ্লব কার্যত ব্যর্থ হইয়াছিল। এই বিপ্লব কেবলমাত্র বিপ্লবী-চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হয় নাই। একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া অন্য কোন দেশে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান সাফল্য লাভ করে নাই এবং সে কারণেই গণ-সার্বভৌমত্ব অধিকাংশ দেশেই অস্বীকৃত রহিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো এই বিপ্লবকে মাঝপথে থামিয়া যাওয়া বিপ্লব বলিয়াছেন। ইহাতে ফ্রান্সেও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই। তবুও জুলাই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইহা ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মনে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য বিপ্লবী ভাবধারার কীর্তিসমূহ—সাম্য, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের নীতিগুলি নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হইল এবং এই বিপ্লবের মধ্যেই ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল।

ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্র ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (১৮৪৮) **ঃ** ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে ওরলাওঁ বংশীয় লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিবার সুযোগ লাভ করেন। জুলাই মাসে এ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র বা তাঁহার শাসনকালকে জুলাই রাজতন্ত্র বা July Monarchy বলা হয়।

জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হইল। আইন-সভার সদস্য হইবার, নির্বাচনে দাঁড়াইবার বয়সগত এবং ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমানো হইল। ইহাতে ভোটদাতাদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইল। মধ্যবিত্তরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। জুলাই রাজতন্ত্রকে এক মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী সমর্থন জানায় নাই। এ কারণে একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুগত্যের উপরই লুই ফিলিপকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। লুই ফিলিপ ১৮ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স শাসন করেন। তাঁহার শাসনকাল দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ এবং (খ) ১৮৪০ হইতে ১৮৪৮। প্রথম পর্যায়ে লুই ফিলিপ তাঁহার শাসন অব্যাহত রাখিবার জন্য বিরোধী শক্তিগুলির

সহিত অবিরাম সংগ্রাম করেন এবং জয়ী হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়া দেশ শাসন করিতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু হঠাৎ ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহার ফলে লুই ফিলিপকে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিতে হয়।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ ঃ লুই ফিলিপের শাসনকালে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এক একটি দল বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে লুই-এর রাজত্বের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ব্যক্ত করিল। যেমন ন্যায্য অধিকারবাদিগণ (বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ) ফিলিপের রাজতন্ত্রকে অবৈধ বলিয়া মনে করিত; তেমনই বোনাপার্টিস্ট দল (নেপোলিয়নের সমর্থকগণ) তাঁহার বৈদেশিক নীতিকে পঙ্গু, দুর্বল ও দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর বলিয়া বিশ্বাস করিত। সেইরূপ সমাজতান্ত্রিকগণ ফিলিপের অভ্যন্তরীণ নীতিকে উচ্চ মধ্যবিত্তদের সন্তুষ্টি বিধানের সহায়ক বলিয়া ইহার অবসান চাহিল। ফিলিপ ও তাহার মন্ত্রীদের পক্ষে এতগুলি দল ও উপদলকে সন্তুষ্ট করা সাধ্যাতীত ছিল।

লুই ফিলিপ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে দেশ শাসন করিয়াছিলেন। ভোটদানের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সম্পদশালীদের। সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র দুইলক্ষ ভোটার ছিল। এই মুষ্টিমেয় ভোটারদের সরকারের পক্ষ হইতে হাত করা বিশেষ কষ্টকর ছিল না। ফলে সরকারের মনঃপুত ব্যক্তিরাই আইনসভায় নির্বাচিত হইত। ইহাদের আবার নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া সরকারের বশে রাখা হইত। তাহারাও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিত। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার উপায় ছিল না। এ কারণে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনগণ লুই ফিলিপের শাসনকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিল এবং পুনরায় বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিল।

লুই ফিলিপের পররাষ্ট্রনীতিও জোরদার ছিল না। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। এইরূপ নীতির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু গণ-মানসে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না। ফ্রান্সের জনগণ বলিষ্ঠ ও গৌরবময় পররাষ্ট্র নীতি আশা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিবর্তে পাইল দুর্বল, পঙ্গু ও অমর্যাদাকর পররাষ্ট্রনীতি। ফ্রান্স এই সময় কূটনীতিতে ইংলন্ডের নিকট বারবার পরাজিত হয়। ফিলিপের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

ফ্রান্সে শিল্পায়নের ফলে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন যে অপরিহার্য তাহা লুই ফিলিপের সরকার স্বীকার করিল না। শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা লাভবান হইল, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইল। পুঁজিপতিরা মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে বেশি করিয়া শোষণ শুরু করে। লুই ফিলিপের সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে নজর দিল না, বরঞ্চ নানারূপ দমনমূলক আইনের দ্বারা তাহাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিল। স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব তীব্র হইল। তাহারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি চালাইতে থাকিল। এই সময় ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে

সমাজতান্ত্রিকগণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা লুইব্লাঁ সোচ্চারে ঘোষণা করিলেন যে লুই ফিলিপের শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী সরকারের পতন ঘটাইতে না পারিলে শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিবে না।

লুই ফিলিপের সরকার কোনরূপ শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। সরকারের স্থিতাবস্থা নীতি জনসাধারণের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। সরকার-বিরোধী দলগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য বারংবার দাবি জানায়। তাহারা আইনসভার গঠন ব্যবস্থা পরিবর্তন ও ভোটাধিকার সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গিজো ঘোষণা করিলেন যে প্রচলিত ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। আইনসভায় সরকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলিয়া বিরোধিগণ কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে আন্দোলনকারীরা এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য সংস্কার-ভোজসভা (reform banquets) ডাকিতে থাকিলেন। এই সব সভায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কেন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত। লুই ফিলিপের সরকার ভীত হইয়া দমন নীতির আশ্রয় লইল এবং এই প্রকার সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল। আন্দোলনকারীরা ইহাতে ভীত না হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসে এক বিরাট সংস্কার-ভোজসভার আয়োজন করিল। গিজো সরকার পূর্ব হইতেই এই সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিল। কিন্তু সরকারের এই নিষেধে কেহ কর্ণপাত করিল না। জনসাধারণ দলে দলে এই সভায় যোগ দিল। শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চলের রাস্তায় অবরোধ-প্রাকার তৈয়ারী করা হইল। সরকার ইহাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বাহিনী প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহারা আন্দোলনকারীদের পক্ষে যোগ দিল। লুই ফিলিপ ইহাতে ভীত হইয়া প্রধানমন্ত্রী গিজোকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাহিরে। ইতিমধ্যে এক মারমুখী জনতা গিজোর বাড়ীর সম্মুখে বিক্ষোভ দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইলে গৃহরক্ষিগণ এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলি বর্ষণ করিল। ইহাতে জনতার মধ্যে কয়েকজন হতাহত হয়। এই সংবাদ সমগ্র প্যারিসে ছড়াইয়া পড়িলে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দিল। ক্রুদ্ধ জনতাই জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান চাহিল। লুই ফিলিপ ভীত হইয়া পুত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ফ্রান্সে জনমত জয়যুক্ত হইল। ইহা ইতিহাসে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব বা ফেব্রুয়ারী বিপ্লব নামে খ্যাত।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তুর্কীরা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল জয় করিয়া ক্রমান্বয়ে গ্রীক শ্লোভ সমাজ অপরাপর জাতিতে অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-বিপ্লবের অনুপ্রেরণা গ্রীকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে। তখন হইতে গ্রীকগণ তুরস্কের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। এই সময় কয়েকজন সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই স্বাধীনতা স্পৃহায় ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য গ্রীকরা **ফিলিকে হেটাইরিয়া** (Philike Hetairia) বা **মিত্র**

সংঘ নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে। গ্রীসের সর্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হইয়াছিল। তুরস্ক সুলতানের অধীনে থাকিলেও গ্রীকগণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। তাহারা ধর্মপালনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। ইহাতে কিন্তু তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তুর্কী শাসনের অবসান ঘটাইয়া তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আলেকজান্ডার ইপসিলান্টির নেতৃত্বে বর্তমান রুমানিয়ায় এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। তুরস্ক এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী গ্রীকগণ পরাজয়ে হতাশ হইল না। ইহার পরেই দক্ষিণ গ্রীসের মোরিয়া নামক প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হইল এবং গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে ইহা দাবাগ্নির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। গ্রীকরা মুসলমান অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইল। ইহার প্রতিশোধে তুরস্কের সৈন্যবাহিনী গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীসের প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের স্বাভাবিক মমত্ব বোধ ছিল। এইজন্য বিভিন্ন দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য দলে দলে গ্রীকদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রীকদের সাহায্য করিতে উৎসুক হইলে মেটারনিক তাহাতে বাধা দিলেন। তুরস্কের সুলতান মিশরের শাসনকর্তা মেহেমেৎ আলির সাহায্যে যখন বিদ্রোহ প্রায় দমন করিয়া আনিলেন তখন জার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হইলে রাশিয়ার ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গ্রীক সংকট অবসানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। ফলে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এক যোগে গ্রীসের সহিত অবিলম্বে শান্তিস্থাপনের কথাবার্তা বলিতে তুরস্কের সুলতানকে নির্দেশ দিয়া নিজেদের মধ্যে তাহারা লণ্ডনের চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহাতে ঠিক হইল যে তুরস্কের সুলতান তাহাদের নির্দেশ না মানিলে সামরিক শক্তির সাহায্যে তাহাকে মানিতে বাধ্য করা হইবে। তুরস্কের সুলতান এই তিন শক্তির নির্দেশ অগ্রাহ্য করিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার নৌবাহিনী **ন্যাভারিনোর** (১৮২৮) জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের সম্মিলিত নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে। এই পরাজয়ের পরও সুলতান গ্রীকদের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না; বরঞ্চ গ্রীকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন। ইতিমধ্যে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে ইংলণ্ড নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাত গুটাইয়া লইল। ইংলণ্ডের দেখাদেখি ফ্রান্সও সরিয়া পড়িল। তখন রাশিয়া এককভাবে গ্রীকদের সাহায্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তুরস্ককে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল এবং **এড্রিয়ানোপল**-এর সন্ধির দ্বারা সুলতান গ্রীসের মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন গ্রীক রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। কিন্তু থেস্যালী, এপিরাস ও ক্রীট সহ প্রাচীন গ্রীসের এক বিরাট অংশ তুর্কীদের অধিকারে রহিয়া গেল। এজন্য এই স্বাধীনতা গ্রীক জাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। গ্রীসের বাকী অংশের পরাধীন গ্রীকদের মুক্ত করিবার জন্য সমস্ত শতাব্দী ধরিয়া স্বাধীন গ্রীস সক্রিয় ছিল।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য: গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভিয়েনা

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে যে ধ্বংস করা যায় না গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাহাই প্রমাণ করিল। দ্বিতীয়ত, গ্রীস স্বাধীন হইবার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হইল। ফলে বল্কান অঞ্চলে তুর্কী-শাসন-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইতে থাকে। ইউরোপীয় রাজনীতিতে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি হইল। তৃতীয়ত, তুর্কী সাম্রাজ্য যে কতটা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহাও গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রমাণিত হইল। ইহার পর হইতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। পরিশেষে, গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রীকপ্রীতি ও রোমাণ্টিক ভাবধারাকে উদ্দীপিত করিল। রোমাণ্টিক লেখকগোষ্ঠী তাঁহাদের সর্বশক্তি দিয়া গ্রীকদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে শেলী ও বায়রন গ্রীকদের সংগ্রামকে ইউরোপীয় সংগ্রামে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেলী লিখিলেন 'আমরা সকলেই গ্রীক'। কবি বায়রন গ্রীকদের সাহায্য করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ ইউরোপে এমন একটি ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া ভিয়েনা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরোধিতা করিতে থাকে।

ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরঙ্গ : ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের স্বরূপ ও ফলাফল, হাঙ্গেরীতে ও অস্ট্রিয়া রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিপ্লব, জার্মানী, ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লব, বিপ্লবগুলির প্রকৃতি ও পরিণতি।

ফ্রান্সের ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমিত ছিল না। সমগ্র ইউরোপ এক প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হইল। ইউরোপের প্রায় পনেরটি রাজ্যে বিপ্লব-তরঙ্গ গিয়া পেঁীছিল এবং ইউরোপের ইতিহাসে এক বিপ্লবী বৎসরের সৃষ্টি করিল। এই সব দেশে স্বৈরাচারী সরকারের সাময়িকভাবে পরাজয় ঘটিল।

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলশ্রুতি : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের আশু সাফল্য ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখা যায়। ফ্রান্সে লা-মার্টিনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিকদের যুক্ত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হইল। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হইল। ঘোষণা করা হইল জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিবার সকলের অধিকার আছে বলিয়া। কাজ পাইবার অধিকারও স্বীকার করা হইল। ইহার জন্য স্থাপিত হইল সরকারী তত্ত্বাবধানে জাতীয় কারখানা। কিন্তু ভবিষ্যতে ফ্রান্সে কিরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইবে তাহা লইয়া প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। সমাজতান্ত্রিক দলকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রী দল বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাইল। ইতিমধ্যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। এই নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী দল সুবিধা করিতে পারিল না। জাতীয় মহাসভায় ৮৭৬টি আসনের মধ্যে তাহারা মাত্র ১০০টি আসনে জয়ী হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিল অধিকাংশই রাজতন্ত্রী। জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসিলে অস্থায়ী সরকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এই সভার নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দেয়। সংবিধান সভা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করে তাহা হইতে সমাজতন্ত্রীদের বিতাড়িত করিলে সমাজতন্ত্রীরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করিল। প্যারিসের জনতার উপর সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য প্যারিসের জনতা আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাইল। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য ইতিমধ্যে যে রক্ষী বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার সাহায্যে প্যারিসের জনতার অভ্যুত্থান ধ্বংস করা হইল এবং সমাজতন্ত্রী নেতাদের বন্দী করিয়া প্যারিসে বামপন্থী সমস্ত ক্লাব ও সমিতিগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর জাতীয় কর্মশালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত করিবার মত কোন নেতা তখন প্যারিসে ছিলেন না। ফলে বিপ্লব বিপথগামী ও ব্যর্থ হইল। ইহার পর শুরু হইল শ্রমিক নিধন যজ্ঞ। হাজার হাজার শ্রমিককে কারারুদ্ধ করিয়া নানারূপ শাস্তি দেওয়া হইল। প্রায় দশ হাজার ব্যক্তি এই বিপ্লবে প্রাণ দেয়। এই অভ্যুত্থানের পর ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা নির্মূল হইল। প্রতিক্রিয়াশীলগণ শাসনযন্ত্র হস্তগত করিয়া ফ্রান্স শাসন করিতে থাকিল। ইতিমধ্যে নূতন সংবিধানের

কাজ সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হইল। তিনি চারি বৎসরের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং পুনর্নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া স্থির হইল। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইল রাষ্ট্রপতির হাতে। ইহার ফলে একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম হইয়াছিল। ১৮৪৮-এর শেষের দিকে নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হইলে দেখা গেল যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিরোধী পক্ষদের শক্তি চূর্ণ করিয়া নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এইভাবে ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

হাঙ্গেরীতে বিপ্লব ঃ হাঙ্গেরী ছিল অস্ট্রিয়ার অধীনে একটি প্রদেশ। অস্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর রাজা ছিলেন। হাঙ্গেরীতে ম্যাগেয়ার জাতি একক জাতি হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ইহা ছাড়া, সার্ব, ক্রোট, জার্মান ও রুথেনিয়ান জাতিও হাঙ্গেরীতে বসবাস করিত। হাঙ্গেরীর নিজস্ব ব্যবস্থা পরিষদ বা ডায়েট ছিল। অভিজাতগণই ইহার সদস্য হইতে পারিতেন। শাসন ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ছিল। মেটারনিক হাঙ্গেরীতে কোনরূপ সংস্কার প্রবর্তন করেন নাই। তিনি হাঙ্গেরীতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য অটুট রাখিবার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যাগেয়ার জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। জার্মান ও ক্রোট কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরী প্রদেশে নিয়োগ করেন। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি একারণেই হাঙ্গেরীতে শুনা যায় নাই।

লুই কসুথ ঃ ইতিমধ্যে লুই কসুথ (Louis Kossuth) এবং ফ্রান্সিস ডিকের (Francis Deak) নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে ম্যাগেয়ারগণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া অস্ট্রিয়ার অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৮৪০-এর পর কসুথ হাঙ্গেরীর জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান। তিনি হাঙ্গেরীকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হাঙ্গেরীতে যখন বিপ্লব দেখা দিল তখন কসুথ ছিলেন ম্যাগেয়ার জাতির অবিসংবাদী নেতা। কসুথ প্রথমেই অবশ্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই। তিনি প্রথমেই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংস্কার দাবি জানান। কিন্তু অস্ট্রিয়া সরকার যখন তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য করে তখনই তিনি বিপ্লবের পথ অনুসরণ করিয়া হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৮৪৮-এর মার্চ মাসে কসুথ হাঙ্গেরীর 'ডায়েটে' এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি জমিদার শ্রেণীকে তাহাদের পূর্বেকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিতে বলেন এবং হাঙ্গেরী হইতে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটাইবার প্রস্তাব রাখেন। হাঙ্গেরীতে জাতীয় ঐক্য অটুট রাখিবার জন্যই তিনি ইহা দাবি করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রেসবুর্গে হাঙ্গেরীর ডায়েটের অধিবেশনকালে তিনি আর একটি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন। ঠিক এই সময় হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্তে মার্চের উৎসব মেলায় হাজার হাজার কৃষকদের আগমন ঘটিয়াছিল। এই কৃষকদের উত্তেজিত করিল ছাত্রদল ও বিপ্লবী কবি পেটফ। ফলে বুদাপেস্তে অস্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইল। অস্ট্রিয়া সরকার ভীত হইয়া কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিল।

কিন্তু লুই কসুথ যে সামাজিক সংস্কারের দাবি জানাইয়া আসিতেছিলেন তাহা মিটান হইল না এবং হাঙ্গেরীকে স্বায়ত্তশাসন হইতেও বঞ্চিত রাখা হইল। লুই কসুথ তখন ডায়েটে কয়েকটি আইন পাশ করিয়া লইলেন। এই আইনগুলির দ্বারা প্রকারান্তরে হাঙ্গেরীতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইল। অস্ট্রিয়া সরকার চুপচাপ রহিল। তাহারা মনে করিল যে বিপ্লবের উত্তেজনা প্রশমিত হইলেই অস্ট্রিয়ার শাসন পুনঃপ্রবর্তিত করা যাইবে।

ইতিমধ্যে কসুথের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যাগেয়ারগণ হাঙ্গেরীকে একটি ম্যাগেয়ার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইল। ফলে হাঙ্গেরীতে ক্রোট, সার্ব, শ্লোভাক ও জার্মান প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি ইহার বিরোধিতা করিল। তাহারাও নিজ নিজ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন দাবি করিল। লুই কসুথ তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। ফলে হাঙ্গেরী গৃহযুদ্ধের কিনারায় গিয়া পেঁীছিল। বৃদ্ধ সম্রাট এই সময় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল যুবরাজ ফ্রান্সিস অস্ট্রিয়ার সম্রাট হইলেন। তিনি কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সময় জেলাচিক (Jellachich) নামে একজন উগ্র ম্যাগেয়ার বিরোধীকে হাঙ্গেরীর গভর্ণর পদে নিয়োগ করা হয়। কসুথ এই নিয়োগে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন সম্রাট তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। ফলে হাঙ্গেরীর উগ্রপন্থীরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইল এবং কসুথের নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে হাঙ্গেরীর রাজা বলিয়া আর স্বীকার করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অস্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাইল এবং জেলাচিককে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিল। জেলাচিক নিজে জাতিতে ক্রোট ছিলেন। তিনি অতি সহজেই হাঙ্গেরীর অম্যাগেয়ার জাতিগুলির সক্রিয় সাহায্য পাইলেন। ইহার পর অস্ট্রিয়া সরকার হাঙ্গেরীর ডায়েটে বিধিবদ্ধ মার্চ আইন নাকচ করিয়া দিল। হাঙ্গেরী ইহার জবাব দিল লুই কসুথকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করিয়া। লুই কসুথ রাষ্ট্রপতি হইয়া হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিলেন। হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হইল। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। হাঙ্গেরীতে বিপ্লব যদি জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে রাশিয়ার খুবই নিকটে অবস্থিত হাঙ্গেরীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা তিনি কোনক্রমেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। একারণে অস্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে তাঁহার সাহায্য চাহিলে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এক বিরাট রুশ বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কসুথ এইবার মহা সংকটে পড়িলেন। তুরস্ক ও অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট তিনি সাহায্য চাহিলেন কিন্তু কেহই সাহায্য করিল না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে রুশ বাহিনী ম্যাগেয়ারদের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করিয়া দিল। ফলে অস্ট্রিয়া তাহার পূর্বেকার আধিপত্য হাঙ্গেরীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। হাঙ্গেরী এতদিন যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা হইল। হাজার হাজার ম্যাগেয়ার জাতীয়তাবাদীদের হত্যা করা হইল। সংক্ষেপে, ম্যাগেয়ার জাতি তথা হাঙ্গেরীর ভাগ্যে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল।

অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ঃ ক্রোট, শ্লাভ, জার্মান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগেয়ার, পোল, রুথেন ও সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বসবাস করিত। ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপের রাজত্বকালের অবসান এই সব জাতির মনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিল। হাঙ্গেরীতে প্রথম বিদ্রোহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে শ্রমিক ও ছাত্র সম্প্রদায় মেটারনিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। এই বিক্ষোভে ভীতত্রস্ত মেটারনিক কোনক্রমে ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাত মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঘটিল। বৃদ্ধ সম্রাট ফার্ডিন্যাণ্ড বাধ্য হইয়া উদার-নৈতিকদের লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন এবং জনসাধারণকে একটি সংবিধান



দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সম্রাট ইহা স্বীকার করিয়া ইনসবার্গ নামক স্থানে আত্মগোপন করিলেন। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ দুইটি প্রদেশ লম্বার্ডি ও ভেনিস-এ গণঅভ্যুত্থান দেখা দিল। ইটালীর পিডমণ্ট রাজ্যটির রাজা এই সুযোগে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিদ্রোহীরা অস্ট্রিয়ার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিল। ইটালীর দেশ-প্রেমিকরা ঐক্যবদ্ধ ইটালী স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। উত্তর ইটালীতে অস্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ র‍্যাডেট্‌স্কি মিলান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অবশ্য কয়েকটি দুর্গে সৈন্যসামন্ত লইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়াতেও গণঅভ্যুত্থান ঘটিল। হাঙ্গেরীর ন্যায় বোহেমিয়াও সংবিধান দাবি করিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই দাবি পূরণ করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে বোহেমিয়ার জনগণ জার্মান অধিবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন অধিকার অর্জন করিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। অভ্যুত্থানের একমাসের মধ্যে সমগ্র অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যেও জাতিগত চেতনা দেখা দিল। ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদ শুরু হইল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। বোহেমিয়ায় চেক ও জার্মান অধিবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। অস্ট্রিয়া সরকারের সেনাপতি উইনডিস সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বোহেমিয়ার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিলেন। ইহার পর ইটালিতে অস্ট্রিয় সেনাপতি র‍্যাডেড্‌স্কী পিডমণ্টের রাজাকে পরাজিত করিয়া মিলান পুনরুদ্ধার করিলেন। সমগ্র লম্বার্ডিতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

জার্মানীতে ঃ ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতে তরঙ্গ তুলিল। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে জনতার ক্ষোভ তীব্রভাবে দেখা দিলে রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংবিধান রচনা করিবার জন্য একটি প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উরটেমবার্গ স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যেও প্রগতিবাদীদের আন্দোলনের ফলে শাসকগণ গণতন্ত্র স্থাপনে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী প্রতিষ্ঠার কাজও বেশ কিছুটা অগ্রসর হইল। সমগ্র জার্মানীর ছয়শত প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে মিলিত হইলেন। এই সাধারণ সভা ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত। এই সভার অধিবেশন এক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহার প্রধান কাজ ছিল সমগ্র জার্মানীর জন্য একটি সুসংবদ্ধ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। ইহার সদস্যরা অধিকাংশই ভাববাদী ছিলেন বলিয়া কোন বিষয়েই তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। তাঁহারা জার্মানীতে একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যৌথরাজ্য প্রবর্তন করিতে চাহিলেন কিন্তু কিভাবে ঐ লক্ষ্যে পেঁছান যাইবে তাহা লইয়া সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। ইতিমধ্যে জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে বিপ্লববহ্নি প্রায় নির্বাপিত হইয়া আসিল। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট সফলতা অর্জন করিতে পারিল না। সদস্যদের মধ্যে বহু বাদানুবাদের পর এই পার্লামেণ্ট এক শাসনতন্ত্র রচনা করিল। ইহাতে বংশগত রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়িবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট হইবার জন্য প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান জানান হইল কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা অস্ট্রিয়ার ভয়ে এবং রাশিয়ার জার নিকোলাসের পরামর্শে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হইল। জার্মানীতে পুনরায় পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক উপায়ে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

ইটালীতে ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে যখন বিপ্লব ঘটিল তাহার এক মাস পূর্বেই সিসিলির রাজধানী পার্লামোতে জনতা রাজপথে জমায়েত হইয়া

অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইহার পর ইটালীর বিভিন্ন সহরে এরূপ বিদ্রোহ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। এই অভ্যুত্থানগুলি সবই ছিল বিদেশী শাসনের বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় অভ্যুত্থান। পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া, নেপলস্, রোম প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিলে শাসকরা গণতান্ত্রিক সংবিধান মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন। তিন মাসের মধ্যেই অস্ট্রিয়াধীন ভেনিস ও লম্বার্ডি ভিন্ন ইটালীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। ইহার পর ইটালীতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হইল। মেটারনিকের পতনের সংবাদ ইটালীতে পেঁছান মাত্র মিলান এবং ভেনিসে গণঅভ্যুত্থান ঘটিল। মডেনা ও পার্মার শাসকরা রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী মিলান ত্যাগ করিল। ভেনিসে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। পিডমণ্টের রাজা চার্লস আলবার্ট এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ বিফলতায় পর্যবসিত হইল। কাস্টোজার যুদ্ধে চার্লস্ আলবার্ট অস্ট্রিয় সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। কাস্টোজার যুদ্ধ কিন্তু ইটালিতে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিল না। ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে রোমকে কেন্দ্র করিয়া প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর হইল। পোপকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহারা রোমে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিলেন। ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ডির সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া পিডমণ্টের রাজা চার্লস্ এলবার্ট পুনরায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এবার ১৮৪৯-এর মার্চমাসে নোভারার (Novara) যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া, নেপলস্ ও স্পেনের সৈন্যবাহিনী রোম প্রজাতন্ত্র ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইল। ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ডি অপূর্ব বিক্রমে বাধা দিতে থাকিলেন। অবশেষে ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট লুই নেপোলিয়ন এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করিয়া রোম প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইলেন। পোপ ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় রোম পুনরুদ্ধার করিলের। বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলেই রোম প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিল।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে ঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের প্রতিধ্বনি যদিও জার্মানী, ইটালী ও অস্ট্রিয়ায় বেশি করিয়া শুনা গিয়াছিল, তবুও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রজা সনন্দ বিষয়ক আন্দোলন (Chartist Movement) তীব্ররূপ ধারণ করে। আন্দোলনকারিগণ ছয়টি বিষয় দাবি করিয়াছিল। (১) সর্বজনীন ভোটাধিকার (২) সদস্য নির্বাচনের জন্য দেশের সমবিভাগ (৩) ব্যালটে বা গোপনে ভোটদান পদ্ধতির প্রবর্তন, (৪) প্রতিবৎসর পার্লামেণ্ট আহ্বান (৫) ভোট-দাতাদের যোগ্যতা নিরূপণে ধনসম্পদের মাপকাঠিকে পরিত্যাগ এবং (৬) পার্লামেণ্টের সদস্যদের বেতন প্রদান। চরমপন্থী সংস্কারকগণ বল প্রয়োগের দ্বারা উপরিউক্ত দাবিগুলি আদায় করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যার্থ হয়। কিন্তু তাহাদের দাবিগুলি পরবর্তীকালে পূরণ করা হয়। ইংলণ্ডের অধীনস্থ আয়ারল্যাণ্ডে এই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রাম জোরদার হইয়াছিল। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাদ্রিদ শহরের জনতা এক অভ্যুত্থান ঘটায় কিন্তু এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

সুইজারল্যাণ্ডে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এখানকার সাতটি ক্যাথলিক অঞ্চল পৃথক্‌ভাবে Sonderband গঠন করে। ইহার প্রত্যুত্তরে প্রটেস্ট্যাণ্টগণ লিগ অব স্টেটস্‌ নাম দিয়া একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলে। ফলে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। অবশেষে সুইজারল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর্তুগালে অভ্যুত্থান ঘটিল পর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জন জনসাধারণকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রদান করেন। ডেনমার্কের অধীনে জার্মান-অধ্যুষিত শ্লেসউইগ ও হোলস্টেইন-এ গণ আন্দোলন দেখা দেয়। ডেনমার্কের রাজা জনসাধারণের বিভিন্ন অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে এই আন্দোলন বন্ধ হয়। সুদূর নরওয়েতেও ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। রাশিয়ায় অবশ্য এই বিপ্লবের প্রভাব একেবারেই পরিলক্ষিত হয় নাই।

১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগুলির প্রকৃতি : ১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবগুলির ঘটনাপ্রবাহের আলোচনার পর ইহাদের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রথমত; এই বিপ্লবগুলি অধিকাংশই ছিল ভিয়েনা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। বিদেশী শাসন ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহগুলি পরিচালিত হইয়াছিল। ইটালী, জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে যে সব বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল সেগুলি ছিল প্রধানত বিদেশী শাসনের বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় অভ্যুত্থান। আর ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ভিয়েনা, গ্রেটবৃটেন; স্পেন; পর্তুগালের গণআন্দোলনগুলি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদস্বরূপ। দ্বিতীয়ত, এই অভ্যুত্থানগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্য। তৃতীয়ত, এই বিপ্লবগুলি ছিল শহরভিত্তিক। শহরে অসন্তুষ্ট জনসাধারণ এই বিপ্লব শুরু ও জয়যুক্ত করিয়াছিল এবং এই বিপ্লবগুলির নেতৃত্ব করিয়াছিল শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রদল, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

বিপ্লবগুলির ব্যর্থতার কারণ : ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ১৮৪৮-৫০ কালটিতে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিপ্লব পরিচালনার ত্রুটির ফলে প্রতিটি দেশে বিপ্লব ব্যর্থও হইয়াছিল। এই ব্যর্থতার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত; বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অসমতা এবং তাহাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব ছিল। উপযুক্ত নেতাও বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল না। বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়, কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে কিরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে তাহা লইয়া বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়; বিপ্লবীদের মধ্যে এই দুর্বলতা ও সংহতির অভাবের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং তাহারাই অবশেষে জয়ী হয়। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতা; আদর্শগত মতভেদ, ভাষাগোষ্ঠীগত স্বার্থচিন্তা ও জাতিবিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। যেমন হাঙ্গেরীতে ম্যাগেয়ার জাতি ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজের সুযোগ-সুবিধা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইলে হাঙ্গেরীর অন্যান্য জাতিগুলি ইহা সহ্য করিল না। তাহারা ম্যাগেয়ার জাতির প্রভুত্বের বদলে স্বৈরাচারী হ্যাপসবুর্গ রাজতন্ত্রের শাসন পছন্দ করিল। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের

সহিত যোগ দেয় নাই। যে বিপ্লব সৈন্যদলের সাহায্য পায় সে বিপ্লব সাধারণত জয়যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ১৮৪৮-এর বিপ্লব ইহা পায় নাই। চতুর্থত, বিপ্লবগুলির শেষ পরিণতির জন্য নিয়তি অনেকটা কাজ করিয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ইউরোপের ইতিহাসে কেবলমাত্র বিপ্লবের বৎসররূপেই খ্যাত নহে, এই বৎসরটি কলেরারূপ মহামারীর রুদ্রমূর্তির জন্যও বিখ্যাত। ইহার প্রকোপ শহরাঞ্চলেই বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল। যেহেতু বিপ্লবগুলি শহরভিত্তিক ছিল সে কারণে ইহার জন্য বিপ্লবের জয়যাত্রা ব্যাহত হইল। যাহারা ইহা হইতে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিপ্লবকে সার্থক করিবার মত কর্মোদ্যমের অভাব দেখা গেল। ক্ষুধার তাড়নায়, দুঃখ-দুর্দশার ফলে বিপ্লবের যে শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্বাপিত হইল মহামারীরূপ কলেরার দ্বারা।

গুরুত্ব ঃ তবে ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এইগুলিকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের মহড়া বলা যাইতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান ও সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিল এবং স্বৈরতন্ত্রের পূর্বেকার জৌলুস আর ফিরিয়া আসিল না। ইহা ক্রমশঃই দুর্বল হইতে থাকিল। যেসব দেশে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল সে সব দেশে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটিল। প্রজাতন্ত্রী আদর্শ জোরদার হইল। সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের মতবাদ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল। তাহা ছাড়া, এই বিপ্লবগুলিতে জনতার অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছিল বলিয়া বিপ্লবোত্তর যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই জনতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

অষ্টম অধ্যায়

বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক (১৮৫০-১৮৭১)

নিকট-প্রাচ্য সমস্যা ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, বিভিন্ন কারণ, পবিত্র স্থানের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদ, যুদ্ধের গতি, প্যারিসের সন্ধি, ফলাফল, তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনাধীন ফ্রান্স, নূতন সংবিধান ঃ দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ, রাষ্ট্রপতি পদে লুই নেপোলিয়ন; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পথে, তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনী ও কার্যাবলী—কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা—ইটালীর ঐক্যসাধনের ইতিহাস—ম্যাটসিনি কাভুর-গ্যারিবাল্ডি-ঐক্য সংগ্রামের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়—জার্মানীর ঐক্য-অন্দোলন-বিসমার্ক-অস্ট্রোপ্রাশিয়ান যুদ্ধ—ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ—গুরুত্ব।

নিকটপ্রাচ্য সমস্যা ঃ একদা ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য বর্তমানের রুমানিয়া, বুলগেরিয়া; যুগোশ্লেভিয়া, আলবেনিয়া; গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত ছিল। এই সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। রাশিয়া দুর্বল ও পতনোন্মুক তুর্কী সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়া পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু রাশিয়ার এই নীতিতে বাধা দিল ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি। অতএব রাশিয়া কর্তৃক ইউরোপে তুরস্কের অধীনস্থ স্থানগুলি অধিকারের প্রচেষ্টা এবং অপরাপর বৃহৎ শক্তিবর্গ কর্তৃক এই নীতিতে বাধাদান হইতে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই নিকটপ্রাচ্য সমস্যা নামে খ্যাত। এই সমস্যাটিকে সংক্ষেপে বলা যায়, "তুর্কী সাম্রাজ্যের কি গতি হইবে?" উনবিংশ শতাব্দীতে নিকটপ্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে এই সমস্যার তিনটি নূতন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত; তুরস্ক সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির এই অঞ্চল সম্বন্ধে অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা। দ্বিতীয়ত; তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থসংঘাত। তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বলকান অঞ্চলের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের তুর্কী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। লর্ড মর্লের কথায় বলা যায় যে উনিশ শতকে নিকটপ্রাচ্য সমস্যা বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে পরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর নিকটপ্রাচ্য সমস্যার প্রথম অধ্যায় গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যগুলির সমর্থন তুরস্কের বিরুদ্ধে দেখা গিয়াছিল। তাহারা সকলেই গ্রীসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে তুরস্ক সরকারের প্রতি অনুরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয় না। বরঞ্চ বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া নির্বান্ধব অবস্থায় এই রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। এমন কি যে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে রাশিয়া ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রীঃ) হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অকৃতজ্ঞ সম্রাট রাশিয়াকে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। সংক্ষেপে,

প্রাশিয়া ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের সুলতানের পক্ষ লইয়া খ্রীষ্টান রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ঃ ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের নানারূপ কারণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রথমত, তৃতীয় নেপোলিয়ান রাশিয়ার সহিত ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন লইয়া বিবাদের মাধ্যমে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। তিনি গ্রেটব্রিটেন ও অস্ট্রিয়াকে তাঁহার দলে লইয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের জন্য রাশিয়ার সহিত বিবাদে লিপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ডের কুচক্রী পামারস্টোন ও স্ট্রাটফোর্ড ডি র্যাডক্লিফের রুশবিরোধী মনোভাব এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করিল। এই দুইজন ইংলণ্ডের এ্যাবাডিন মন্ত্রিসভার শান্তিনীতি বানচাল করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং এই সরকারকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহারা অজ্ঞ অথচ যুদ্ধোন্মাদ জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হন এবং ফ্রান্সের সহিত একজোটে একটি যুদ্ধ শুরু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তৃতীয়ত, গ্রেট ব্রিটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে তাহার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিল্পে সংরক্ষণ নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চাহিল বলিয়া এই যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই অভিমতগুলিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ বলা যায় না। যুদ্ধের আসল কারণ হইল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাপ্রিয় রুশবিরোধী তুরস্ক রাশিয়ার অন্যায় দাবিগুলি মানিতে অস্বীকার করিল। ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের সহিত যোগ দিল, অস্ট্রিয়াও তাহাদের সমর্থন জানাইল। এই সকল শক্তিগুলির ধারণা হইয়াছিল যে রাশিয়া তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে এশিয়া মাইনর ও বল্কান অঞ্চলে তাহার আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে।

খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থানের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদ ঃ তুরস্কের উপর দাবি শুরু হইল ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন লইয়া। ফ্রান্স জেরুজালেম ও বেথেলেহেমে ল্যাটিন খ্রীষ্টান চার্চগুলির রক্ষক ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই চার্চগুলির পরিচালনায় ফ্রান্সের পক্ষ হইতে গাফিলতি দেখা দেয়। ফলে এই চার্চগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়ার হাতে চলিয়া যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই চার্চগুলির উপর ফ্রান্সের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি ইহার জন্য তিনি রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের ঝুঁকিও লইতে প্রস্তুত ছিলেন। তুরস্কের সুলতান প্রথমে ফ্রান্সের দাবি পূরণের ইচ্ছুক হইলে রাশিয়ার জার নিকোলাস তুরস্কের সুলতানকে এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন। তুরস্কের সুলতান ইহা গ্রাহ্য না করিয়া ফ্রান্সকে এই মর্মে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্সের দাবি ন্যায্য এবং তাহা পূরণ করা যাইবে। সুলতান চার্চগুলির উপর ফরাসী প্রভাব স্বীকার করিলেন সত্য কিন্তু জেরুজালেমে ইহা স্বীকার করা হইল না। ফলে নানারূপ রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হইল। ফ্রান্স যুদ্ধং দেহি মনোভাব গ্রহণ করিল। রাশিয়া ইহাতে ভীত না হইয়া তুরস্কের সুলতানকে গোঁড়া খ্রীষ্টান চার্চের সর্ববিধ স্বাধীনতা তুরস্ককে স্বীকার করিয়া লইতে বলিল। এই স্বাধীনতার আওতায় কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারই অন্তর্ভুক্ত করা হইল না, ধর্মযাজকদের নাগরিক স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত করা হইল। তুরস্ক রাশিয়ার এই প্রস্তাব মানিতে রাজী হইল না কারণ ইহা তুরস্কের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী ছিল।

রাশিয়ার পরাজয় ঃ তুরস্ক রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে রাশিয়া তুরস্কের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং প্রুথ নদী অতিক্রম করিবার জন্য তাহার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল। গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স নিজ নিজ নৌবাহিনী তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিল। ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্যভাবে দেখা দিল। কিছুদিনের মধ্যেই রুশ সৈন্য রুমানিয়া অঞ্চল দখল করিয়া সিনোপের জলযুদ্ধে তুর্কী নৌবাহিনী ধ্বংস করিল। এই নৌযুদ্ধের সংবাদে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বৃটিশ ও ফরাসী জনসাধারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাহিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রধানত রাশিয়ার দক্ষিণস্থিত ক্রিমিয়া উপদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধ ইতিহাসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। আলামা নদীর যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য জয়লাভ করে। অতঃপর তাহারা ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সিবাস্তোপোল দুর্গ অবরোধ করিল। এই সময় প্রসিদ্ধ বালাক্লাভা ও ইংকার্মানের যুদ্ধে রুশগণের পরাজয় হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিবাস্তোপোল অধিকৃত হয়। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং প্যারিসে সন্ধি স্থাপিত হয়।

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) ঃ এই সন্ধি অনুসারে কৃষ্ণসাগরকে সামরিক ঘাঁটিমুক্ত নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং স্থির হইল যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাণিজ্য-জাহাজ এই অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারিবে। রাশিয়া ও তুরস্ক কেহই এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ তৈয়ারী করিতে পারিবে না। দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে ধরা হইল। অতঃপর দার্দেনেলিস প্রণালী দিয়া সব রাষ্ট্রের জাহাজই যাতায়াত করিতে পারিবে। তুর্কী সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়াকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ায় রুশ প্রভাবের অবসান ঘটিল এবং দক্ষিণ বেসারাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বৃহৎ শক্তিবর্গ দায়িত্ব লইল তুর্কী সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার। ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের অন্যতম সদস্য হিসাবে তুরস্ককে গ্রহণ করা হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, পিডমণ্ট, রাশিয়া ও তুরস্ক এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করে।

ফলাফল ঃ এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ছিল খুবই বেশি। রাশিয়ার প্রায় পাঁচলক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছিল সাংঘাতিক। তুরস্কের ক্ষতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অধিকাংশের মতে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে প্রাণহানি ঘটিত কম। ইহার পর প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার সামরিক বিভাগের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সামরিক চিকিৎসা বিভাগ স্থাপন করিল। আধুনিক ধাত্রীবৃত্তিও এই সময় হইতে শুরু হয়। যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সরকারের যে ঋণ হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য আয়ের উপর কর ধার্য করা হইল। ফরাসী শাসন ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। অপমানজনক অনেক কিছুই রাশিয়াকে স্বীকার করিতে হইল। কৃষ্ণ-সাগরের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিবার ফলে এই অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইল। তুরস্কের সুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁহার মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রজাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আইন কানুন রহিত করা হইল, অন্তত সাময়িকভাবে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফল অনেক বেশী। এই যুদ্ধে জয়ী হইবার ফলেই তুর্কী সাম্রাজ্য আরও কিছুদিন টিকিয়া রহিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইলেন। প্যারিস সম্মেলনে যোগ দিয়া কাভুর ইটালীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়া রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ সংস্কারের যুগের সূচনা ঘটিল। নূতন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সংস্কার যুগের প্রবর্তন করিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার যে তিক্ত সম্বন্ধ সৃষ্টি হইল তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই তিক্ত সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া বিসমার্ক জার্মান ঐক্যের পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার দিকে না থাকিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সমর্থন করায় অস্ট্রো-রাশিয়ান সম্পর্ক তিক্ত হইয়া গেল। পরবর্তীকালে বিসমার্ক ইহা কাজে লাগাইয়াছিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ফান্স ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ সিংহাসনচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪৮-এর শেষের দিকে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হইলে দেখা গেল যে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার 'নেপোলিয়ন' নামটাই তাঁহাকে নির্বাচনে জয়ী করে। পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী লুই নেপোলিয়নকে জনসাধারণ শান্তি ও শৃংখলার প্রতীক বলিয়া মনে করে এবং ইহার জন্যই তাহারা তাঁহাকে বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করিল। লুই নেপোলিয়ন সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে যাহারা এই চালু শসনতন্ত্র বদলাইতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের তিনি দেশের ও জাতির শত্রু বলিয়া মনে করিবেন।

লুই নেপোলিয়ন কি ভাবে সম্রাট হইলেন ঃ লুই নেপোলিয়ন খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহার সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল জ্যেষ্ঠতাত নেপোলিয়নের জীবনী। তিনি নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইলেও মনে প্রাণে উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে ফ্রান্সের অধিকাংশ ব্যক্তি প্রজাতন্ত্র চাহে না এবং প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা তিনি সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন। ১৮৪৯-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে ফরাসীরা বর্তমান শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। নূতন আইনসভায় রাজতন্ত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। নেপোলিয়ন সতর্কভাবে নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং নিজেই সেই সুযোগ সৃষ্টি করিলেন। প্রথমত, তিনি সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদগুলিতে নিজের সমর্থকদের নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ত, জনসংযোগের জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণকে তাঁহার আদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। তৃতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য রোমে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি ফরাসী সেনাবাহিনী পাঠাইলেন এবং রোমে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের

উচ্ছেদে দ্বিধা করিলেন না। চতুর্থত; কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ঘটনাকে কাজে লাগাইলেন। এদিকে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসায় তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদে থাকিতে পারিবেন না। প্রথমে তিনি আইনসভার সদস্যদের মতিগতি বুঝিয়া লইলেন। যখন অনুমান করিলেন যে তাহারা সংবিধানের পরিবর্তন করিবে না তখন অনুগত সেনাদলের সাহায্যে আইনসভার অধিকাংশ সদস্যদের বন্দী করিলেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১) এবং জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে প্রজাতন্ত্র ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনরায় প্রবর্তন করিলেন। ইহার পর তিনি জনসাধারণকে তাঁহার রাষ্ট্রপতি পদে থাকিবার মেয়াদ দশ বছর করিতে বলিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ সেই সময় তাঁহাকে ফ্রান্সের রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকে দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিতে জনসাধারণ দ্বিধা করিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য নূতন এক শাসনতন্ত্র চালু করলেন। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের জনসাধারণ সানন্দে এই নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিল। লুই নেপোলিয়ন এইবার প্রজাতন্ত্র রাজ্যটিকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক গণভোটের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী রূপে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনী ও কার্যাবলী: লুই নেপোলিয়ন ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নেপোলিয়ন তাঁহার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। লুই নেপোলিয়নের ভাগ্যে কিন্তু সুখভোগ বেশিদিন ছিল না। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর তিনি ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্যদের জীবনে ঘোর অন্ধকারে ঘনাইয়া আসে। লুই নেপোলিয়নের কৈশোর ও যৌবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছিল। ১৮৩৬ এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে স্টানবুর্গ ও বুলোনে লুই নেপোলিয়ন বিদ্রোহের দ্বারা ফরাসী সিংহাসন দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল তাঁহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ফ্রান্সে তিনি নূতন উদ্দীপনা লইয়া ফিরিয়া আসেন এবং জনসাধারণের সমর্থনে জাতীয় সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নূতন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করিলেন।

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি: লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। যৌবনে তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনী ও কর্মকীর্তি সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে নিজে যে মূল্য নিরূপণ করেন তাহাই সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের অসমাপ্ত

কাজ সম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করিয়া পরে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন বলিয়া প্রচার করিলেন।

অভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তাঁহার শাসনের প্রারম্ভিক যুগ। এই সময় তিনি স্বৈরতন্ত্রী প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবে গণ্য হন আর (খ) ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে দেশশাসন করিবার চেষ্টা করেন। এই যুগটিকে উদার-নৈতিক সাম্রাজ্যের যুগও বলা হয়।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ লুই নেপোলিয়ন সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এক স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক কাঠামো ঠিক রহিল কিন্তু আসলে সম্রাটের সর্বব্যাপারে একক প্রাধান্য স্থাপিত হইল। যেমন, নূতন সংবিধানে ঠিক হইল যে (ক) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য একটি আইনসভা থাকিবে। এই আইনসভার আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল ২৫১। আইনসভার অধ্যক্ষ সম্রাট নিজে নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রীও তিনি নিয়োগ করিবেন এবং এ কারণে আইনসভার নিকট তাহারা তাহাদের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন না। সম্রাটই কেবলমাত্র আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। সংক্ষেপে, আইনসভার কোন ক্ষমতাই রহিল না। (খ) প্রবীণ ব্যক্তিদের লইয়া একটি সিনেট গঠিত হইবে। ইহার সমস্ত সদস্য সম্রাট মনোনীত করিবেন এবং সদস্যরা আমৃত্যু সভ্য থাকিবেন। সংবিধানের রক্ষক হিসাবে সিনেট কাজ করিবে এবং এমনকি সংবিধানের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন সিনেটের দ্বারাই হইবে। (গ) একটি রাষ্ট্র পরিষদ্ (Council of State) গঠিত হইবে। এই পরিষদের কাজ হইবে দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করা। এই পরিষদের অধ্যক্ষ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ইহা ছাড়া দেশের সামরিক বাহিনী, যুদ্ধ-শান্তি-চুক্তি বৈদেশিক ব্যাপারে সম্রাটই সর্বেসর্বা রহিলেন। বিচার বিভাগে সম্রাটের ক্ষমতা অপ্রতিহত রহিল। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন রহিল না। যাহাতে বিরোধী শক্তি মাথা তুলিতে না পারে তাহার জন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা লওয়া হইল, সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের উপর কড়া নজর রাখা হইল। বিনা বিচারে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রহিল, আর সন্দেহভাজনদের উপর নজর রাখিবার জন্য গুপ্তচরে দেশ ভরিয়া গেল। বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইল।

অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য নেপোলিয়ন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের পুন-র্বিন্যাস করিলেন। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কৃষককুল যাহাতে অল্প সুদে অর্থ পাইতে পারে তাহার জন্য দেশময় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন Credit mobilier ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের শাখা অফিস খুলিতে নির্দেশ দিলেন। ইহাতে টাকার লেনদেন ব্যাপারে জনসাধারণের সুবিধা হইল। তাহা ছাড়া Credit financier হইতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবারও ব্যবস্থা করা হইল। বলা বাহুল্য ইহার ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বানিজ্য

দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রাচীর তুলিয়া দিলেন এবং সমগ্র দেশে রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের রেলপথের প্রসার তিন গুণ বৃদ্ধি পাইল। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সামাজিক সংস্কার ঃ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দঃখকষ্ট লাঘব করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। প্রথমত, তিনি দেশময় হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই-সব হাসপাতালে গরীবদের যাহাতে বিনা খরচায় সুচিকিৎসা হয় সেদিকে নজর রাখিলেন। ইহা ছাড়া আতুরাশ্রম স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইল। দরিদ্রদের সেবাকার্যের জন্য অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইল। গরীব জনসাধারণ যাহাতে বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনিতে পায় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ দূর করিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, কারণ ১৮৪৮-এর পর যে সব অভ্যুত্থান ফ্রান্সে ঘটিয়াছিল সেগুলি প্রধানত শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর উপর সমাজতন্ত্রী ও গোঁড়া বামপন্থীদের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। এ কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিককল্যাণমূলক কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কারখানার নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে শিল্পবীমা প্রবর্তন করেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও ন্যায্য কারণে ধর্মঘট করা আইনসংগত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষ কমিয়াছিল।

প্যারীস নগরীর উন্নয়ন ঃ প্যারিস নগরীকে ইউরোপের সৌন্দর্য; রুচি, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি তৎপর হইলেন। প্যারিসকে সৌন্দর্যময়ী করিবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা লওয়া হইল। প্রখ্যাত স্থপতি ব্যারণ হসম্যান-এর পরিচালনায় একাজ চলিতে থাকিল। অচিরেই প্যারিস ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেন। ফলে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনে ফ্রান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির পরিচয় পাইল।

১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়নকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। ইহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি গ্রহণ না করিয়া নেপোলিয়ন কিন্তুবন্দী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার রাজত্বের প্রথম আট বৎসরের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি করে। প্যারিস ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদীরা তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যপ্রার্থী হয়। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে এমন কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে

নাই যাহার সহিত তৃতীয় নেপোলিয়নের যোগ ছিল না; আবার তাঁহার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিই তাঁহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার জন্য তাঁহাকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিতে হয় এবং তিনি পরাজিত হন। ইহার সঙ্গে দ্বিতীয়-সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁহারও জীবনে ঘন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।

বৈদেশিক নীতিতে নেপোলিয়ন শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করেন, 'সাম্রাজ্য হইল শান্তির প্রতীক' কিন্তু তাঁহার কার্যাবলী প্রমাণ করিল তিনি শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরঞ্চ নিজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, নেপোলিয়নীয় গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এক শ্রেণীর জঙ্গীবাদী ফরাসীদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিষ্ট পররাষ্ট্র নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া পড়েন।

বৈদেশিক নীতির সাফল্যের যুগে তিনি বহু কৃতিত্ব অর্জন করেন। এমন কি যখন তিনি দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের ভিতরে ও বাহিরের ক্যাথলিকদের ধন্যবাদার্হ হন। দ্বিতীয়ত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডের সহিত একজোটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কারণ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বনামধন্য প্রথম নেপোলিয়নের পরিণাম স্মরণ করিয়া রাশিয়ার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল 'মস্কো অভিযানই' প্রথম নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ। এখন যদি তিনি রাশিয়ার শক্তি খর্ব করিতে পারেন তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া হইবে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। এই যুদ্ধান্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসাবে প্যারিস নগরীকে নির্বাচিত করা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ফ্রান্স পুনরায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে জাতীয়তাবাদের সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন। প্যারিসের সন্ধিতে যখন ওয়ালাসিয়া মোল্ডাভিয়ার উপর রুশ আধিপত্য দূর করা হয় সেই সময় তিনি এই দুইটি প্রদেশকে লইয়া একটি নূতন রাষ্ট্র-গঠনের প্রস্তাব দেন এবং তাঁহার এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ এই দুইটি প্রদেশ রুমানিয়া নাম লইয়া তুরস্কের নামমাত্র প্রভাবাধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁহার তৃতীয় কাজ হইল ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে সাহায্য করা। তিনি প্লমবিয়ার্সে কাভুরকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সহিত এক অলিখিত চুক্তি করিলেন। তিনি অস্ট্রো-সার্ডিনীয়ান যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিলেন। হঠাৎ ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করিলেন। তাঁহার এই কাজ ইটালীবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল বলিয়া মনে করিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে তৃতীয় নেপোলিয়নের নীতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

ব্যর্থতার যুগ : ইহার পর তাঁহার পররাষ্ট্রনীতিতে বিফলতার যুগ শুরু হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যকালে সাহায্য পাঠান নাই। সুতরাং পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাঁহার সুনাম

নষ্ট হইল। বৈদেশিক নীতিতে যখন তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়েই তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত মেক্সিকোতে এক ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্রস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে জনসাধারণ তাঁহার ব্যর্থতার কথা ভুলিয়া যাইবে। একারণে তিনি সুদূর মেক্সিকোতে এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করেন। মেক্সিকো সাধারণতন্ত্র এই বাহিনীর নিকট পরাজিত হইলে তিনি একজন তাঁবেদারকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন বাধা দেয় তখন নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যদল অপসারণ করিতে বাধ্য হন। ব্যর্থ মেক্সিকো অভিযান নেপোনিয়নের তথা ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট করে এবং তাঁহার পতনের পথ সুগম করে। মেক্সিকোর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব খাটাইতে পারিলেন না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রোপ্রাশিয়ান যুদ্ধে এবং ইহার পূর্বে অনুষ্ঠিত ডেনিস যুদ্ধে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। ইহাতে ফ্রান্সের স্বার্থহানি ঘটিল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জঙ্গীবাদী নীতি অনুযায়ী তিনি বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া দিলেন এই বলিয়া যে দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না করা হয়। তিনি আরও দাবি করিলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে তাহা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছে। যে কারণে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সেরও শক্তিবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এজন্য ফ্রান্সের 'ক্ষতিপূরণ' স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি বিসমার্কের কূটনীতির নিকট পরাজিত হইলেন। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের সম্পর্ক এতই তিক্ত হইল যে দুইটি রাষ্ট্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের কিনারায় পেঁছাইয়াও ক্ষান্ত হইল না। যুদ্ধকেই চরম ও পরম বলিয়া গ্রহণ করিল। প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেবলমাত্র পরাজিত হইলেন না; তাঁহাকে ফ্রান্সের সিংহাসনও হারাইতে হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা ঃ তৃতীয় নেপোনিয়নের চরিত্রে বিপরীত-ধর্মী দোষগুণের সমন্বয় দেখা যায়। কখনো তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন, কখনো তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর হন। যেভাবে তিনি সাধারণ অবস্থা হইতে সম্রাট পদে উন্নীত হন, তাহাতে তাঁহার সামর্থ ও যোগ্যতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি ধনী-নির্ধন সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেন। ফলে তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত রাজনৈতিক অগ্রগতি জড়িত। বৈদেশিক নীতিতে প্রথমে তিনি সফলতা অর্জন করিলেও পরে সর্বাধিক বিফলতা দেখা দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের ফলে তাঁহার প্রতি রাশিয়া খুবই রাগান্বিত হইল। ইটালীর ক্ষেত্রে তিনি দোদুল্যমান নীতি গ্রহণ করেন

ফলে অস্ট্রিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। অপর দিকে তিনি ইটালীর শ্রদ্ধা হারাইলেন। মেক্সিকো অভিযান তাঁহার সর্বনাশের কারণ হয়।

তথাপি বিরাট ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার দান কম নয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন অশান্ত, পীড়িত ও বিশৃঙ্খল ফ্রান্সে শান্তি, নিরাপত্তা ও গৌরব আনয়ন করেন। তিনি এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিষ্পিষ্ট অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি ও জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক সমর্থন সর্বকালেই প্রশংসা পাইবে।

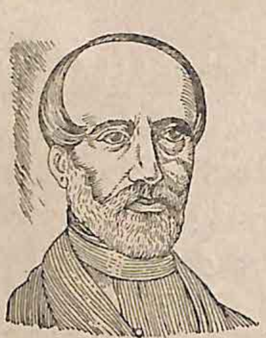
ইটালীর ঐক্য সাধন ঃ বহু শতাব্দী ধরিয়া ইটালী একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা ছাড়া কিছুই ছিল না। ইউরোপের রাজনীতিতে ইটালী ছিল একটি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের পীঠস্থান। পনের ও ষোল শতকে ইহা ছিল স্পেন ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে। আঠারো শতকে ইটালী অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইটালীর জনসাধারণের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম এবং ইতিহাস এক ছিল। কিন্তু ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য বলিয়া কিছুই ছিল না। ইটালীর উত্তর-পূর্ব অংশ অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে ছিল। ফ্রান্সের বুঁরবোঁ বংশের এক শাখা নেপলস ও সিসিলি দ্বীপ শাসন করিত। মধ্য ইটালীতে পোপ এবং কয়েকটি দুর্বল রাজা রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ-পূর্ব ইটালীতে পিডমণ্ট প্রদেশটি এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপ ইটালীর একমাত্র দেশীয় রাজবংশের অধীনে ছিল।

ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ ইটালীতে ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন প্রথমে গোপন ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের রূপ লইয়াছিল। সন্ত্রাসবাদিগণ 'কার্বোনারি' নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু সমিতি ছিল। সমিতিগুলি হইতে নূতন ভাব, নূতন আদর্শ ও ইটালীর ঐক্য প্রচারিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর কয়েকটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কার্বোনারিরা নেপলস ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ শুরু করি। কিন্তু অস্ট্রিয়া তাহার সামরিক শক্তি দিয়া বিদ্রোহ দমন করে। ১৮৩০-এর ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইটালীতে প্রবেশ করিলে মডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। অস্ট্রিয়া ইহাতে শঙ্কিত হয়। বিপ্লবীরা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স বা ইংলণ্ড কেহই সাহায্য করে নাই। মেটারনিক ইটালীতে অস্ট্রিয় সৈন্যদল প্রেরণ করেন, ফলে স্বৈরাচারী শাসকরা পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

ইহাতে কিন্তু ইটালীতে ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন ধ্বংস হইল না। এই সময় স্বাধীনতাকামী ইটালীয়দের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়। প্রজাতন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজতন্ত্রী। প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন ম্যাটসিনি।

ম্যাটসিনি ঃ ম্যাটসিনি ছিলেন ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার এক ডাক্তারের পুত্র। তিনি যৌবনে ইটালী ভাষা সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য তিনি 'নব্য ইটালী সমিতি' প্রতিষ্ঠা

করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। রোমনগরী এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইবে। পোপের প্রাধান্য থাকিবে না তাঁহার এই ঐক্য ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্র ছিল 'ভগবান ও জনসাধারণ'। দেশের যুব শক্তির উপর তাঁহার আস্থা ছিল গভীর। তাঁহার রচনা ও বক্তৃতা তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর নানাস্থানে যে গণ-বিপ্লব সংঘটিত হয় সেইগুলি ম্যাটসিনি-পরিচালিত যুবকগণ পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই বিপ্লবগুলি ব্যর্থ হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে ম্যাটসিনি ইটালীবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। অখণ্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তিনি তাঁহার বাণী ও কার্যদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করেন। এই কারণে তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়।



ম্যাটসিনি

ম্যাটসিনির ন্যায় আরও বহু দেশপ্রেমিক কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে সমগ্র ইটালীতে নব জাগরণের সাড়া আনিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইটালীতে যে মুক্তি আন্দোলন শুরু হইয়াছিল তাহা Resorgimento বা 'পুনরুজ্জীবন' নামে পরিচিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের নেতা ছিলেন জিওবার্টি। তাঁহার মতে ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পোপের নেতৃত্বাধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইলে ইটালীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে। পোপ নবম পায়াস তাঁহার কার্যাবলীর দ্বারা এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি খুব প্রগতিবাদী এবং অষ্ট্রিয়া বিরোধী। স্বভাবতই জিওবার্টি ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ ভাবিয়াছিলেন যে এই পোপ ইটালীর মুক্তি যুদ্ধের প্রধান নেতা হইবেন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের স্বরূপ ধরা পড়িল। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব করিতে চাহিলেন না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের সব আশা নস্যাৎ হইল।

ম্যাটসিনির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে বহু ইটালীবাসী আশা করিল যে ইটালীর রাজনৈতিক একতা ও স্বাধীনতা সম্ভব হইবে যদি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজবংশ মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য জনসাধারণের এই ধারণার পিছনে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় রাজা চার্লস, আলবার্টের অবদান ছিল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু শেষে তিনি অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হইয়া পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের হাতে রাজ্যভার তুলিয়া দেন। ১৮৪৮-৪৯-এর ইটালীর অভ্যুত্থান ব্যর্থতার একটি মর্মান্তিক উদাহরণ সন্দেহ নাই। তথাপি পিডমণ্টের রাজবংশ এই অভ্যুত্থানে যে ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে এই রাজবংশের নেতৃত্বেই যে ইটালীর ঐক্য সাধন সম্ভব হইবে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৮৫০ হইতে ১৮৭০ এই বিশ বৎসরে ইটালীর জাতীয় ঐক্য ধীরে ধীরে

নিশ্চিত গতিতে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীবাসীদের স্বপ্ন সফল হয়। ইটালীর এই সাফল্যের মূলে যাঁহার অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হইলেন পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর।

ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে সমগ্র ইটালীতে হতাশা দেখা দেয়। ইটালীর এই দুর্দিনে কাভুরের আবির্ভাব মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অন্ধকার যুগে একমাত্র আশার আলো লইয়া আসে। কাভুর প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে ইটালী হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে না পারিলে দেশে ঐক্য আসিতে পারে না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় ছোট সার্ডিনিয়া রাজ্য ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরাভাগে দাড়াইল।

কাভুর ঃ কাউণ্ট ক্যামিল্লো কাভুর-ছিলেম সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তিনি প্রথমে কৃষি-কার্যে মন দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ-নীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী হইয়াই তিনি সার্ডিনিয়ার অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে মন দিলেন। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে সব রকমে সাহায্য করিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়া উৎসাহিত করিলেন। সমগ্র দেশে দ্রুত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা লইলেন। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিলেন। সামরিক বাহিনীকে তিনি নূতনভাবে গড়িয়া তুলিলেন।



কাভুর

পররাষ্ট্র নীতি ঃ ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের ফলে যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাভুর তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করিলেন। তিনি একজন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনিই প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ইটালীর রাজনৈতিক-ঐক্য সম্ভব হইবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়া ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করিলেন এবং অস্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করিবার জন্য অস্ট্রিয়া-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গড়িতে সচেষ্ট হইলেন। ইহার জন্য প্রথমেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইটালীর সমস্যা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেন। ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। কাভুরের চেষ্টায় পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া বাহিনী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইল এবং ইউরোপে সুখ্যাতি অর্জন করিল। যুদ্ধ-শেষে কাভুর

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে যোগ দেন এবং ইটালীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বৈঠকে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিকট নিবেদন করেন। ফলে ইটালীর সমস্যা সম্বন্ধে সমবেত রাষ্ট্রনায়করা অবহিত হন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্যারিস বৈঠক হইতে কাভুর মহানন্দে দেশে ফিরিলেন। ইহার পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাভুর প্লমবিয়ার্স নামক স্থানে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং বৈঠক শেষে নেপোলিয়নের সহিত প্লমবিয়ার্সের গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে ফ্রান্স ও পিডমন্ট যুগ্মভাবে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া পিডমণ্টের সহিত যুক্ত করা হইবে। পার্মা, মডেনা, টাসকেনি লইয়া একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করা হইবে। রোম এবং পোপের রাজ্যের কোন পরিবর্তন করা হইবে না। নেপলস যেমন ছিল তেমনি থাকিবে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পিডমণ্টের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস পাইবে। দেশে ফিরিয়া কাভুর কেবল সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং যে কোন অজুহাতে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

ইটালীর ঐক্য সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ঃ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সুযোগ দেখা দিল। অষ্ট্রিয়া সার্ডিনিয়ার সৈন্যবাহিনীকে তিনদিনের মধ্যে ভাঙিয়া দিবার দাবি জানাইল এবং সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলে যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব কাভুর সানন্দে বলিয়াছিলেন, "অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছি।" এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রো-সার্ডিনিয়া যুদ্ধ শুরু হইল এবং প্লমবিয়ার্সের চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্র পক্ষের সৈন্যদল মার্জেণ্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল। লম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির হাতে আসিল। কেবল ভেনেসিয়া হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার অধিকার লোপ পাইবে। ইতিমধ্যে পার্মা, মডেনা, টাসকানি এবং রোম অঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিল এবং সার্ডিনিয়ার সহিত তাহাদের রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তি দাবি করিল। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সহিত কোনরূপ আলোচনা না করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করিলেন। পরে এই যুদ্ধ-বিরতি জুরিখের সন্ধিতে পরিণত হয়। সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি পাইবে কিন্তু ইটালীর অন্যান্য রাজ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে। তৃতীয় নেপোলিয়নের আচরণে কাভুর হতবাক হইলেন। পিডমণ্ট একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ধীর-স্থির পিডমণ্টরাজ ইহাতে রাজী না হওয়ায় কাভুর পদত্যাগ করিলেন। কাভুরের পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ হইলেও জুরিখের সন্ধিতে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের অগ্রগতিই সূচিত হয়।

মধ্য ও দক্ষিণ ইটালীর অন্তর্ভুক্তিঃ কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ইটালীতে দেখা দিল তাহা মন্দীভূত হইল না। ভিলাফ্রাঙ্কা ইটালীয়দের স্বাধীনতার স্পৃহা, তাহাদের একতার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি করিল। ইটালীর জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইল যে, মধ্য ইটালীর পার্মা,

টাসকেনি, মডেনা ও রোমগ্না প্রভৃতি রাজ্যের জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করিয়া সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কাভুর পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদে ফিরিয়া আসেন এবং নেপোলিয়নের সহিত নূতন এক চুক্তি করেন। ইহাতে স্থির হয় পার্মা, মডেনা ও টাসকেনি পিডমণ্টের সহিত যুক্ত হইবে। ফ্রান্স অবশ্য স্যাভয় ও নীস পাইবে। গণভোটের মাধ্যমে অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইল। ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের নায়ক হইলেন গ্যারিবল্ডি।

গ্যারিবল্ডি : গ্যারিবল্ডি এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি বাড়ি হইতে পলাইয়া যান এবং নৌবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হন। এই সময় তিনি ম্যাটসিনির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার আদর্শে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহকর্মীরূপে কাজ করিতে থাকেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ইটালীর পিডমণ্টে যে বিদ্রোহ হয় তিনি তাহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় গ্যারিবল্ডিকে দেশান্তরী হইতে হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি ইটালীতে ফিরিয়া আসেন এবং সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার রাজনৈতিক গুরু ম্যাটসিনি রোম নগরীতে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গ্যারিবল্ডি এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি রোম রক্ষার জন্য ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। শেষে অবশ্য তাঁহাকে রোম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নেপলস্ ও সিসিলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিলে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করিতে মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা লইয়া তথায় যান। গ্যারিবল্ডি সৈন্যবাহিনী লইয়া সিসিলিতে অবতরণ করিলে সেখানকার জনসাধারণ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। অভূতপূর্ব জনসমর্থন পাইয়া গ্যারিবল্ডি মুক্তিদাতা হিসাবে তিন মাসের মধ্যে সমগ্র সিসিলি অধিকার করিলেন এবং নিজেকে সিসিলির সর্বাধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়া নেপলসে আসেন। তাঁহার পেঁছান সংবাদ পাইয়া নেপলসের জনসাধারণ অত্যাচারী বুরবোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস প্রাণভয়ে গেটা নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। গ্যারিবল্ডি যুদ্ধ বুঝিতেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধার ধারিতেন না। নেপলস্ জয় করিয়া তিনি রোম ও ভেনিস জয় করিবার কথা


গ্যারিবল্ডি

ঘোষণা করিলে কাভুর মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কারণ গ্যারিবল্ডি রোম আক্রমণ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং অস্ট্রিয়া একজোটে পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। কাভুর প্রথমে গ্যারিবল্ডিকে রোম আক্রমণ না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন কিন্তু গ্যারিবল্ডি ইহা ভীরুতার নামান্তর বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপ সংকটময় অবস্থায় কাভুর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত লইলেন। গ্যারিবল্ডির হাত হইতে রোম ও পোপকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তর দিক হইতে পোপের রাজ্য জয় করিয়া তিনি রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে নেপলসে পাঠাইলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল নেপলস্-এ প্রবেশ করিলে গ্যারিবল্ডি তাঁহাকে 'ইটালীর রাজা' বলিয়া বরণ করিয়া লন এবং সমস্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। রাজা ইমানুয়েল তাঁহাকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, কিন্তু এই নির্লোভ পুরুষসিংহ কপর্দক না লইয়া নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে মহানন্দে প্রস্থান করেন। এরূপ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম মানুষকে মহামানবে পরিণত করে এবং জীবনীকে মহাকাব্যের রূপ দেয়।

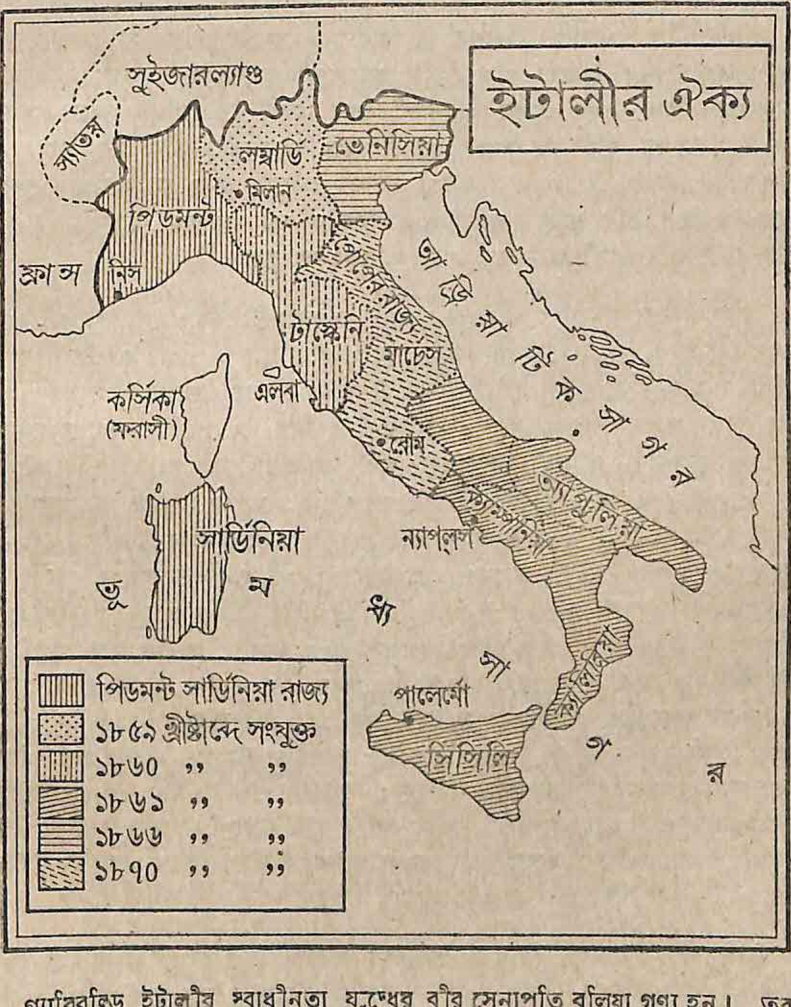
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তুরিনে সংযুক্ত ইটালীর পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসে। ভিক্টর ইমানুয়েলকে রাজমুকুট দিয়া 'ইটালী রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ভেনিস এবং রোম ভিন্ন সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ হইল। ইহার কিছুদিন পরই কর্মক্লান্ত কাভুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইটালীর ঐক্যের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ভেনিস ও রোম-এর ঐক্যবদ্ধ ইটালীর সহিত যুক্ত হইতে বেশী দেরী হইল না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ায় যুদ্ধ হইলে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রাশিয়ার নিকট অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। যুদ্ধ শেষে প্রাগের সন্ধি অনুসারে ইটালীকে সে ভেনিস দিতে বাধ্য হয়।

ইটালীর ঐক্যের তৃতীয় পর্যায়ঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রান্স তাহার সৈন্যদল রোম হইতে সরাইয়া লয়। এই সুযোগে ইটালীয় বাহিনী রোম দখল করিয়া লয়। ইটালীর রাজধানী রোমে স্থানান্তরিত হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর ঐক্যও সম্পূর্ণ হইল।

ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনে বিভিন্ন নেতার অবদানঃ ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কাভুরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি পাইয়াছেন। তাঁহাকে নব্য ইটালীর স্রষ্টা বলা হয়। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ভিন্ন ইটালীর ঐক্য সম্ভব হইত না। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া অস্ট্রিয়ানদের ইটালী হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না। আর ইটালীতে অস্ট্রিয়ার শাসনের অবসান না ঘটিলে স্বাধীনতা আসিবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়া ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করিলেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য লইলেন। ফ্রান্স তাঁহাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিল। ইংলণ্ডও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু হইল তখন তিনি ধৈর্য,

সাহস ও দক্ষতার সহিত ইহাকে পরিচালিত করেন। মধ্য ইটালীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে তিনি রাজতন্ত্রী পথে পরিচালিত করেন। গ্যারিবল্ডির হাত হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্য রাজা ইমানুয়েলকে নেপল্‌স্‌-এ প্রেরণ করিয়া তিনি অসামান্য রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেন। পরিশেষে বলা যায় যে ইটালীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে তিনি ইটালীকে এক জাতিতে পরিণত করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। ম্যাটসিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডির রণনৈপুণ্য এবং ইমানুয়েলের নির্ভীক দেশপ্রেম বৃথায় ব্যয়িত হইত যদি না কাভুর এগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন।



গ্যারিবল্ডি ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলিয়া গণ্য হন। তরুণ বয়সে তিনি ইটালীর প্রায় সমস্ত বিপ্লবগুলিতেই যোগ দেন। ম্যাটসিনির তিনি ছিলেন সুযোগ্য শিষ্য। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিসিলির জনসাধারণ তাঁহাকে বিপ্লবের

নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান জানায়। গ্যারিবল্ডি তাঁহার মাত্র এক হাজার অনুচর লইয়া সিসিলি দ্বীপ হইতে অত্যাচারী বুরবোঁ রাজাকে বিতাড়িত করেন। সিসিলি জয় করিয়া তিনি নেপলস্ জয় করেন এবং ইমানুয়েল নেপলস্-এ প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখান এবং নিজে সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া জনসাধারণকে রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া লইবার জন্য মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানান। তিনি দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেন এবং নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এইখানেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ব। তাঁহার আত্মত্যাগের আদর্শ ইটালীর যুবকবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

ম্যাটসিনির অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্বোনারীর সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলনের পথ ছাড়িয়া দিয়া তিনি গণবিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। তিনি ইটালীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। অখণ্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তিনি তাহা লেখনী ও কার্যাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণ করেন। এ কারণে তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়।

জনসাধারণের অবদানঃ ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে কেবলমাত্র কয়েকজন নেতারই অবদান ছিল না; জনসাধারণেরও উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রো-সার্ডিনিয়া যুদ্ধ শুরু হইলে পার্মা, মডেনা, টাসকানি ও রোম অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং সার্ডিনিয়ার সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণ দাবি করিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের সংবাদে ভীত হইলেন। তিনি প্লমবিয়ার্সের চুক্তি নাকচ করিয়া দিয়া অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত ভিলাফ্রাঙ্কার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ইটালীতে দেখা দেয় তাহাতে ভাটা পড়িল না। ভিলাফ্রাঙ্কা চুক্তিতে ইটালীয়দের স্বাধীনতা স্পৃহা, এবং একতার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহারা মধ্য ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। জনসাধারণের এই বিপ্লবী কার্যকলাপের ফলে ইটালীর ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করিল। কাভুর যখন পদত্যাগ করিলেন, রাজা ইমানুয়েল যখন ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি মানিয়া লইলেন অর্থাৎ নেতৃত্ব যখন দেউলিয়ার পথে, ঠিক সেই সময়েই জনসাধারণ অগ্রসর হইল তাঁহাদের মাতৃভুমির ঐক্য সাধন তরান্বিত করিতে। ইহার পর সিসিলি ও নেপলসের জনসাধারণের কথা মনে আসে। তাহারা অত্যাচারী বুরবোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল এবং গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের হটাইয়া দিল। সুতরাং ইটালীর ঐক্যসাধনে জনসাধারণের অবদান অনস্বীকার্য।

জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলনঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানীর অবস্থা ইটালীর ন্যায়ই ছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ৩৯টিতে পরিণত করা এবং একটি শিথিল যৌথ রাজ্য গঠন করা হয়। এই যৌথ রাজ্যটি ছিল অসংবদ্ধ। যৌথরাজ্যের একটি পরিষদ ছিল। অস্ট্রিয়া এই

পরিষদের সভাপতি হয় এবং প্রাশিয়াকে সহ-সভাপতি করা হয়। অস্ট্রিয়া এই পরিষদের মাধ্যমে জার্মানীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে। জার্মানীর কোন রাষ্ট্রেই যাহাতে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হয় তাহার জন্য মেটারনিক সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু জার্মান রাজ্যগুলিতে ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত প্রগতিবাদ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ইতিমধ্যে জার্মান মনীষিগণ লেখনীর মাধ্যমে জার্মানদের মনে ঐক্য বোধের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। ফিক্টে, ক্যাণ্ট, শিলার, হেগেল, হেসার, ডলম্যান, স্টেন, বোজার প্রমুখ প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌গণ জার্মানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্টবার্গ নামক স্থানে একটি যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে মেটারনিক ইহাকে বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করেন। ইহার দুই বৎসর পর রক্ষণশীল নাট্যকার কোটজেবুয়েকে একটি ছাত্র হত্যা করিলে মেটারনিক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সমগ্র জার্মানীতে প্রগতি আন্দোলন চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কার্লসবাডে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের সভা ডাকিলেন। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য, সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রগতিপন্থী সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন বন্ধ করিবার জন্য কয়েকটি বিধি গৃহীত হইল। ইতিহাসে এগুলি কার্লসবাড ডিক্রীস্‌ বলিয়া পরিচিত। সর্ব-ক্ষেত্রে প্রগতি আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করাই ছিল এই বিধিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্লসবাড বিধিগুলি প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া জার্মানীতে দমননীতি অব্যাহত রাখিয়াছিল।

জোলভারিন ও জার্মানী: ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া নেহাত অর্থনৈতিক কারণেই তাহার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে একটি শুল্ক সংঘের বা জোলভারিনের সৃষ্টি হয়। ক্রমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে অস্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর সকল রাষ্ট্রই ইহাতে যোগ দিয়াছে। এই শুল্ক সংঘ জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়া পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করে। অস্ট্রিয়া ছাড়া যে জার্মানী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম এই আত্মপ্রত্যয় জোলভারিন-এর মাধ্যমে গড়িয়া উঠে এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার বাস্তব ও মানসিক ভিত্তি তৈয়ারী হয়।

১৯৪৮-এর বিপ্লব: ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। এই সময় প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতিকে এক করিবার প্রস্তাব ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার অস্ট্রিয়া ভীতি প্রবল থাকায় ইহা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এই সময় প্রাশিয়ার চতুর্থ ফেডারিক উইলিয়াম সমগ্র জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৭টি জার্মান রাষ্ট্র তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন জার্মান ইউনিয়নের পার্লামেন্ট আরফুট নামক স্থানে মিলিত হয়। প্রাশিয়ার এই কাজেও অস্ট্রিয়া বিরক্ত হইল এবং প্রতিবাদ জানাইয়া দাবি করিল যে জার্মানীতে ১৮১৫-এর যৌথরাজ্য ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে

হইবে। প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার মনোভাবে ভীত হইয়া নবগঠিত ইউনিয়ন ভাঙিয়া দিল। ফলে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যৌথরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাশিয়ার এই নীতি স্বীকারকে 'ওলমুজের অপমান' বলা হয়।

ঐক্য আন্দোলনের নূতন পর্যায় ঃ ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের ইটালীর ঘটনা সমগ্র জার্মানীতে বিশেষ করিয়া প্রাশিয়ায় এক বিরাট উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। প্রগতিবাদীরা পুনরায় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসন ও রাজনৈতিক ঐক্য আনিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানরা মনে করিলেন যে তাহাদের দেশের ঐক্য একমাত্র প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই সম্ভব। এই সিদ্ধান্তে পেঁছাইবার আগে ভাবিয়া দেখিলেন যে, ক্ষুদ্র পিডমণ্ট যদি ইটালীর নেতৃত্ব লইতে পারে তবে প্রাশিয়া জার্মানীতে কেন তাহা পারিবে না। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে দেখা দিল প্রাশিয়ার রক্ষণশীল অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে।

অটোভন্ বিসমার্ক ঃ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১ম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের ফলে প্রাশিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় শুরু হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে জার্মানীর অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমেই তিনি প্রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রাশিয়ান পার্লামেণ্ট ব্যয়াধিক্যের অজুহাতে তাঁহার এই কাজে বাধা দিল। ফলে প্রাশিয়ায় এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। এই অচল অবস্থা অবসানের জন্য তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অটোভন্ বিসমার্ককে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন।


বিসমার্ক

জীবনী ঃ বিসমার্ক এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় তিনি দেখাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন কিন্তু চাকরির একঘেয়েমিতে বিরক্ত হইয়া নিজের ক্ষেতখামারের কাজে মন দেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকরূপে প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম হইতে প্রজা স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এবং সামরিক শক্তিতে তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নহে—ইহা তাঁহার প্রাণের কথা ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক প্রাশিয়ার

মন্ত্রিসভার সভাপতিরূপে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভার সভাপতি পদে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী তিনিই জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন।

বিসমার্কের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়াকে সম্মিলিত জার্মানীর নেতৃত্বাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করা। তিনি সহজেই উপলব্ধি করিলেন যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যসাধনের পথে প্রধান অন্তরায় অস্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়ার অন্তরায় ফ্রান্স। তিনি প্রাশিয়াকে সামরিক শক্তিতে অজেয় করিয়া তুলিলেন। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ রাখিলেন এবং সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিলেন। তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন যে, সামরিক শক্তির সাহায্যে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। সামরিক শক্তির সাহায্যেই জার্মানীর ঐক্য সাধনের ন্যায় বৃহৎ ও জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। ইহার জন্য বিসমার্ককে তিনটি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের সহিত।

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ : শ্লেজউইগ, হলস্টেন স্থান দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া বিসমার্ক ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের অধিকারে থাকিলেও হলস্টেন ছিল জার্মান যৌথরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যে, এই দুইটি স্থান ডেনমার্ক-এর শাসনাধীনে থাকিলেও তাহাদের ডেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি অঞ্চলকে ডেনমার্কের সহিত যুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করা হইলে ইহার বিরুদ্ধে সমগ্র জার্মানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। কারণ এই অঞ্চল দুইটিতে বহু সংখ্যক জার্মান বাস করিত। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যুগ্মভাবে ডেনমার্ককে এই দুইটি অঞ্চল সংযুক্ত করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিল। ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত বাহিনী ডেনবাহিনীকে পরাজিত করিয়া এই দুইটি অঞ্চল অধিকার করিল। যুদ্ধ শেষে এই অঞ্চল দুইটির শাসন ব্যবস্থা কি হইবে তাহা লইয়া অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। অবশেষে গেস্টিনের চুক্তি দ্বারা ঠিক হইল যে শ্লেজউইগ ও হলস্টেনে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুগ্ম-শাসন প্রবর্তিত হইলেও প্রাশিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হলস্টেনের শাসনভার দেওয়া হইল অস্ট্রিয়াকে আর শ্লেজউইগ রহিল প্রাশিয়ার অধীনে। বিসমার্ক ভবিষ্যতে যাহাতে অস্ট্রিয়ার সহিত ইহা লইয়া যুদ্ধ করা যায় সেদিকে নজর রাখিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন নিতান্ত সামরিক ভাবেই কাগজ দিয়া অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সম্পর্কের ফাটল বন্ধ করা হইয়াছে। শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রাশিয়ার এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিসমার্ক ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার সহিত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৬৬) : বিসমার্ক বিশ্বাস করিতেন যে জার্মানীতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার একত্রে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং তিনি জার্মানী হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ কূটনীতির দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিলেন যাহার ফলে অস্ট্রিয়া যুদ্ধের সময় নির্বান্ধব অবস্থায় রহিল। বিসমার্ক প্রথমেই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত বিয়ারিজ নামক স্থানে মিলিত হইলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নেপোলিয়নের দুর্বলতা ছিল। তিনি ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক সাহায্য দিয়াছিলেন। জার্মানীর ক্ষেত্রে তিনি একেবারে না করিতে পারিলেন না। অস্ট্রো-প্রাশিয়ান কলহে নিরপেক্ষ থাকিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ জার্মানীর কিছু স্থান বা বেলজিয়াম ফ্রান্স পাইবে বলিয়া বিসমার্ক ইঙ্গিত দেন। অবশ্য পুরস্কার কিংবা অন্য কোন বিষয়ে দুইজনের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই বিসমার্ক রাশিয়ার সাহত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল-বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে তিনি সমর্থন জানান। ফলে রাশিয়ার সহিত প্রাশিয়ার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। বিসমার্ক নবগঠিত ইটালী রাজ্যের সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত করিলেন। ঠিক হইল যে ইটালী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সাহায্য করিবে এবং ইহার বিনিময়ে ইটালী ভেনিসিয়া পাইবে। ইংলণ্ডও যে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে এ বিষয়ে বিসমার্ক নিঃসন্দেহ হইলেন। এইভাবে অস্ট্রিয়াকে নির্বান্ধব করিয়া বিসমার্ক অস্ট্রিয়া আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। তিনি কিন্তু বহির্জগতের নিকট দেখাইতে চাহিলেন যে অস্ট্রিয়াই আক্রমণকারী।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়ঃ কূটনৈতিক প্রস্তুতি শেষ করিয়া বিসমার্ক হঠাৎ জার্মান কনফেডারেশনের গঠনবিধি সংস্কার করিবার কথা ঘোষণা করিলেন এবং প্রাশিয়ার প্রতিনিধিকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়া কনফেডারেশনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে অস্ট্রিয়া হলস্টেনে প্রাশিয়াবিরোধী প্রচার কার্য চালাইতেছে। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটি জার্মান যৌথরাজ্যের ডায়েটে পেশ করিল। কিন্তু গেস্টিন সম্মেলনে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছিল যে ডায়েটের বাহিরে এই প্রশ্নটির মীমাংসা হইবে। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে বিসমার্ক হলস্টেনে সৈন্য পাঠাইলেন এবং স্থানটি দখল করিয়া লইলেন। ইহাতে অস্ট্রিয়া ডায়েটে প্রস্তাব করিল যে, জার্মান সংযুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীগুলি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাঠানো হউক। প্রাশিয়া ইহার উত্তরে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিল। এই যুদ্ধ মাত্র সাত সপ্তাহ চলিয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং প্রাগের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। অস্ট্রিয়াকে কোন স্থান হারাইতে হইল না এবং তাহার নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণও দাবি করা হইল না কিন্তু অস্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করিতে হইল এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। অস্ট্রিয়াকে অবশ্য ইটালীতে ভেনিসিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্রই এই সমগ্র অঞ্চলের শাসনতন্ত্র রূপে গৃহীত হইল।

স্যাডোয়া যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে মধ্য ইউরোপের শক্তিসাম্যে পরিবর্তন আসিল। প্রাশিয়া ইউরোপের ইতিহাসে নূতন মর্যাদা পাইল। মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র-বিন্দু ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হইল। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে ফ্রান্সের স্বার্থহানি ঘটিল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হইল। একারণে স্যাডোয়ায় অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলিয়া মনে করিল। এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর ঐক্য সাধনের ইতিহাসে একটি পর্যায় শেষ হইল। প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে রক্ষণশীল ও সমরবাদী বিসমার্কের নীতিরই জয় হইল এবং তাঁহার সাফল্য তাঁহার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করিল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানীর যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রে ২২টি জার্মান রাজ্য যোগ দেয় এবং একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও স্যাডোয়ার পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন একান্ত-ভাবে প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দ্বৈতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৭০) ঃ উত্তর জার্মানী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইলেও দক্ষিণ জার্মানী তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিল। ফ্রান্স দক্ষিণ জার্মানীর এই স্বাধীন অস্তিত্ব অটুট রাখিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছিল এবং প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া দিলেন এই বলিয়া যে, দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন করা না হয়। তিনি আরও দাবি করিলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে তাহা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে কারণে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখিবার জন্য ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এখন ফ্রান্সের 'ক্ষতিপূরণ' স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্ভট দাবিতে বিসমার্ক-এর দৃঢ় ধারণা হইল যে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তি অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী। তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। এদিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচারকার্য অব্যাহত রাখিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিলে প্রাশিয়া যে জয়ী হইবেই তাহা তিনি জানিতেন। তাহা ছাড়া ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে দক্ষিণ জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি যে জাতীয়তাবাদী জনমতের চাপে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিতে বাধ্য হইবে সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে তিনি কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রাশিয়াকে বুঝাইলেন যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইলে রাশিয়া

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তির কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধীয় ধারাগুলি নাকচ করিবার সুযোগ পাইবে। ইহাতে রাশিয়া বিসমার্ককে সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইটালীও নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া কথা দিল। অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা নীতি ভিন্ন অন্য কোন কথাই চিন্তা করিল না। ইংলণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাজ্যগ্রাস নীতি ভাল চোখে দেখিল না। ফলে বিসমার্কের সুবিধা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে বিসমার্ক তাঁহার কূটনীতি দ্বারা ফ্রান্সকে সম্পূর্ণভাবে মিত্রহীন রাখিতে পারিয়াছিলেন। বিসমার্ক ইহার পরে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজিতে লাগিলেন। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া গোলযোগ দেখা দিলে বিসমার্ক তাহাতে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজিয়া পাইলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহের ফলে রানী ইসাবেলা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফলে স্পেনের সিংহাসন খালি হয়। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার হোহেন-জোলার্ন বংশীয় লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনৈতিক চাপে লিওপোল্ড ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ফ্রান্স তাহার প্রাশিয়াস্থ রাজদূতকে প্রাশিয়ার রাজার সহিত দেখা করিবার নির্দেশ দিল এবং বলা হইল রাষ্ট্রদূত যেন প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যাহাতে ভবিষ্যতে হোহেন-জোলার্ন রাজবংশের কেহই স্পেনের রাজসিংহাসনের জন্য প্রার্থী না হন। এই সময়ে প্রাশিয়ার রাজা এমস্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ফরাসী সরকারের দাবি জানাইলে রাজা এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তারযোগে তাঁহার সহিত ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তা বিসমার্ককে জানাইলেন। বিসমার্ক প্রথমে সেনাপতিদের নিকট হইতে প্রাশিয়ার সমরপ্রস্তুতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া টেলিগ্রামের মূল বক্তব্য না বদলাইয়া তিনি উহার সংক্ষিপ্তসার এমনভাবে বয়ান করিলেন যে জার্মানরা পড়িয়া মনে করিবে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাহাদের প্রিয় রাজাকে অপমানিত করিয়াছে। অন্যদিকে ফরাসীরা মনে করিবে যে তাহাদের প্রিয় রাজা অপমানিত হইয়াছে। বিসমার্ক যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল।

যুদ্ধের পথে ফ্রান্স ঃ ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলি ও যুদ্ধবাজগণ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। ফ্রান্স প্রাশিয়া অপেক্ষা সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া মনে করিত এবং যত শীঘ্র যুদ্ধ বাধিবে ফ্রান্সের জয়ও সুনিশ্চিত হইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল।

প্রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল না। তাহার সামরিক বিভাগ পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল।

ফ্রান্সের পরাজয় : ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার ফলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সকে আক্রমণকারী বলিয়া মনে করে। যুদ্ধ শুরু হইলে দেখা গেল যে প্রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থা এরূপ নিখুত ও সুপরিকল্পিত যে যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। অপরদিকে ফ্রান্সের সমর প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। ফ্রান্সের মিত্র বলিয়া কাহাকেও দেখা গেল না। অপরদিকে দক্ষিণ জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিল।

যুদ্ধ শুরু হইলে দেখা গেল ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইতে লাগিল। উইসেনবুর্গ, স্পিকেয়েন, ওয়ার্থ; গ্র্যাভেলোৎ-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল।

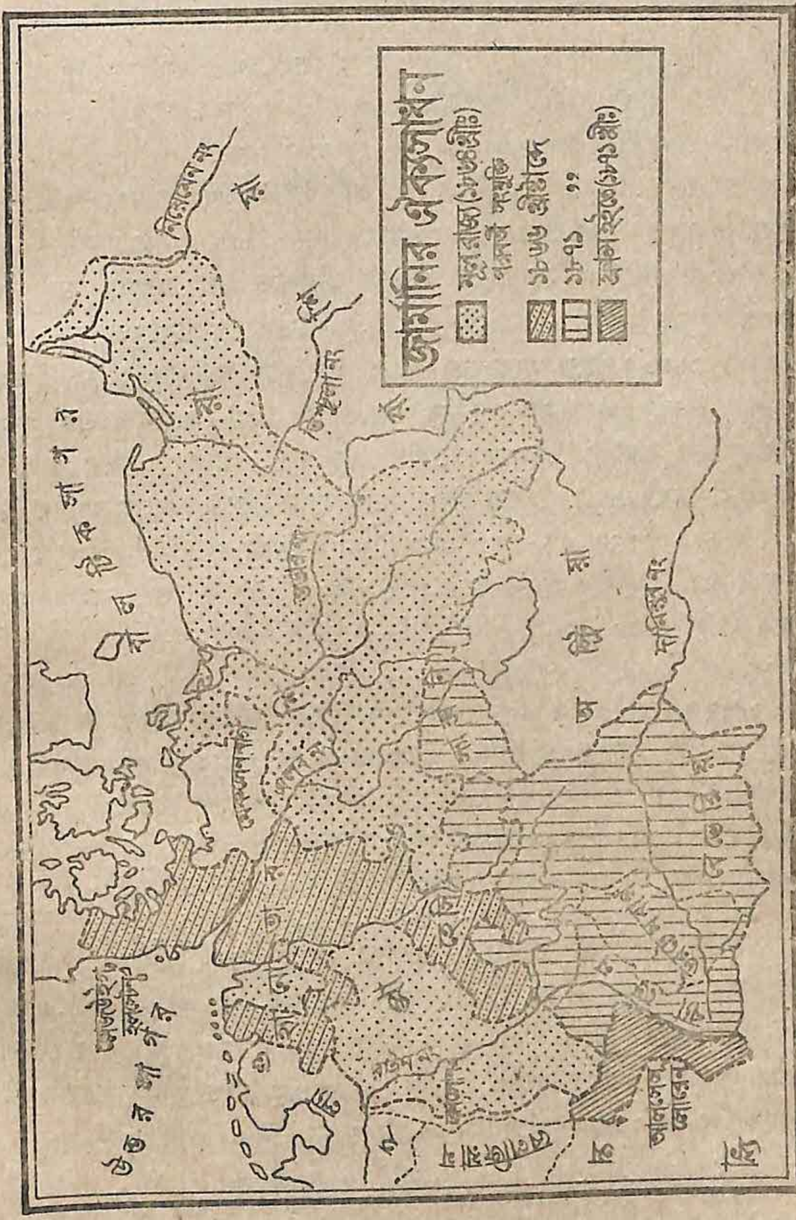
প্রাশিয়ার সেনাপতি মল্টকের সমর কৌশলের নিকট ফরাসী সেনাপতি ম্যাকমেহোন প্রতি ক্ষেত্রেই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের যুদ্ধে ফয়াসী সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। ফরাসী সম্রাট স্বয়ং বন্দী হইলেন। এই সংবাদ প্যারিসে পৌঁছিবামাত্র এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ফরাসী জাতি পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। গ্যামেবটার নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠিত হয়। বিসমার্ক এই সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি নূতন নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হইবে তাহার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভার্সাই সন্ধি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ বৎসরের মে মাসে ফ্রাঙ্কফোর্টে এই সন্ধিপত্র পাকাপাকিভাবে উভয়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইল। ইহার দ্বারা ফ্রান্স জার্মানীকে মেট্‌জ, আলসেস্‌লোরেন ও টাস্‌বার্গ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহাছাড়া ৫০০ কোটি ফ্রাঁ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে স্থির হয় এবং ততদিন পর্যন্ত জার্মানীর এক সামরিক বাহিনী ফরাসী সরকারের খরচে ফ্রান্সে থাকিবে, এই ব্যবস্থাও করা হয়।

১৮৭১-এর ব্যবস্থার তাৎপর্য : ১৮৭১-এর ব্যবস্থা ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। দক্ষিণ-জার্মান রাজ্যসমূহ প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবার ফলে জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ভার্সাইয়ের সিস্‌-মহলে জার্মান রাজন্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ম জার্মান সম্রাট-রূপে ঘোষিত হইলেন। এই ব্যবস্থার ফলে জার্মানীর ঐক্যসাধন কেবলমাত্র সম্পূর্ণ হইল না, কেবলমাত্র জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হইল না, নূতন জার্মান রাষ্ট্র

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য বিদায় লইল এবং এক নূতন শক্তিসাম্যের আবির্ভাব ঘটিল। বার্লিন ইউরোপের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইল। বিসমার্ক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকৃতি পাইলেন। এই ব্যবস্থা ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘন্টা বাজাইল। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসেস্ ও লোরেন কাড়িয়া লইয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিবার ফলে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অস্বাভাবিক অবস্থায় রহিল। ফরাসী জনসাধারণ জার্মান-বিদ্বেষী হইল। ফ্রান্স তাহার পরাজয়ের কথা ভুলিতে পারিল না। এই ব্যবস্থার ফলে ইটালীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হইল। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস সন্ধির শর্তগুলি ভাঙিয়া দিতে সাহসী হইলেন। তিনি কৃষ্ণসাগরে পুনরায় রাশিয়া ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করিলেন এবং সিবাস্টো প্রভৃতি স্থান সুরক্ষিত করিলেন। ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যা জটিলতর হইল। রাশিয়ার একতরফা এই কাজের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রই বিশেষ প্রতিবাদ করিল না। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় ইহাই স্বীকৃত হইল যে রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য। ফলে ইউরোপের রাজনীতি অনেকটা যুদ্ধভীতি দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপে যে রাজনৈতিক কাঠামো তৈয়ারী করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল ১৮৭১-এর ব্যবস্থায়। জার্মানী ও ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের চরম জয় সূচিত হইল।

জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে বিসমার্কের অবদানঃ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে কয়েকটি মূল উদ্দেশ্য সাধনে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেনঃ (ক) বিসমার্কের সর্ব-প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা। জার্মানীর ঐক্য সাধন করিতে যাইয়া তিনি প্রাশিয়ার প্রাধান্যের বিলুপ্তি বা রাজতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। (খ) সুতরাং রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য; তিনি মনে করিতেন যে পার্লামেন্টের জয়ের মাধ্যমে বা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জার্মানীর ঐক্য সম্ভব নয় বা জার্মানীর উন্নতি সম্ভব নয়। (গ) জার্মানীর ঐক্য সাধনের তথা প্রাশিয়ারাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল অস্ট্রিয়া; সুতরাং অস্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বিতাড়ন করা তিনি সর্ব প্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। জার্মানীর উপর হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের অবসান ঘটাইবার কথা তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। (ঘ) বিসমার্ক ছিলেন সামরিক

শক্তিতে বিশ্বাসী ; জার্মান ঐক্য সাধনের জন্য এবং অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের জন্য তিনি তাই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা তাঁহার প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। বছরের পর



বছর পার্লিয়ামেণ্টের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন।

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে তিনি এক দুর্ধর্ষ এবং অপ্রতিহত সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে পর পর তিনটি যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হন। (ক) প্রথমতঃ শ্লেজউইগ হলস্টেইন-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার সহিত সহযোগিতা করেন এবং ডেনমার্ককে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহার ফলে জার্মান-ঐক্যের পথে বিসমার্ক কিছুটা অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু তাহার চাইতেও বড় কথা এই যে, তিনি ডাচি দুইটির উপর আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তোলেন। (খ) অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের পূর্বে তিনি রাশিয়ার সহানুভূতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন; ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা অর্জন করেন এবং ইতালীর সহযোগিতা লাভ করেন। অতঃপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেন। (গ) জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিসমার্ক অতঃপর ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি ফরাসী সম্রাটকে যুদ্ধে অবতার্ণ হইতে বাধ্য করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হইলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হইল, প্রাশিয়ার রাজা জার্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

১৮৬২ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকটি বছরে বিসমার্ক তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি এরূপ সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছিল;—প্রাশিয়ারাজের অধীনে সমগ্র জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বিসমার্ক যে একজন শ্রেষ্ঠ কুটকৌশলী রাজনীতিবিদ্ এবং সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাহা তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা হইতেই বোঝা যায়।

প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের মাত্র নয় বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ এবং আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মনীতে একটি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন। ইহা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। তবে বিসমার্ক কেবলমাত্র যুদ্ধের উপর নির্ভর করেন নাই। বরঞ্চ কুটনীতির সার্থক প্রয়োগ করিয়া তিনি পূর্বেই যুদ্ধ জয়ের ব্যবস্থা নিখুঁত করিয়া তুলিতেন।

জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের তুলনা ঃ জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের তুলনা করা সহজ, কারণ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের মিল ও অমিল উভয়ই

ছিল। সাদৃশ্যের পক্ষে বলা যায় ঃ—(ক) উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলন বা যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। (খ) উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। (গ) উভয় ক্ষেত্রেই ঐক্য প্রচেষ্টা একই পথে পরিচালিত হইয়াছিল। তিনটি নির্দিষ্ট স্তরে তিনটি যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া উভয়েই ঐক্য সম্পূর্ণ করিয়াছে। (ঘ) উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রধান রাজ্য ঐক্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিল। ইটালীতে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া আর জার্মানীতে প্রাশিয়া। (ঙ) আদিতে উভয়ের শত্রু ছিল অস্ট্রিয়া এবং (চ) উভয় ক্ষেত্রেই একজন মন্ত্রী ঐক্য আন্দোলনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন।

কিন্তু দুইটি দেশের ঐক্য আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য ও চোখে পড়ে। কাভুরের কাজ অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ছিল। পিডমণ্ট ছিল দুর্বল রাষ্ট্র। একারণে কাভুরকে বৈদেশিক সাহায্য লইতে হইয়াছিল এবং ইহার জন্য ইটালীর জাতীয় স্বার্থও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিসমার্কের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাই তাঁহার কাম্য ছিল। ইহার জন্য জার্মানীর জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ বিসমার্ককে করিতে হয় নাই। পিডমণ্ড ইটালীর অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষমতাশালী ছিল না। কিন্তু জার্মানীতে প্রাশিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র।

জোনভারেনের মাধ্যমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্ব পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। জার্মানীতে কোন বিদেশী শাসন ছিল না। সুতরাং সেখানে সমস্যা ছিল অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপন করা। কিন্তু ইটালীতে বিদেশী শাসন প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইটালীতে ঐক্য আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল।

তবে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের পথেও নানারূপ বাধা ছিল। প্রথমত, জার্মানীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থ এবং আঞ্চলিকবোধ প্রবল ছিল। জার্মানীর কয়েকটি রাষ্ট্রে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব প্রবল থাকায় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মী প্রাশিয়ার পক্ষে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইটালীতে গ্যারিবল্ডি ছিলেন, কিন্তু জার্মানীতে কোন গ্যারিবল্ডি ছিলেন না। তৃতীয়ত, কাভুর গণ-সমর্থন পাইয়াছিলেন, বিসমার্ককে পার্লামেণ্টের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

কাভুর ও বিসমার্ক ঃ নেতা হিসাবে বিসমার্ক ও কাভুরের তুলনা করা যায়। কাভুর ছিলেন উদার নীতিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। তিনি পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। গণভোটকে তিনি ইটালীর ঐক্য আন্দোলন সফল করিবার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া, ইটালীর ঐক্যকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া ইটালীর মধ্যে তিনি পিউমণ্টকে মিলাইয়া দেন। কিন্তু বিসমার্ক ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তিনি পার্লামেণ্ট, গণতন্ত্র, গণভোট প্রভৃতি গ্রাহ্য করিতেন না। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁহার নিকট প্রাশিয়াই ছিল সব কিছু। প্রাশিয়ার সহিত তিনি জার্মানীকে মিলাইয়া দেন। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিন হইল নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং প্রাশিয়ার রাজা হইলেন জার্মানীর সম্রাট। প্রাশিয়ার আইনকানুন, রীতিনীতি সমগ্র জার্মানীতে প্রবর্তন করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ : রাষ্ট্রজোট ব বস্থা (১৮৭১-১৯১৪)

যুগটির বৈশিষ্ট্য, বিসমার্ক ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জার্মানী (১৮৭১-১৯১৪), বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি, ঔপনিবেশিক নীতি. কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শাসন কাল, বিভিন্ন সংস্কার ও ভূমিদাস প্রথার অবসান, পোল্যান্ডে বিদ্রোহ, বৈদেশিক নীতি, তৃতীয় আলেকজান্ডার (১৮৮১-১৮৯৪), দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭), স্টলিপিন সংস্কার দুইটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত ইউরোপ।

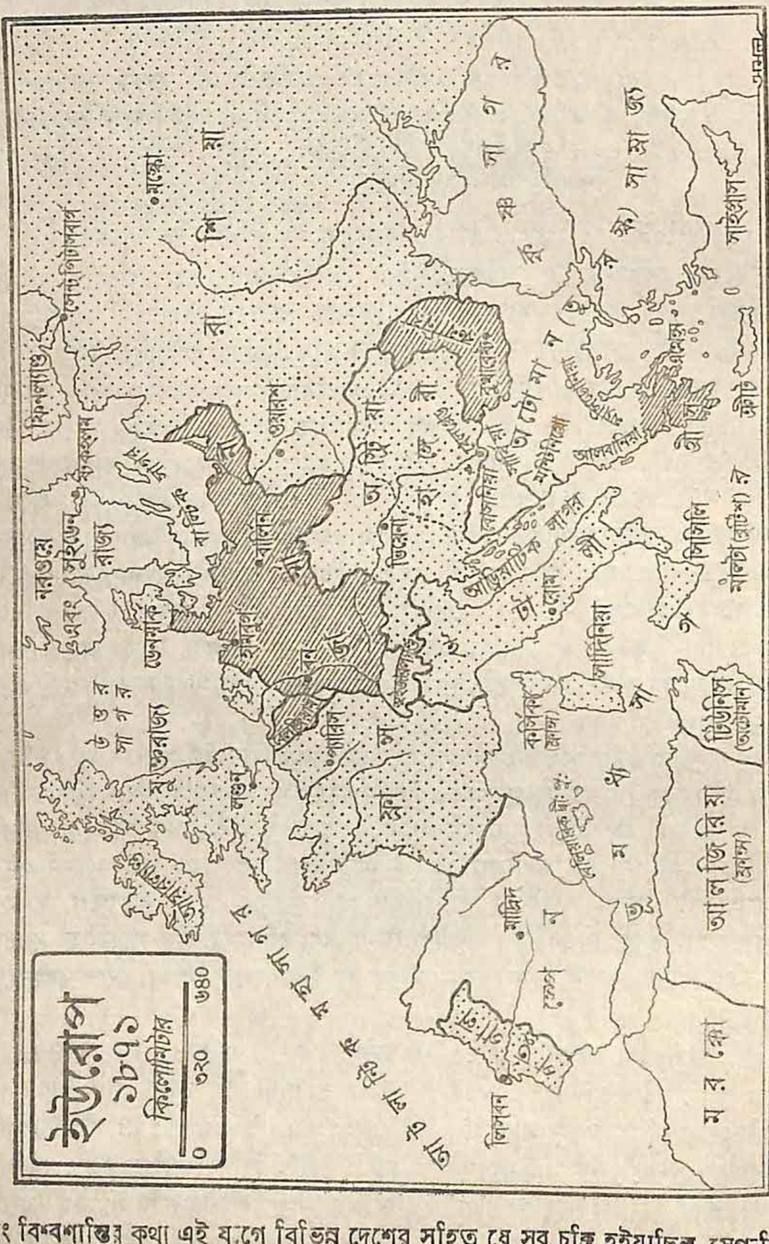
যুগটির বৈশিষ্ট্য : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে উদারনৈতিক ভাবধারা জয়যুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই লিখিত সংবিধান ও আইনসভা প্রচলিত হইয়াছিল। ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হইয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকারগুলি হইয়াছিল সুদৃঢ়।

এই যুগে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে উদারনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক এই দল পরিচালিত হইত। প্রত্যেক দেশের উদারনৈতিক দল এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্মুখীন হইল। এই নূতন দলটি শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের দল বা মুখপাত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক একটি রাষ্ট্রে এই দলটি এক এক নামে অভিহিত হইত। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। এই যুগে বিভিন্ন দেশের রক্ষণশীল দলগুলিও যুগোপযোগী হইবার চেষ্টা করে। গ্রেট ব্রিটেনে ডিজরেলীর নেতৃত্বে টোরীদল গণতন্ত্রের পোশাক পরিয়া লয়। জার্মানীতে এই দল কৃষকদের স্বার্থের দিকে আগ্রহ দেখায়। ফ্রান্সে এই দলের দ্বারা প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স প্রভাবিত হয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার এই দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল।

এই যুগে রাজতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। রাজতন্ত্রের সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্বে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়াছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই যুগে শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইবার ফলে রাজতন্ত্র শক্তিশালী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। সংক্ষেপে, এই যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহার বিপ্লবীরূপ হারাইয়া ফেলে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ইহা সঞ্চারিত হয়। এই শ্রমিক শ্রেণীই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি এবং শিল্পায়নের জন্যই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিটি রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষভাবে দেখা দেয়। ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শ্রমিকদের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রতিটি রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কিছু কিছু শ্রমিককল্যাণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। ফলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটিল। মার্কসীয় মতবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে নূতন পথের সন্ধান দিল।

এই যুগে আপাতদৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় অর্থনীতির বদলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কথা শুনা যায়—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ঐক্য



এবং বিশ্বশান্তির কথা এই যুগে বিভিন্ন দেশের সহিত যে সব চুক্তি হইয়াছিল সেগুলিতে উল্লিখিত ছিল। কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতাবোধ বেশিদিন টিকিল না। ইহার

পরিবর্তে প্রতিটি রাজ্য শিল্পসংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিল। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল এবং একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে থাকিল।

এই যুগটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি বজায় ছিল; বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয় নাই। ১৮৭১ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয় নাই। ইহার কারণ হইল, এই যুগটিতে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য বজায় ছিল। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রই নিজেকে সর্বশক্তিমান বলিয়া মনে করিত না এবং একে অপরের ভয়ে ভীত থাকিত। বিসমার্ক যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধনীতি নয়, ফরাসী আক্রমণ হইতে জার্মান সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। তেমনি ফ্রান্স নিজেকে জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বন্ধুর অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং যথাসময়ে রাশিয়ার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়।

বিসমার্ক ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জার্মানী (১৮৭১-১৯১৪) : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং বিসমার্ক ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের তিনিই কর্ণধার ছিলেন। এই সময় তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর ক্ষমতাকে অটুট রাখা এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে নূতন জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা।

বিসমার্কের সংস্কারমূলক কার্য :

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চ্যান্সেলার হইবার পর বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করা। গণতন্ত্রের প্রতি বিসমার্ক কোনদিনই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এবং এই সময়ে তাঁহার শাসনকে স্বৈরাচারী নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে। নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রকে এইরূপভাবে গঠিত করা হইল যাহাতে প্রাশিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে। সম্রাটকে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হইল। বুণ্ডেসরাথ ও রাইখস্টাগ নামে দুইটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন করা হইল। প্রথমটি ছিল রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি সভা ও দ্বিতীয়টি জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা। সমগ্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান হইলেন চ্যান্সেলার এবং তিনি একমাত্র সম্রাটের নিকট দায়ী রহিলেন। অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য তিনি নানা উন্নয়নমূলক কার্য করিলেন। দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করা হইল এবং একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য রেলপথকে উন্নত করা হইল এবং ডাক ও তার বিভাগকে সুসংগঠিত করা হইল। ইহার সহিত বিসমার্ক সামরিক ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করিলেন এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাকে তিনি দৃঢ়ভাবে বলবৎ করিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই প্রকারের আইন প্রবর্তন করিলেন। এইভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করিয়া এবং প্রায় স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করিয়া বিসমার্ক জার্মানীর অভ্যন্তরীণ শক্তিকে অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। ইহার সহিত তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে জার্মানদের আধিপত্য স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিলেন। জার্মানদের মন হইতে প্রাদেশিকতা দূর

করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হয়, তাহার জন্যই তিনি এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ

অভ্যন্তরীণ শাসনের দ্বিতীয় দিকের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ক্যাথলিকদের সহিত সংগ্রামের মধ্য দিয়া। এই সংগ্রাম কুলটুর ক্যাম্প বা 'সভ্যতার সংগ্রাম' নামে পরিচিত। মূলত রাজনৈতিক কারণেই বিসমার্ক ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ক্যাথলিকরা অস্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাহারা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে নূতন জার্মানীর অভ্যুত্থানকে বিশেষ সুনজরে দেখে নাই। ইহা ছাড়া ক্যাথলিকরা পোপের নির্দেশে চলিত। জার্মান ক্যাথলিকদের উপর পোপের এই ক্ষমতায় বিসমার্ক আতঙ্কিত ছিলেন এবং তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হয়ত পোপের হস্তক্ষেপ হইতে পারে। ইহা ছাড়া ইটালীতে পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সমস্যার সৃষ্টি করিতেছিল। সর্বশেষে ক্যাথলিকরা রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিত এবং তাহারা বিসমার্কের নীতির কঠোর সমালোচক ছিল। এই অবস্থায় বিসমার্ক ক্যাথলিকদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মে বিধানাবলী (May Laws) দ্বারা বিসমার্ক নির্যাতনমূলক আইন প্রবর্তন করিলেন। ইহার দ্বারা ক্যাথলিকদের শাস্তি দান করা হইল এবং যাজকদের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই সকল ব্যবস্থা বিসমার্কের সহিত পোপ এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সহিত একটি আপস মীমাংসা হইল এবং বিসমার্ক একে একে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত সকল ব্যবস্থাই প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিকদের সহিত দ্বন্দ্ব বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ শাসনের এই যুগের একটি বিশেষ দিক। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার বৈদেশিক নীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। এই সময় জার্মানীতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল। এই সমাজতান্ত্রিকরা শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিত। বিসমার্ক ইহাদের চরম শত্রু মনে করিতেন। ইহারা বিসমার্কের আদর্শ ও বিসমার্কের সৃষ্ট সামরিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিসমার্ক ইহাদের দমন করিবার জন্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কঠোর দমনমূলক আইন প্রবর্তন করিলেন। সকল রকম সভা-সমিতিতেও মতামত প্রকাশের অধিকার হইতে সমাজতান্ত্রিকদের বঞ্চিত করা হইল। কিন্তু ইহাতেও শ্রমজীবীদের উপর সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব দূর করা গেল না। দমননীতিমূলক আইন যখন সুফল আনয়ন করিতে পারিল না তখন বিসমার্ক অপর পন্থা গ্রহণ করিলেন। বিসমার্ক উপলব্ধি করিলেন যে অর্থনৈতিক অসাম্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক দুরবস্থাই সমাজতান্ত্রিকদের শক্তির মূল কারণ। সেজন্য তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (State Socialism)-এর তিনিই প্রবর্তক। আকস্মিক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা এবং বৃদ্ধ বয়সে

অবসর গ্রহণের পর পেনসনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি (১৮৭১-১৮৯০) : ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে 'বিসমার্কের যুগ' বলা হয়। এই যুগটিতে জার্মানী ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং বিসমার্ক এই সময় ইউরোপীয় রাজনীতির পরিচালক ছিলেন। তিনি জার্মানীকে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা এবং ফ্রান্সকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ফলে বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়।

ত্রিসম্রাট সংঘ ও দ্বৈত সন্ধি

বিসমার্কের চেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও জার্মানীর সম্রাটদের লইয়া 'ত্রি-সম্রাট সংঘ' গঠিত হইল। এই সংঘের উদ্দেশ্যে অনেকটা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পবিত্র সংঘের মত ছিল। কিন্তু এই ত্রি-সম্রাট সংঘ কার্যকর হইল না। নিকটপ্রাচ্য (বলকান) অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেওয়ায় এই সংঘ অকার্যকর হইয়া পড়ে। বার্লিন-কংগ্রেসে (১৮৭৮) বিসমার্ক প্রকাশ্যে অস্ট্রিয়ার দাবি সমর্থন করিলে ত্রি-সম্রাট সংঘ ভাঙিয়া যায়। ইহার পর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত করিলেন। ইহাকে দ্বৈত সন্ধি বলা হয়। এই চুক্তিটিতে কয়েকটি গোপন শর্ত ছিল। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে দ্বৈত সন্ধিটি রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই সৃষ্ট হইয়াছিল। এই দ্বৈত সন্ধিটিতে ঠিক হয় যে রাশিয়া জার্মানী বা অস্ট্রিয়া যাহাকেই আক্রমণ করুক না কেন উভয় রাষ্ট্র এক জোটে রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। অন্য কোন শক্তি যদি এ দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনটিকে আক্রমণ করে তাহা হইলে অপরটি নিরপেক্ষ থাকিবে। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত যে দ্বৈত সন্ধি স্থাপন করিলেন তাহা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অটুট ছিল।

রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বভাব

বিসমার্কের চিরাচরিত নীতি ছিল রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা ; এই কারণে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে কোন-সংঘাত ছিল না। স্বভাবতই তিনি ত্রি-সম্রাট সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সঞ্জীবিত ত্রি-সম্রাট সংঘের নাম দেওয়া হইল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের 'ত্রি-সম্রাট মিতালী'। এই সন্ধিটিও আত্মরক্ষামূলক ছিল। এই সন্ধিতে ঠিক হইল যে এক তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনও শক্তির সহিত যদি এই তিনটি রাষ্ট্রের যে কোনটির যুদ্ধ শুরু হয় তাহা হইলে অন্য দুইটি নিরপেক্ষ থাকিবে। তুরস্কের সহিত যুদ্ধ শুরু হইলে অবশ্য এই তিন শক্তি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিবে এবং বলকান অঞ্চলে এই তিন শক্তির মধ্যে কোনটিই নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী পরিবর্তন আনিবে না। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে-ত্রিসম্রাট মিতালী চুক্তির দ্বারা জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি নাকচ হইয়া যায় নাই।

ত্রিশক্তি মৈত্রী

ইহার পর বিসমার্ক ইটালীকে দলে টানিতে চাহিলেন। কিন্তু ইটালীর সহিত অস্ট্রিয়ার স্বার্থসংঘাত থাকায় ইহা সম্ভব হইতেছিল না। কিন্তু ফ্রান্স যখন ইটালীকে অগ্রাহ্য করিয়া টিউনিস দখল করিল, তখন ক্ষুব্ধ ইটালী জার্মানীর সহিত সন্ধি করিতে চাহিল। কিন্তু বিসমার্ক ইটালীকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে বলিলেন। ইটালী নিরুপায় হইয়া অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে তাহার পূর্বেকার নীতি ত্যাগ করিল এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ফলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈত সন্ধি 'ত্রি-শক্তি মৈত্রীতে' পরিণত হইল। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হইল যে ফ্রান্স যদি ইটালীকে আক্রমণ করে তাহা হইলে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া উভয়েই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালীকে সাহায্য করিবে। একাধিক শক্তি যদি এই তিনটি শক্তির যে কোনটিকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারা একজোটে আক্রমণকারীদের বাধা দিবে এবং অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকিবে। এই চুক্তির ফলে ইটালী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে রেষারেষির ভাব কিছুটা কমিয়া গেল।

বিসমার্ক জানিতেন যে কেবলমাত্র অস্ট্রিয়া ও ইটালীর বন্ধুত্ব লাভ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। পূর্ব ইউরোপে জার্মানীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাশিয়ার সহিত তিনি পুনর্মিলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেননা বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের 'ত্রি-সম্রাট মিতালী' অকার্যকর হইয়া পড়ে এবং বিসমার্ক বুঝিতে পারেন যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীমূলক চুক্তি সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত একটি নিরাপত্তাসূচক চুক্তি (Reinsurance Pact) স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তি দ্বারা ঠিক হইল যে জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ এবং রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়া আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন শক্তি জার্মানী বা রাশিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ থাকিবে।

ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক

ইংলণ্ডের সহিতও বিসমার্ক বন্ধুত্ব ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জার্মানী উপনিবেশ চাহে না বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্কের অবনতি ঘটে নাই বরঞ্চ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মনান্তর সৃষ্টি হইয়াছিল।

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এই আলোচনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বাধীন জার্মানী ছিল ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। তবে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিশূন্য ছিল না। তাঁহার কূটনৈতিক ব্যবস্থা এরূপ সূক্ষ্ম ও জটিল ছিল যে বিসমার্ক অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহা টিকাইয়া রাখা দুঃসাধ্য ছিল।

ঔপনিবেশিক নীতি ঃ বিসমার্ক জার্মানীকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' বলিয়া প্রথমে প্রচার করেন এবং এই নীতির ফলে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে

শিল্পপ্রসারের ফলে উপনিবেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দেন। ইহার ফলে আফ্রিকায় জার্মানীর কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট হন। বিসমার্কের সহিত তাঁহার বিভিন্ন ব্যাপারে তীব্র মতভেদ হইলে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামে চলিয়া যান। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কর্মবীর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ববর্তী আট বৎসর তাঁহার বাসস্থান রাজনীতিবিদ্‌দের নিকট তীর্থস্বরূপ ছিল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট হন। তিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে খবর রাখিতেন। অস্থিরতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং স্বৈরতন্ত্রে তিনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি স্বাধীনভাবে বহু কিছু করিতে চাহিলেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বিসমার্কের উপস্থিতি তাঁহার নিকট বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে হইল। বিসমার্কের পক্ষে মন যুগাইয়া কাজ করিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। সে কারণে তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন।



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ জার্মান শিল্প বাণিজ্যকে আরও প্রসারিত করিবার জন্য দ্বিতীয় উইলিয়ম এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন ও শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠনের দিকে মন দিলেন। ইহার ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে জার্মানী বিশেষভাবে উন্নতি করিল।

বৈদেশিক নীতি ঃ বিসমার্কের পতনের পর কেবলমাত্র জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতিতেই পরিবর্তন আসিল না। ইউরোপের কূটনৈতিক কাঠামো বদলাইল। নূতনভাবে শক্তি সমবায় গড়িয়া উঠিল এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপ দুইটি পরস্পরবিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইল।

বিসমার্কের পতনের পর হইতেই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। ইহার পিছনে অবশ্য নানারূপ কারণ ছিল। এই সময় জার্মানী শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করে এবং উন্নতির গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ইহা বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন ছিল উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যের। বিসমার্ক শিল্পে উন্নতিশীল জার্মানীর এই চাহিদা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। তিনি বলিতেন 'জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ'। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ ছিল না। শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাহার বাজারের প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য

কাঁচামালএর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একারণে দ্বিতীয় উইলিয়ম বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনে বহু অসুবিধা ছিল। পৃথিবীর জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জায়গা আর পড়িয়া ছিল না। স্বভাবতই জার্মানী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল যে উপনিবেশ লাভ করিতে হইলে সামরিক শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। আর এই সামরিক শক্তির প্রধান স্তম্ভ হইবে নৌবাহিনী। একারণে কাইজার জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং ঘোষণা করেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ নৌশক্তির উপর নির্ভরশীল। ইহাতে ইংলণ্ড ভীতত্রস্ত হইয়া ফ্রান্স-এর সহিত 'আন্তরিক মিত্রতা' স্থাপন করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিতও ইংলণ্ড এক বুঝাপড়া করিয়া লয়।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ

পররাষ্ট্রনীতিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম জটিল বিসমার্কীয় নীতি পরিত্যাগ করিরা এক সহজ সরল নীতি গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই তিনি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে কোনটিকে প্রকৃত মিত্র হিসাবে চাহিলেন। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য জার্মানীর পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া অস্ট্রিয়ানদের সহিত জার্মানদের জাতিগত ও ভাবগত মিল ছিল। এই সব কারণে কাইজার রাশিয়া অপেক্ষা অস্ট্রিয়াকেই পছন্দ করিলেন এবং রাশিয়ার সহিত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করিয়াছিল তাহা পুনর্বার স্বাক্ষরিত হইল না। ফলে জার্মানী ও রাশিয়ার সহিত বহুদিনের যোগসূত্র ছিন্ন হইল। রাশিয়ার সহিত চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন করিবার পর উইলিয়াম ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিবার ফলে কাইজার যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তা সম্ভব হইল না, বরঞ্চ তিনি তাঁহার প্রজাদের মনোভাব অনুযায়ী ইংলণ্ডের স্বার্থ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

নৌশক্তি বৃদ্ধি

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কাইজার জোরদার পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীকে কেবলমাত্র ইউরোপেরই সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করিতে চাহিলেন না, বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানী যাহাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে সেদিকে নজর দিলেন, জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত করিতে চাহিলেন এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ তৎপর হইলেন। জার্মানীর প্রভাব যাহাতে অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের বাহিরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিলেন এবং 'পূর্ব দিকে অগ্রসর হও' নীতি গ্রহণ করিলেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে সর্বদিক হইতে সাহায্য এবং বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ স্থাপনের কথা ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ড ইহাতে ভীত হইল এবং ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক তিক্ত হইল। কাইজারের আফ্রিকানীতি দ্বারা এই সম্পর্ক তিক্ততর হইল। সুদূর প্রাচ্যেও ইঙ্গ-জার্মান স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিল। কাইজারের জোরদার বৈদেশিক নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মরক্কো সংকটকালে ইংলণ্ড

ফ্রান্সকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। আগাদির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে উইলিয়ম বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নাই।

উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি সহজ ও সরল ছিল। তিনি যাহাকে মিত্র বলিয়া মনে করিতেন তাহার সহিত মৈত্রী চুক্তি বজায় রাখিতেন। সব রাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নাই এবং জার্মানীর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

রাশিয়া (১৮৫৫-১৯১৪): ১৮৫৫ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগটিকে রাশিয়ার ইতিহাসে প্রস্তুতিযুগ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সময়ে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লবের ফলাফল পুরাপুরিভাবে দেখা দেয় নাই এবং রাশিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাহার প্রভাব বিশেষ খাটাইতে পারে নাই। কিন্তু ঠিক এই যুগেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়, নানারূপ সংস্কার উপর হইতে প্রবর্তিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। রাশিয়ায় যে সব সামাজিক সংস্কার সাধিত হয় সেগুলি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী না হইয়া সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসন প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হইত। তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁহারা পশ্চিম ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০১-১৮২৫) যখন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আধিপত্য স্থাপনের যুগ শুরু হইয়াছে। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠনের কাজেও তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

প্রথম আলেকজাণ্ডারের পর তাঁহার ভ্রাতা নিকোলাস (১৮২৫-৫৫) রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক নীতিতে তিনি গণতন্ত্র ও বিপ্লববিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল (১৮৫৫-১৮৮১): ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার মনে করিলেন যে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণ হইল তাহার সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। একারণে তিনি সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইলেন। তবে জারের সর্বময় কর্তৃত্ব যাহাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর রাখিলেন।

বিভিন্ন সংস্কার কার্য: তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দশ বৎসর সংস্কার কার্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমেই তিনি ডেকাব্রিস্টদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন অথচ নির্বাসনে দিন যাপন করিতেছিলেন তাঁহাদের মুক্তি দিলেন। সংবাদপত্র

প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন ; বিদেশ-ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী বাধানিষেধ তুলিয়া লইলেন।

ভূমি সংস্কার ও ভূমিদাস প্রথার অবসান ঃ ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার একটি ঘোষণা জারী করিলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে জারের প্রত্যেক প্রজাই যাহাতে আইনের চোখে সমান মর্যাদা পায় এবং তাহার শ্রমলব্ধ উপার্জন শান্তিতে ভোগ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হইবে। সমগ্র রাশিয়ায় এই ঘোষণাটিকে ভূমিদাস প্রথার অবসানের সূচনা বলিয়া মনে করা হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি Edict of Emancipation বা এক মুক্তিনামার দ্বারা রাশিয়া হইতে ভূমিদাস প্রথা বিলোপের নির্দেশ দিলেন।

ভূমিদাস প্রথার অবসানের ফলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে ভূমিদাসের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, রাশিয়ায় প্রাচীনকাল হইতেই ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল। কালক্রমে এই প্রথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। রাশিয়ায় ভূমির মালিক ছিল জার এবং প্রায় দেড়লক্ষ অভিজাত পরিবার। ইহারা নিজেরা চাষ করিতে পারিত না বলিয়া সার্ফ বা ভূমিদাসদের দ্বারা চাষ করাইত। সার্ফদের সহিত জমির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। যে খামারে তাহারা চাষ করিত সে খামার সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ ছিল। এক ভাগের (প্রধান অংশের) উৎপন্ন ফসল সম্পূর্ণভাবে মালিক পাইতেন, ভূমিদাসরা চাষ করিয়া দিত, অন্যভাগে ভূমিদাসরা নিজ নিজ অংশ চাষ করিত এবং উৎপন্ন শস্য তাহারাই পাইত। তবে এই ভূমির উপর তাহাদের কোন স্বত্বস্বামিত্ব ছিল না এবং ইহার জন্য তাহাদের খাজনাও দিতে হইত। সার্ফরা ক্রীতদাস ছিল না সত্য কিন্তু তাহারা জমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিত না। একারণে তাহাদের ভূমিদাস বলা হইয়াছে। নিজের নিজের জমির সহিত তাহারা এমনভাবে জড়িত ছিল যে ওই জমি হস্তান্তরিত হইলে সার্ফরাও হস্তান্তরিত হইত।

জার আলেকজাণ্ডার সব দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রথা তুলিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া হইতে সার্ফ প্রথা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইল। এই প্রথার অবসান ঘোষণা করিয়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন এবং রাশিয়ার প্রাক্-বিপ্লব যুগের ইতিহাসে তাঁহাকে মুক্তিদাতা জার বলিয়া (Tsar Liberator) ভূষিত করা হয়।

ফলাফল

ভূমিদাসের মুক্তিনামায় চারিটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল। (ক) সার্ফদের রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রদান করা হইল। (খ) ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা অংশত জমির মালিক হইল। (গ) কিন্তু এই মালিকানা সরাসরি তাহাদের না দিয়া মির (Mir) নামক গ্রাম্য যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হইল। (ঘ) কৃষকদের জমির মালিকানা পাওয়ার বিনিময়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইল। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ কৃষকদের হইয়া 'মির' জমিদারদের দিতে বাধ্য থাকিবে বলা হইল। যেহেতু তাহাদের অর্থের অভাব ছিল, সে কারণে সরকার হইতে জমির মূল্য ধার্য করিয়া

জমিদারদের দেওয়া হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা ৬ ভাগ সুদে ৪৯ কিস্তিতে এই অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে রুশ কৃষকরা আইনত স্বাধীন হইলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাহারা পাইল না। কৃষকদের ব্যক্তিগতভাবে জমি ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইল না। মির (Mir) বা গ্রাম্য-সংস্থা জমির মালিক হইল অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা স্থাপন করা হইল। কৃষকদের পক্ষে মুক্তি-নামা শুভাশুভ ফল দিলেও অভিজাতদের নিকট ইহা আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হইল। তাহারা একদিকে রাশিয়ার কৃষিযোগ্য ভূমির অর্ধেক খাসে রাখিতে পাইল এবং অন্যদিকে সার্ফদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতে শুধু রেহাই পাইল না, নিকৃষ্ট জমির বদলে ক্ষতিপূরণ পাইল।

অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিলে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধন রাশিয়ার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিল না বা কৃষিকার্যে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল না। যেহেতু মৃত্যুর পর পুত্ররাই জমির মালিকানা স্বত্ব পাইত একারণে মিরগুলির একটি দায়িত্ব হইল নূতন বংশধরদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করিয়া দেওয়া। ফলে জমি খণ্ডিত হইতে থাকিল এবং চাষের পক্ষে অযোগ্য হইল। তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে ভূমিদাস প্রথার অবসানে রাশিয়ায় এক নূতন যুগের সূচনা হইল। দেশ হইতে এক বিরাট সামাজিক অবিচার তুলিয়া দেওয়া হইল এবং বিশ্বে রাশিয়া নৈতিক শ্রদ্ধার পাত্র হইল। ইহার কারণ হইল রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করিবার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় নাই বা রক্তপাত ঘটে নাই। কিন্তু রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপের প্রায় চারি বৎসর পর দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

অন্যান্য সংস্কার : ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধনই জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের একমাত্র সংস্কার কার্য নয়, শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগেরই তিনি সংস্কার সাধন করেন। ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে সার্ফদের উপর জমিদারদের কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটিল। এ কারণে জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়গুলিকে টিকাইয়া রাখার আর প্রয়োজন থাকিল না। ইহার বদলে নূতন বিচারালয় স্থাপনে প্রয়োজন দেখা দিল। জার আলেকজাণ্ডার বিচার বিভাগের সংস্কার প্রবর্তনের এই সুযোগ ছাড়িলেন না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক ঘোষণার দ্বারা এই সংস্কার শুরু করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ হইল। ইহার ফলে এক দিকে যেমন বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা বিধান, প্রকাশ্য বিচার ও জুরি প্রথা দ্বারা বিচারের বন্দোবস্ত হইল, অন্যদিকে দেশে আইনের শাসন চালু করিবার সার্থক প্রয়াস চলিল।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন

ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ সাধনে কৃষককুল নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। এই সুযোগে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা উগ্র বামপন্থী ছিলেন তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার করিলেন। এমন কি তাঁহারা জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চালাইলেন। এরকম অবস্থায় জার মনে করিলেন যে ভূমিদাসের মুক্তির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য প্রচলিত

প্রথাগুলির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। তিনি আশা করিলেন যে আধুনিকীকরণের ফলে দেশে অধিকাংশ লোক গোঁড়া বামপন্থী আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ফলে বিপ্লব দেখা দিবে না।

উপরিউক্ত কারণে জার ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণার দ্বারা সমগ্র রাশিয়ায় স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ স্থাপন করিলেন। এই ঘোষণার দ্বারা তিনি প্রতি জেলায় জেমস্‌ট্‌ভো বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমতি দিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের ভোট দিবার অধিকার ছিল। জেলা জেমস্‌ট্‌ভোসমূহের সদস্যরা প্রাদেশিক জেমসট্‌ভো-এ তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইত। জেমস্‌ট্‌ভোগুলির উপর স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান এইগুলিই করিত। স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, জেলখানা প্রভৃতির তদারকী করিবার ক্ষমতাও ইহাদের ছিল। প্রথম দুই বৎসর জেলা জেমস্‌ট্‌ভোগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্ধেক ছিল অভিজাত ও অর্ধেক ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাদেশিক জেমস্‌ট্‌ভোগুলিতে অভিজাতদের সংখ্যা বেশি ছিল। কৃষকরা জমিদারদের সহিত একজোটে কাজ করিতে সমর্থ হয়, কোথাও মনোমালিন্য দেখা দেয় নাই।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার শহরগুলিতে জেমস্‌ট্‌ভোর মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। অবশ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদেশপাল বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা হইল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জার সামরিক বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার বা মন্ত্রিসভা গঠন করা হইল। তবে মন্ত্রিসভার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা রহিল না। কারণ জারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অব রাশিয়া স্থাপন করা হইল দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি আইনের দ্বারা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক হন। রুশ ভাষাকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া বেশ কিছুটা উন্নতি করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর বিদেশী পুঁজির সাহায্যে রেলপথ প্রসারিত হইল। এই রেলপথ প্রসারের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এবং কার্পাস শিল্পে প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। কয়লা ও খনিজ শিল্পের বুনিয়াদ এই সময় স্থাপিত হয় এবং ইস্পাত শিল্পও ইংলণ্ডের সহায়তায় গড়িয়া উঠে। শিল্পে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কিন্তু কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে শ্রমিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিল।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ: রাশিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রসারে জার আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার কর্মচারীরা বিশেষ চিন্তিত হইলেন না। তবে পোল্যাণ্ড ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ তাঁহাদের চিন্তিত করিয়া তুলিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র পোল্যাণ্ডে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং সামান্য কারণে পোলেরা রাশিয়ার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রুশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিল। কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দিয়া এই বিদ্রোহ হইতে তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিলেন। পোল বিদ্রোহ রাশিয়ায় সর্বপ্রকার উদারনীতির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা জারের দুর্বলতা ও উদারনীতিকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করিল। এদিকে পোল বিদ্রোহের সুযোগে নিহিলিস্ট (Nihilist) নামে রাজনৈতিক বিপ্লবী দল দেশময় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা জার সরকারকে ভাবাইয়া তুলিল। এসব কারণে জার সংস্কারবিমুখ হইলেন এবং দমননীতি অনুসরণ করিতে শুরু করিলেন।

তিনি সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইলেন এবং বিচারব্যবস্থায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রত্যাহার করিলেন। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লওয়া সত্ত্বেও নিহিলিস্ট দলের কর্মীরা ধ্বংসাত্মক কাজ নির্বিঘ্নে চালাইয়া যাইতে থাকিল। বহু সরকারী কর্মচারী ইহাদের হাতে নিহত হইল। জারের প্রাণনাশেরও চেষ্টা চলিল। জার আলেকজাণ্ডার তাঁহার দমননীতির বদলে জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ প্রসারিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত করেন। এই কমিশন অনুসন্ধানের পর জারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট যে দিন জার অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন ঠিক করিলেন ঠিক সেই দিনই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হইলেন। এই শোচনীয় ঘটনার ফলে রাশিয়ার উদারনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করিবার চেষ্টা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

বৈদেশিক নীতি ঃ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জোরদার নীতির সাহায্যে রাশিয়াকে প্রাক্-ক্রিমিয়া যুদ্ধের গৌরবে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করেন এবং প্যারিসের সন্ধিপত্রের (১৮৫৬) রুশবিরোধী শর্তগুলি তিনি ভাঙিয়া দেন।

প্রথমে তিনি ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু তিনি প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হইলেন।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বলকান অঞ্চলে তুরস্কের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। তুরস্কের সুলতান বুলগেরীয়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইল। সানস্টেফানোর সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাশিয়া বাটুম, কারস, বেসারাবিয়া ও দেব্রুদজা তুরস্কের নিকট হইতে আদায় করিল এবং দানিয়ুব হইতে ইজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হইল। সানস্টেফানোর সন্ধি জার আলেকজাণ্ডারের জোরদার পররাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রাশিয়ার এই বিরাট সাফল্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া ভীত হইল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার হুমকি দেখাইল। ফলে জার আলেকজাণ্ডারের সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এক বৈঠক

আহ্বান করিতে সম্মত হইলেন। ফলে বার্লিন নগরে একটি বৈঠক বসিল (১৮৭৮)। এই বৈঠকে সানস্টেফানোর সন্ধি বাতিল করিয়া এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহাকে বার্লিনের সন্ধি বলে। এই সন্ধি দ্বারা বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব কিছু হ্রাস করা হয়।

বার্লিন সন্ধির ফলে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ বন্ধ হইলে জার আলেকজান্ডার সুদূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। চীনের সহিত এক সন্ধি স্বাক্ষরিত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তবর্তী ভ্লাডিভস্টক বন্দর এবং আমুর নদী-বিধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিকারে আনয়ন করেন। ইহা ছাড়া মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাশিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ক্রমে এসব অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

তৃতীয় আলেকজান্ডার (১৮৮১-১৮৯৪): দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করিয়া বিপ্লবীরা মনে করিয়াছিল যে রাশিয়ায় তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত হইল। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে বিশ্বাসী প্রথম পুত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে পরিবর্তন আসিল। নূতন জার স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন, ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি পুলিসী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে চাহিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

অন্যদিকে বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। জেমস্টভোগুলির ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হইল, গরীবদের নিকট শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা হইল। ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। সংক্ষেপে, তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক অভিশাপ লইয়া আসে।

তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে অবশ্য শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয়। ইহার জন্য অবশ্য জার দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিলেন অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কাউণ্ট উইটে (Witte)। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাশিয়ায় শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। নূতন নূতন রেলপথ স্থাপিত হয়। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পের কেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তৈল শিল্পে রাশিয়ার উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্প সংরক্ষণ নীতিও রাশিয়া গ্রহণ করে।

বৈদেশিক নীতি

তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বের শেষের দিকে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে রিইনসুরেন্স চুক্তি পুনরায়

স্বাক্ষরিত না হওয়ায় রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে এক মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে (১৮৯৩)। ইহাকে দ্বিশক্তি চুক্তি বলা হয়। এই দ্বিশক্তিচুক্তি ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহার দ্বারা ইউরোপ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইল। তৃতীয় আলেকজান্ডার অবশ্য জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় নিকোলাস ঃ (১৮৯৪-১৯১৭) জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের দেহান্তের পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসনকাল তৃতীয় আলেকজান্ডারের শাসনকালের অনুরূপ ছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার হইবার জন্য যেরূপ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল নিকোলাসের তাহা ছিল না। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক ডোনেস্টেভ এবং স্বেচ্ছাচারী প্লেভের দ্বারা পরিচালিত হন। ইহার ফলে নির্যাতনমূলক শাসন রাশিয়ায় অব্যাহত রহিল।

ইতিমধ্যে শিল্পায়নের তাগিদে বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করিবার ফলে রাশিয়ার জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পাইল। এমন কি রুশীয় ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গেল। ১৮৯৪ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে রাশিয়াকে প্রতি বৎসর ৪০ কোটি রুবল সুদ হিসাবে বিদেশী পুঁজিপতিদের দিতে হইত। এদিকে দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইল। কৃষকদের পক্ষে কর দেওয়া অসম্ভব হইল। শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। ইহার ফলে তাহাদের সাম্যবাদী মতবাদের আওতায় আনা অনেক সহজ হইল। বড় বড় শহরে এবং কলকারখানা অঞ্চলে শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি নামে এক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন তাঁহার 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। রাশিয়ার জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদে দীক্ষিত করাই ছিল এই পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য।

রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয় ও ফলাফল

এই পটভূমিকায় দেখা দিল রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)। এই যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হইল। রাশিয়ার জনসাধারণ এই পরাজয়ের জন্য দায়ী করিল স্বেচ্ছাচারী, অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ জারতন্ত্রকে। এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী প্লেভকে হত্যা করা হয়। কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। নিকোলাস মন্ত্রী মিরস্কীর পরামর্শে জেমস্টভোগুলিকে এক জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হইবার অনুমতি দিলেন। একবার এই অনুমতি দেওয়ার ফলে ইহা ফিরাইয়া আনা শক্ত হইল। জেমস্টভোগুলির জাতীয় সম্মেলনে মৌলিক অধিকার দাবী করা হইল। ইহার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সংবিধান সভা স্থাপন-এর দাবী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকোলাস এই দাবীগুলির মধ্যে কয়েকটি দাবী এক ঘোষণার দ্বারা স্বীকার করিয়া লইলেন সত্য কিন্তু ইহার দ্বারা তিনি তাঁহার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমাইতে চাহিলেন না এবং জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিবার কোন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন তীব্রতর হইল। ইহার

ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী রবিবার সেন্ট্ পিটার্সবাগের শ্রমিকগণ সম্রাটের নিকট তাহাদের দাবি-দাওয়া লিখিত ভাবে পেশ করিবার জন্য গেপেন নামক এক ধর্মযাজক-এর নেতৃত্বে জারের শীতকালীন রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে জারের সৈন্যদল এই নিরস্ত্র শ্রমিক মিছিলের উপর অজস্র গুলি বর্ষণ করে। এই দিনটি রাশিয়ার ইতিহাসে রক্তস্নাত রবিবার বলিয়া পরিচিত। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্থান, তেমনি রাশিয়ার ইতিহাসে রক্তস্নাত রবিবারের স্থান রহিয়াছে। রক্তস্নাত রবিবারেরই প্রতিবাদে সমগ্র দেশব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট, গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। অন্যান্য দেশের শ্রমিকগণও ধর্মঘট করিয়া সমবেদনা জানাইল। জার সরকার ভীত হইয়া সামরিক আইন জারি করিলেন। জারের কঠোর দমননীতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদল পুনরায় সক্রিয় হইল। অবশেষে জার নিকোলাস প্রজাদের এক প্রতিনিধি সভা (ডুমা) আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই ডুমায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থান পাইলেন না। কেবলমাত্র শক্তিশালী জমিদার ও বুর্জোয়াগণ ভোটাধিকার পাইল। ৫২৪ জন সদস্যদের প্রথম ডুমার অধিবেশন বসিলে জার ইহার সদস্যদের জানাইয়া দিলেন যে তাহাদের কাজ হইল পরামর্শ দেওয়া, শাসনকার্যে তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। প্রথম ডুমা যখন ভূমি সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল তখন জার ডুমা ভাঙিয়া দিলেন এবং প্রতিক্রিয়া-পন্থী স্টালিপিনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। স্টালিপিনের নীতি ছিল এক দিকে দমন করা অন্যদিকে নানা শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এদিকে ক্যাডেটপন্থীগণ প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দিবার পর ফিনল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া তথা হইতে একটি ঘোষণা জারি করিলেন। এই ঘোষণাকে ভিব্রো ঘোষণা (Vibrog Manifesto) বলা হয়। এই ঘোষণায় কৃষকদের খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দিবার পর এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। নির্বাচনের পূর্বে উদারনৈতিক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া রক্ষণশীল দলগুলিকে নির্বাচনে জয়ী হইতে সাহায্য করার চেষ্টা করা হইলেও দ্বিতীয় ডুমায় বামপন্থী সদস্য সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে জারতন্ত্র ভীত হইয়া সোস্যাল ডেমোক্রাট লেবার দলকে রাষ্ট্র-বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিল এবং দ্বিতীয় ডুমাও ভাঙিয়া দিল। সোস্যাল ডেমোক্রাট লেবার দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালানো হইল।

স্টালিপিন সংস্কার ঃ ইতিমধ্যে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক সংকট দেখা দিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটিল। জন-সাধারণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে সামরিক আইন, পুলিসী অত্যাচার সমানে চালানো হইল। আন্তর্জাতিক অবস্থাও এই সময় বেশ জটিল হইয়া উঠিল। জার বাধ্য হইয়া তৃতীয় ডুমা আহ্বান করিলেন। এই ডুমাতে জমিদার শ্রেণী হইতে বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল। জমিদার শ্রেণীর মধ্যমণি ছিলেন স্টালিপিন নিজে। তিনি ভূমি সংস্কারের নীতি গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই তিনি গ্রাম্য 'মির' ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেন, বৃহৎ খামার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন এবং ভূমিহীন কৃষকদের ভূমির মালিক হইতে সাহায্য করিলেন। স্টালিপিনের এই সংস্কার রাজনৈতিকদলগুলির মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। ক্যাডেটরা এই

সংস্কার মনেপ্রাণে গ্রহণ করিল এবং বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিল। সমাজবিপ্লবী দল দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল। যাহারা বিপ্লব শেষ হইয়াছে মনে করিল তাহাদের নাম হইল মেনশেভিক (সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সদস্য) আর যাহারা মনে করিল বিপ্লব মাত্র শুরু হইল তাহাদের বলা হইতে লাগিল বোলশেভিক। (সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ইতিমধ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত একযোগে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধই দ্বিতীয় নিকোলাসের পক্ষে মারাত্মক হইল।

অশিক্ষিত রুশ সৈন্য জার্মান সৈন্যদের হস্তে নিহত ও বন্দী হইতে লাগিল। সৈন্যদলে দেখা দিল ঘোর অসন্তোষ। দেশে চরম খাদ্যাভাব ঘটিল। শহরের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল। আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলি চালাইতে আদেশ করিলে তাহারা সে আদেশ অমান্য করিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে ঘটিল এক গণ-অভ্যুত্থান। বিপ্লবীরা জয়ী হইল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল।

বৈদেশিক নীতি

পররাষ্ট্রনীতিতে দ্বিতীয় নিকোলাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য রাশিয়ার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল এবং সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। যাহার ফলে ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ইংলণ্ডের সহিত এক মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে রাশিয়া এমনভাবে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে যাহার জন্য তাহাকে সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়।

দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ইউরোপ : জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলিতেন যে জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহকঠিন নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র পন্থা। তিনি তাঁহার কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান এবং খুঁটিনাটি ভাবে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিলে আধুনিক কালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল অনেক রাষ্ট্রই। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্র জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত হইল। কোন রাষ্ট্র পর-রাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করিল। এই সকল রাষ্ট্র একে অপরকে সন্দেহ করিল এবং ইহার ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল। এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পশ্চাতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও স্বার্থ-সংঘাত কাজ করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দুইটি পরস্পরবিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল।

ত্রিশক্তি মৈত্রী

বিসমার্ক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত দ্বৈত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার দলে যোগ দেওয়ার ফলে দ্বৈত সন্ধি ত্রিশক্তি মৈত্রীতে পরিণত হয়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্স ভীত

হইল। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পাইল না। বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে জটিলতা দেখা দিল। জার্মানীর সম্রাট বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিলেন। জার্মানীর সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। ইহার ফলে বিসমার্কীয় নীতি বিদায় গ্রহণ করিল। ত্রিশক্তি মৈত্রীর বিরুদ্ধে এক নূতন রাষ্ট্রজোট দেখা দিল। ইহাকে ট্রিপল্ আঁতাত বা ত্রিশক্তি মিতালি (Triple Entente) বলা হয়। এই ট্রিপল্ আঁতাত-এর কার্য হইল জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা দেওয়া এবং ত্রিশক্তি মৈত্রীর (Triple Alliance) অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা।

ত্রিশক্তি মিতালি

বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় কূটনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ফ্রান্স-রুশ মৈত্রী চুক্তি (Franco-Russian Alliance)। এই মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করিবার জন্য ফ্রান্স সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন তাহা সম্ভব হয় নাই। বিসমার্কের পতনের তিন বৎসর পর ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিশক্তি মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রুশ সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়িয়া উঠিতে থাকে। ফরাসী পুঁজিপতিরা বিসমার্কীয় যুগেই রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ এবং রাশিয়াকে সমরোপকরণ সরবরাহ করিতে থাকে। একদিকে ফ্রান্স যেমন জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবার জন্য মিত্র খুঁজিতেছিল, তেমনি রাশিয়াও তাহার রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী পুঁজির জন্য ব্যগ্র হইল। এই পটভূমিকায় ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই মৈত্রী চুক্তিটির শর্তগুলি প্রথমে গোপন রাখা হয় এবং কেবলমাত্র ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। চুক্তিটির শর্তগুলির মধ্যে প্রধানতম শর্ত ছিল যদি জার্মানী বা জার্মানী ও ইটালী একত্রিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহা হইলে রাশিয়া তাহার সর্বশক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে; তেমনি জার্মানী বা জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একত্রিত হইয়া যদি রাশিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে ফ্রান্স তাহার সমস্ত শক্তি দ্বারা রাশিয়াকে সাহায্য করিবে।

ফরাসী-রুশ চুক্তিটি ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ইহার দ্বারা সর্বপ্রথম বিসমার্কীয় ব্যবস্থায় ফাটল সৃষ্টি করা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিসমার্ক যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন (ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখা) তাহার অবসান ঘটিল। এই চুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে ভবিষ্যতে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে আর একাকী লড়িতে হইবে না। রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয়েই ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল বলিয়া ইংলণ্ড এই দুইটি রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখিত। 'রুশ-ভীতি' ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে বহুদিন হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণকে ইংলণ্ড কোন দিনই ভাল চোখে দেখে নাই বরঞ্চ রাশিয়া যাহাতে এই অঞ্চলে আর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য ইংলণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী

চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাশিয়ার প্রভাব উক্ত অঞ্চল হইতে নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড হঠাৎ ফরাসীবিরোধী নীতি গ্রহণ করে। এই সময় ফ্রান্স আফ্রিকায় নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে নজর দেয় এবং ইংলণ্ডের সুদানের উপর নিজের দাবী উত্থাপিত করে। নীলনদের অববাহিকা লইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয় এবং ফ্যাসোডা ঘটনায় (১৮৯৮) এই বিরোধের চরম রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর সঙ্গেও ইংলণ্ড কোনরূপ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত করিবার প্রয়োজন মনে করিল না। জার্মানী বহুবার মৈত্রী চুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সকল প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দেয়।

ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক মৈত্রী

বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতেই অবশ্য ইংলণ্ড তাহার এই বিচ্ছিন্নতা ভাঙিয়া ফেলিতে তৎপর হইল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের হৃদ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে থাকে। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সাহায্য যে অপরিহার্য তাহা বুঝিতে পারিল এবং একে অন্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক নীতিকে সমর্থন করিল। এদিকে জার্মানীর নৌশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতিও ইংলন্ডকে ভাবিত করিল। জার্মানীই ইংলণ্ডের আসল শত্রু বলিয়া মনে করা হইল। ফলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ইংগ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি বা 'আন্তরিক মৈত্রী' (Entente Cordial) স্বাক্ষরিত হইল। ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক মৈত্রী চুক্তিই ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়ার পথ সুগম করিয়া দেয়। ১৯০৪ ৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের নিকট পরাজিত হইলে সুদূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহার দুর্বলতা ধরা পড়ে। ইংলণ্ড বুঝিতে পারিল যে রাশিয়াকে ভয় করিবার মতন কিছু নাই। বরঞ্চ তাহার সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে জার্মানীকে জব্দ করা যাইবে। ফলে যে সকল অঞ্চলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ চলিতেছিল সেগুলির অবসান ঘটাইবার চেষ্টা চলিল এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়া (Agreement) স্বাক্ষরিত হইল। তিব্বত, আফগানিস্তান, পারশ্য প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে এই বুঝাপড়ার আওতায় আনা হইল। ঠিক হইল যে কোন পক্ষই এই অঞ্চলগুলিতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইবে না। ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে ট্রিপল আঁতাত সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার ৭ বৎসর পূর্বেই ইউরোপে দুইটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব হয়—ট্রিপল এলায়েন্স ও ট্রিপল আঁতাত। ইহার ফলে ইউরোপ পরস্পরবিরোধী দুইটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইল। তবে ইহা সত্য যে এই রাষ্ট্রজোট দুইটি কোনটিই পররাজ্য আক্রমণের জন্য গঠিত হয় নাই। বরঞ্চ আত্মরক্ষার জন্যই ইহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব, কল্পনাবিলাসী সমাজতান্ত্রিকগণ, কার্ল মার্কস ও সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসের মতবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, চীনদেশে সংস্কার ও বিপ্লব, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ।

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়। শিল্প-বিপ্লব সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় এবং সমাজ-ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসে। ইহার ফলে ইউরোপের জনসমাজ মোটামুটিভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে—একটি মালিক বা ধনিক শ্রেণী, অপরটি শ্রমিক শ্রেণী। ব্যবসাবাণিজ্য ও কলকারখানার মালিক হইয়া শিল্পোন্নত প্রতিটি দেশেই ধনিক শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লইয়া দেশের সম্পদ কুক্ষিগত করিল। সাধারণ লোক বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে কৃষিকার্য অথবা কুটির শিল্পে জীবিকা-নির্বাহের উপায় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, দলে দলে কারখানায় চাকুরির আশায় ভিড় জমায়। ধনিক শ্রেণী সুযোগ বুঝিয়া অতি সামান্য মজুরীতে তাহাদের কারখানায় শ্রমিকের কার্যে নিয়োগ করে। যাহাদের শ্রমের বিনিময়ে প্রভূত সম্পদ উৎপাদন সম্ভব হইল, সেই শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু শ্রমের উপযুক্ত মূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার ফলে দেশের মুষ্টিমেয় লোক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া দিন দিন আরও ধনী ও সম্পদশালী হইতে থাকিল, আর কলকারখানার অগণিত শ্রমিক ক্রমেই আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িল। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিস্তারের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তির হস্তে একচেটিয়া আর্থিক কর্তৃত্বের সমাবেশ। ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদি শক্তিশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ইহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। ইহারা লেনদেনের জন্য ব্যাংক ও অনুরূপ সংস্থা স্থাপন করিয়া ক্রমে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহাদের কবলিত হয়। দ্বিতীয়ত শিল্পোন্নত দেশগুলির অতিরিক্ত মূলধনের পুঁজি অনগ্রসর দেশগুলিতে লগ্নীকৃত হইয়া অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাহাদের শোষণ শুরু হইয়া যায়। তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের এক নূতন পন্থা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য

ধনতন্ত্রী বা পুঁজিপতি সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ক্রমবর্ধমান অসাম্য দূর করিবার উদ্যোগে ইউরোপে এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হয় যাহাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হইল সমাজে সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করা। সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচার করিতে থাকেন যে, দেশের সকল জনমানবের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অবাধ স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে সামাজিক স্বার্থ ও মঙ্গলের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখা কর্তব্য। ইহার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল প্রতিটি দেশে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া জাতীয় সম্পদ এমনভাবে

সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমাজে ধনী নির্ধনের বৈষম্য দূর হয় এবং সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগতভাবে মূলধন এবং সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে না।

কল্পনাবিলাসী সমাজতান্ত্রিকগণ : সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ আছে এবং ইহা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইউরোপে বিকশিত হইয়া উঠে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের ইতিহাসে ইংলন্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের সেন্ট্ সাইমন (Saint Simon), চার্লস ফোরে (Charles Fourier), লুই ব্লাঁ (Lous Blane) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই সমাজস্থ মানুষের মধ্যে আর্থিক সাম্য আনিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন ও সকলেই ধনী-নির্ধনের প্রভেদ তুলিয়া দিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও দারিদ্র্যের অবসানের কথা বলেন। কিন্তু কিভাবে ইহা সম্ভব হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট এবং কিছুটা শিশুসুলভ। তাঁহারা মনে করিতেন যুক্তি দিয়া ধনিকদের বুঝাইতে হইবে যে, সাম্যভাবাপন্ন সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের আশা ছিল ধনিক শ্রেণীর মন বদলাইতে পারিলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, যে সমাজব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী সন্তুষ্ট, সেই ব্যবস্থা বদলাইতে তাহারা কোনক্রমেই চাহিবে না। কার্ল মার্কস্ এই সমাজতান্ত্রিকদের নাম দিয়াছেন অবাস্তব কল্পনাবিলাসী। কল্পনাবিলাসী সমাজতান্ত্রিকগণ শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই। কার্ল মার্কস্ সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়া সমাজতন্ত্রবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জন্য তাঁহার মতবাদকে বলা হয় Scientific Socialism। মার্কস্ একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলন, এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন ফ্রেড্রিক এঙ্গেল্স্ (Frederick Engels)।

কার্ল মার্কস্ ও সমাজতন্ত্রবাদ : কার্ল মার্কস্ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার এক জার্মান-ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বন্ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রেনিস গেজেট' (Rhenish Gazette) নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, প্রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। ফলে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হয়। তিনি প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার ভবিষ্যতের অকৃত্রিম বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেল্সের সহিত পরিচিত হন। এবং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সমতা উভয়কে আজীবন বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁহাকে ফ্রান্সে থাকিতে



কার্ল মার্কস্

দিলেন না। তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে চলিয়া যান। এখানে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তিনি যে সকল মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহার নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখান হইতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সাম্যবাদের ইস্তাহার (Communist Manifesto) নামক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাখানিতে তিনি সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব নীতি ও মতামত ব্যাখ্যা করেন। ইস্তাহারের শেষে তিনি বিশ্বের শ্রমিকদের উদাত্তকন্ঠে এই বলিয়া আহ্বান জানান,—'জগতের শ্রমিকগণ ঐক্যবদ্ধ হও ; তোমাদের হারাইবার কিছুই নাই, একমাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল ছাড়া ; কিন্তু জয় করিয়া লইবার আছে সমগ্র জগৎ।' ইহার পর তিনি দেশে ফিরিয়া যান কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিলে তিনি লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হয়। লণ্ডনে তিনি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ডাস্ ক্যাপিটাল (Das Capital) জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। এই সুবিখ্যাত গ্রন্থেই তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে সাম্যবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের দেহান্ত ঘটে। মার্কস্ সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মার্কসীয় দর্শন ও কার্যক্রম উদ্ভাবনের জন্য মার্কসের পরেই এঙ্গেলসের স্থান।

মার্কসের মতবাদ : খাদ্য, আচ্ছাদন, বাসস্থান, হাতিয়ার বা যন্ত্র—এইগুলির উৎপাদন ভিন্ন কোনও সমাজ টিকিতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃতি সব সময় একই রকম থাকে না। ইহা অহরহই বদলাইতেছে। উৎপাদনের প্রকৃতি নির্ভর করে উৎপাদনের শক্তি আর উৎপাদনের সম্বন্ধ এই দুইটির উপর। উৎপাদনের যন্ত্র, তাহার ব্যবহার-কৌশল, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও সরঞ্জাম, শ্রমিক বা মজুরদের শ্রম, এইগুলির সাধারণ নাম হইল উৎপাদনের শক্তি। উৎপাদনের অপরদিক হইতেছে এই কার্যে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক, আর্থিক সংগঠনের ধরন ইত্যাদি। এইগুলির সাধারণ নাম উৎপাদনের সম্বন্ধ। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক 'কে' ইহার উপর উৎপাদনের সম্বন্ধ নির্ভর করে। উৎপাদনশক্তির যথাযথ ব্যবহার হইলে সমাজে অভাব থাকে না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন ধনিকদের হস্তগত বলিয়া সমাজে অভাব থাকিয়া যায়। কারণ মালিকশ্রেণীর নজর থাকে মুনাফার দিকে, অভাব মোচনের দিকে নয়। মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধন করিয়া উৎপাদনের সমস্ত উপাদান সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর হইবে। আর ইহা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। মার্কস্ দেখাইলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিক শ্রেণীর সহিত মজুর শ্রেণীর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ; এবং সমাজে ধনী-নির্ধনের প্রভেদ দূরীভূত হইবে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের ফলে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। এই ব্যাখ্যার মূলসূত্র হইল এইরূপ,—সমাজে মানুষের জীবনধারা অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া। মানবসমাজের রাজনীতি, ধর্মনীতি, মানুষের সকল কামনা-বাসনা—সব কিছুই এই অর্থনীতিক প্রেরণা হইতে উদ্ভব হইয়াছে। মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাস প্রথম হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষের মধ্য দিয়া শুরু এবং এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ইহার শেষ হইবে। বর্তমানে ধনিক শ্রেণীর সহিত শ্রমিক শ্রেণীর যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে—শ্রমিকদের জয়ে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে

এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য মার্কস্ বিশ্বের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। মার্কসের এই ব্যাখ্যা (Dialectical Materialism) 'বিভেদ ও সমন্বয় নির্ভর জড়বাদ' বলিয়া খ্যাত।

আন্তর্জাতিকতা

মার্কস্ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদকে কোন ভৌগোলিক ও জাতিগত সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার মতবাদের আবেদন ছিল আন্তর্জাতিক। তিনি বলিয়াছেন—শ্রমিকদের কোন দেশ নাই, সর্বদেশেই তাহারা নির্যাতিত ও শোষিত। সুতরাং দেশ ও জাতিনির্বিশেষে তাহাদের একত্রিত হইয়া ধনতন্ত্রী সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ইহার নীতি, নিয়ম-কানুন ও কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া দেন। ইহা International Working Men's Association বা The International নামে প্রসিদ্ধ। লণ্ডনে ইহার প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হয় যে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন কেবলমাত্র আর্থিক সুযোগ-সুবিধার দিকেই নজর না রাখে, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে তাহারা যেন দূরে সরিয়া না দাঁড়ায়। মার্কসের এই নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কাজ করিতে অসমর্থ হয়। ফলে মার্কস্‌বাদের পথ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া সুবিধাবাদের উদ্ভব ঘটে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস্‌পন্থীদের উদ্যোগে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল গঠিত হয়। মতবিরোধের জন্য ইহার সভাগণ কখনও একজোটে কাজ করিতে পারেন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় সাম্যবাদীদের চেষ্টায় তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল স্থাপিত হইবার পর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এক নূতন পথের সন্ধান পায়।

সমালোচনা

মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে এবং অনেকে তাঁহার মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মার্কস্ কেবলমাত্র জড়বাদকেই অমোঘ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যান ধারণা ছিল পার্থিব বস্তু ও সমসাময়িক সমস্যার প্রতি নিবদ্ধ। তিনি অনন্ত বিশ্বজগতের সীমাহীন বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুষ যে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে না (Man does not live by bread alone) এই চিরন্তন সত্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তাঁহার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বহু প্রখ্যাত অর্থবিদ্‌দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কিন্তু মার্কসের মতবাদে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন ইহা সত্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য মানবোচিত ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসীগণই রুশ বিপ্লবের ন্যায় এক যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত করিয়া ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ ঃ মার্কসীয় মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদ নব নব ধারায় প্রবাহিত হয়। ইহার প্রথমটিকে বলা যায় বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদ (Evolutionary Socialism), Collectivism, State Socialism, Fabian Socialism, Christian Socialism প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। অপর শ্রেণীভুক্ত হইল Syndicalism, Guild Socialism এবং Communism। এগুলিকে বলা যায় বিপ্লবধর্মী সমাজতন্ত্রবাদ (Revolutionary Socialism)। Collectivism-এর সমর্থকগণ উৎপাদন ও তাহার বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি করেন। ইহাদের মত হইল সমাজে কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকিবে না। ইঁহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিসাধনের পক্ষপাতী। State Socialism, Collectivism-এরই জার্মান রূপান্তর। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এইজন্য তাঁহারাও উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। Fabian Socialism-এর উদ্ভব ঘটে ইংলণ্ডে। জর্জ বার্ণার্ড শ ও অপর কয়েকজন ইংরাজ চিন্তাবিদ্ এই মতবাদের প্রবর্তক। ইঁহারা সংসদ পরিচালিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ইঁহাদের অভিমত হইল নানাবিধ রচনার মাধ্যমে জনমতকে সুশিক্ষিত করিয়া উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অধিকতর কাম্য। ইহাদের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডে শ্রমিকদলের উদ্ভব ও শাসন ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভবপর হইয়াছে। Christian Socialism-এর সমর্থকদের মূল বক্তব্য হইল শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক দুর্দশার মূল কারণ হইল প্রতিযোগিতা। ইঁহারা প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলনের সমর্থক।

নৈরাজ্যবাদ

মার্কস্-এর একজন বিখ্যাত সমসাময়িক ছিলেন রুশ-জাতীয় মিখায়েল বকুনিন (Mikhail Bakunin)। তিনি ছিলেন anarchism বা Nihilism অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদের প্রধান প্রবক্তা। এই মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রমাত্রকেই অত্যাচারের অন্যায় যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কারণে ইঁহারা রাষ্ট্রসমেত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিলোপসাধনের পক্ষপাতী। সর্বশ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার জন্য এই মতবাদের উদ্ভব হয়। বিপ্লবধর্মী সমাজবাদে এই মতবাদের কতকটা প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন Syndicalism-এর প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের শাসন ও নিয়ন্ত্রণে আদৌ বিশ্বাসী নহেন। তাঁহারা মনে করেন ধনোৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানাস্বত্বের প্রকৃত অধিকারী হইল শ্রমিকগণ। তাঁহারা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং তাহাদের দ্বারা বারংবার সর্বাত্মক ধর্মঘট চালাইয়া রাষ্ট্র সংগঠনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শ্রমিক সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই মতবাদ ফ্রান্সে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রুশ-বিপ্লবের পর এই মতবাদ সাম্যবাদ (Communism)-এর সহিত মিশিয়া যায়।

Guild Socialism-এর সহিত Syndicalism-এর কোন কোন বিষয়ে মিল দেখা যায়। ইহার সমর্থকগণ রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্র অথবা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে চাহেন না। Collectivism-এর সমর্থকদের ন্যায় তাঁহারাও শিল্প ও উৎপাদনব্যবস্থা জাতীয়করণের পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারা বলেন এই জাতীয় সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণভার থাকিবে পরিচালক, শ্রমিক ও কারিগরদের লইয়া গঠিত সমিতিগুলির উপর। আসলে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব হ্রাস করিবার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমিক সমিতিগুলির উপর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সমগ্রভাবে ন্যস্ত করাই ইহাদের আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কম্যুনিজম

Communism বা সাম্যবাদের সমর্থকগণ মার্কস্ ও লেনিনের চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ আস্থাবান। বলপূর্বক ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও দীনদরিদ্র বিত্তহীনদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করাই ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এইরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। তখন কেহই ধনী ও দরিদ্র থাকিবে না; উৎপাদন বা উপভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাইবে; প্রত্যেকে তাহাদের সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিবে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাইবে। রাষ্ট্রই সর্বতোভাবে সমাজজীবন পরিচালনা করিবে। অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে উৎপাদন, বণ্টন ও উপভোগ ব্যবস্থা এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, সমাজে কোন ব্যবসায়ী চক্র, শ্রমিক-মালিক বিরোধ অথবা বেকার সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিবে না। এইরূপ সমাজব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে যখন পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন রাষ্ট্র আপনা হইতেই লোপ পাইবে। সাম্যবাদী চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ কিছুটা ঘটিয়াছে সর্বপ্রথম রাশিয়ায়। আজ বিশ্বের আরও ষোলটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ: ধনতন্ত্রের সর্বশেষ রূপ হইল সাম্রাজ্যবাদ। ইহার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে একচেটিয়া আর্থিক কর্তৃত্বের সমাবেশ। ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদি শক্তিশালী ধনিকের প্রতিষ্ঠান। পূর্বেকার ছোট ছোট ধনিকদের কারবারগুলি ইহারা গ্রাস করিল। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কের মালিকদের হাতে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আসিবার ফলে কল-কারখানার মালিকদের পুঁজির মধ্যে পার্থক্য থাকিল না। তৃতীয়ত, অগ্রসর দেশগুলির অতিরিক্ত মূলধনের পুঁজি বিদেশে গিয়া কর্তৃত্ব শুরু করিল এবং অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হইল। ইহাতে প্রচুর মুনাফা হইতে থাকিল। চতুর্থত, বড় বড় ধনিকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবী নিজেদের পৃথক্-পৃথক্ এলাকায় ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। পঞ্চমত, বৃহৎশক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে সমগ্র জগৎ ভাগ করিয়া লইল। ফলে আর্থিক কর্তৃত্ব আরও বিস্তার করিবার আর নূতন স্থান রহিল না। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পরের রেষারেষি বৃদ্ধি পাইল। ফলে বিশ্বযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল।

সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণ: ইউরোপের বাহিরে ইউরোপের বিস্তৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক

আবিষ্কারসমূহের পরেই ইউরোপের প্রসারের প্রথম পর্ব শুরু হয়। ফলে, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুইটি মহাদেশে ইউরোপীয়গণ দলে দলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। এশিয়া মহাদেশে কিন্তু ইউরোপীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এশিয়ার সকল অঞ্চলই ঘন বসতিপূর্ণ, সে কারণে এশিয়ায় ইউরোপীয়গণ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিই গ্রহণ করিয়াছিল। আফ্রিকায় অবশ্য এ নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যেন সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার একাধিক কারণ অবশ্য ছিল।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানাগুলির জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। সাম্রাজ্য থাকিলে কাঁচামাল অল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বিক্রয় করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্য থাকিলে এগুলি বিক্রয়ের খুব সুবিধা এবং প্রচুর লাভে বিক্রয় করা যায়। সেজন্য এই উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বাপেক্ষা বেশী লাভজনক হইয়া উঠিল। এ কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার উর্বর ও দুর্বল দেশগুলির প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি পড়িল এবং এই দেশগুলিকে নিজ নিজ আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হইল।

ইংলন্ডের পর ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে ক্রমশঃ শিল্প-বিপ্লব সাধিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ইংলন্ড অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিলে এই প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইল। ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে প্রথম হইতেই বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর বিধিনিষেধ জারি করিয়াছিল। সুতরাং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্র হইল। যাহারা বঞ্চিত তাহাদের মধ্যেই নহে, যাহারা লব্ধকাম তাহারাও ক্ষমতা ও অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় সজাগ রহিল।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এই সময় সাম্রাজ্য স্থাপনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিল। সাম্রাজ্য ও বিদেশে সামরিক ঘাঁটি রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলিয়া তাহারা মনে করিল। এই মনোবৃত্তির ফলে সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল।

শিল্প বিপ্লবের ফলে এই সময় ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই বেকার সমস্যা দেখা দেয়। সাম্রাজ্য স্থাপন তখনকার দিনে বেকার সমস্যার অন্যতম সমাধান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সময় পবিত্র খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করে। ইউরোপীয়গণ মনে করিত যে এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা অত্যন্ত অসভ্য ও অনুন্নত। তাহাদের ধর্মমত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অতএব শ্বেতাঙ্গ লোকদের অধীনে আনিয়া এবং তাহাদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাইলে কালো চামড়ার লোকেরা সভ্য হইয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইবে। এইভাবে প্রগতির নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা হয়। সে কারণে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলেও সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধা হয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী যেন ছোট হইয়া গেল। দেশে-বিদেশে যাতায়াত অবাধ এবং সংবাদ আদান-প্রদান সহজ হইল। কোন

দেশই আর বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়গণের পক্ষে পৃথিবীতে অগম্য স্থান বলিয়া কিছু রহিল না।

ইউরোপীয়গণের জগৎব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে তাহাদের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ লইয়া কাড়াকাড়ি ও সংঘর্ষ দেখা দিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র জার্মানী ও ইটালীর ঈর্ষার পাত্র হইল। যে সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহারা তাহাদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলির প্রজাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। ফলে শোষিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণ অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকা যে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

চীনদেশে সংস্কার ও বিপ্লব ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্পোন্নত বৃহৎ শক্তিগুলি কিরূপ নির্লজ্জভাবে অন্য দেশগুলি অধিকার করিয়াছিল তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেলে চীনের ইতিহাস হইতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত চীন ক্রমেই অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে। কিন্তু ইউরোপীয় বণিকের লোভাতুর দৃষ্টি হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। চীনে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ নাবিকরা চীনের উপকূলবর্তী মাকাও এবং ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরা ক্যাণ্টন নামক স্থানে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করে। চীনের সম্রাট কিন্তু এই বিদেশীদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। বিদেশী বণিকদের তিনি দমাইয়া রাখিতে পারিলেন না। বিদেশী বণিকরা নিজেদের খেয়ালখুসী অনুযায়ী ব্যবসা চালাইয়া যাইতে থাকে। উনিশ শতকের শুরুতেই চীন সম্রাট নিজ দেশে আফিং বিক্রি বন্ধ করিবার আদেশ দেন। কিন্তু এই আদেশ সফল হয় নাই। অধিকাংশ চীনাই আফিংখোর ছিল বলিয়া ইহা বন্ধ করা সম্ভবই ছিল না। আফিং ব্যবসায়ে ইংরাজরাই অগ্রগামী ছিল। তাহারা ভারত হইতে প্রচুর আফিং আনিয়া চীনে বিক্রি করিত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার যখন বেআইনী আফিং ব্যবসা বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন তখন এই সৎপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইংরাজ-শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহাকে প্রথম চীনযুদ্ধ বা আফিং যুদ্ধ বলা হয়। দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং শেষে চীন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং-এর সন্ধির ফলে হংকং দ্বীপে ইংরাজ শাসন স্থাপিত হইল এবং দক্ষিণ চীনের আরও পাঁচটি বন্দর ক্যাণ্টন, ফুচৌ, নিংগপো, আময় ও সাংহাই বিদেশী বণিকদের জন্য উন্মুক্ত রহিল।

আফিং যুদ্ধে পরাজিত চীন সরকারের দুর্বলতা দেখিয়া বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সেখানে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইল। ইংলণ্ড ছাড়া নরওয়ে, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশের বণিকরা চীনে বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ পাইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের হাতে একজন ফরাসী ধর্মযাজক নিহত হন। তখন ফরাসীরা যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরাজরাও তাহাদের সঙ্গে হাত মেলায়। ইহাকে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ বা আফিং যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধেও চীন পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইহা

তিয়েন্‌সিনের সন্ধি নামে খ্যাত। প্রথম যুদ্ধের ফলে মাত্র পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল। এবার আরও এগারটি বন্দর তাহাদের হাতে আসিল। অভ্যন্তরীণ নাব্যপথ বিদেশীদের নিকট খুলিয়া দেওয়া হইল। শুল্ক ব্যবস্থার উপর



চীন সরকারের অধিকার রহিল না। বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক চীনের আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলিয়া চীনকে স্বীকার করিতে হইল। পিকিং-এ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির দূতাবাস স্থাপিত হইল।

তাইপিং বিদ্রোহ ঃ

দুর্বল মাঞ্চু সরকার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেও চীনের কৃষকগণ বিদেশী আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হইল। তাহারা বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন হাং সিং চিয়াং। অল্প কালের জন্য তিনি নানকিং দখল করিয়া সেখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক ইহাতে যোগ দেয়। এই বিদ্রোহকে তাইপিং বিদ্রোহ বলা

হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় বার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল (১৮৫৩-৬৫)। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহার ফলেই এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহা ভবিষ্যতের দেশ-প্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের নিকট তাইপিং বিদ্রোহ এই শিক্ষাই দিয়াছিল যে চীনদেশে পরিবর্তন আনিতে হইলে একই সঙ্গে মাঞ্চু সরকার ও বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

চীনের দুর্গতি ঃ

পর পর দুইটি যুদ্ধে পরাজয় চীন সরকারকে খুবই দুর্বল করিয়া দিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হইল। এই শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে রাশিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হইতে ক্রমে জাপান সাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ভ্লাডিভস্টক বন্দর স্থাপন করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন নবজাগ্রত জাপানের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে চীন তাইওয়ান ও পেসকাডোর দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে সমর্পণ করে। ইহা ছাড়া জাপান ইউরোপীয়দের ন্যায় নানাবিধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। চীন সরকারের জাপান বিরোধী মনোভাব রাশিয়া নিজের স্বার্থে কাজে লাগায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর চীনের উপর রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব দেখা গেল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে চীনে কনসেশনের বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লড়াই শুরু হইল। রাশিয়া তাড়াতাড়ি পোর্ট আর্থার দখল করে এবং এই বন্দর ও বন্দরের সংলগ্ন অঞ্চল ডাইরেন সহ সমগ্র অঞ্চলটি লিজ হিসাবে চাহে। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব চীন মানিয়া লইল। ফ্রান্স য়ুনান ও কোয়ানটুঙ প্রদেশে বিশেষ সুবিধা আদায় করিল। জার্মানী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াউ-চাউ ও সানটুং-এ নিজের আধিপত্য স্থাপন করিল। ইংলণ্ড কোলুং এবং ওয়েইহাই-ওয়েকে লিজ হিসাবে গ্রহণ করিল এবং ইয়াংসিকিয়াং অঞ্চলে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিবার অধিকার আদায় করিল। চীন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের অধিকার বিস্তার ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে। অবশেষে বিদেশীদের প্রতি তাহাদের অসীম ঘৃণা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহাকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিদ্রোহ Boxer Rebellion নামে ইতিহাসে পরিচিত। বহু বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ-শিশু এবং কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান যাজক বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি একত্রিত হইয়া এই বিদ্রোহ দমন করে। বক্সার বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চীনকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থে ইহার বিরোধিতা করে। তাঁহার ঘোষিত নীতি হইল "Open Door Policy", অর্থাৎ চীনের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। ইউরোপের দেশসমূহ এই নীতি স্বীকার করিয়া লইল। ফলে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা পাইল সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিণামে চীন উনিশ শতকে একটি অর্ধ-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে অধোগত হইয়াছিল।

সংস্কার ও বিপ্লব ঃ এশিয়াবাসীদের মনে সর্বত্র ক্রমে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইউরোপীয় বৃহৎ জাতিগুলি অসীম শক্তিধর। তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা অসম্ভব।

কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত যুদ্ধে রাশিয়ার দারুণ পরাজয় ঘটে। বিশ্বের ইতিহাসে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ইহার ফলে এশিয়াবাসীর মোহভঙ্গ হইল। এই সময় হইতে পাশ্চাত্য জাতিগুলির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। রক্ষণশীল চীন এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান, সমরপদ্ধতি ইত্যাদি বর্জন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাপানীদের অগ্রগতি দেখিয়া চীন সরকার ইহাদের উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, অতঃপর সরকারী চাকরী লাভ করিতে হইলে প্রার্থীদের ইয়োরোপীয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিতে হইবে। বৈদেশিক ভাষাশিক্ষাও আবশ্যিক করা হয়। দেশে পাশ্চাত্য ধাঁচে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষার জন্য ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করা হইল। সৈনিকদেরও পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং একটি নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলে। পরিবহন ও আর্থিক উন্নতির জন্য রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। শাসনব্যবস্থাও পূর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল করা হয়। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত থাকিলেও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক সভা স্থাপিত হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব: চীনদেশে মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা ছিলেন বিদেশী। চীনের উত্তরে মাঞ্চুরিয়া হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক চীনাগণ তাঁহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। তাঁহারা রক্ষণশীল সংস্কারে খুসী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের দাবি স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইলেন ডাঃ সুন্-ইয়াৎসেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে 'চীন নব-জাগরণ-সমিতি' নাম দিয়া একটি বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইহার কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের জীবিকা। ইহাছাড়া অপদার্থ মাঞ্চু শাসনের অবসান, চীনের পুনরুজ্জীবন, সাধারণতন্ত্র স্থাপন এবং জমির পুনর্বণ্টনেরও বিপ্লবী কর্মসূচীতে উল্লেখ ছিল। এই সমিতি জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য 'লিন পাও' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত করিতে থাকে। রাজতন্ত্রী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা অবশ্য চুপ করিয়া রহিল না। তাহারাও একটি দক্ষিণ-পন্থী দল স্থাপন করিয়া চীনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে উদ্যোগী হইল। ঠিক এই অবস্থায় মাঞ্চুসরকার যখন বিদেশীদের রেলপথ স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে মনস্থ করিল তখনই দেখা দিল সশস্ত্র বিপ্লব। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যেই এই বিপ্লব সীমাবদ্ধ রহিল না। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও ইহা ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হ্যাংকাউ এবং ওয়াথানের সামরিক বাহিনীতে প্রথম উত্থান ঘটিল। পরে ইহা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বিপ্লবিগণ নানকিং অধিকার করিয়া একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ডঃ সুন্-ইয়াৎ-সেনকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত করেন (১৯১২, ১লা ফেব্রুয়ারী)।

যুয়ান শি-কাই (Yuan Shih-Kai): মাঞ্চু সরকার যুয়ান শি-কাই নামক একজন জবরদস্ত সেনাপতিকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু তাহা তিনি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন। তখন ডাঃ সুন্'এর পরিবর্তে তিনিই হইলেন নব প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের সভাপতি। এইভাবে স্বৈরাচারী মাঞ্চুবংশের রাজত্বের অবসান হইল। য়ুয়ান ছিলেন অতীব উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালিপ্সু। সাধারণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। সংবিধান রচনার জন্য যে জাতীয় সভা গঠিত হইয়াছিল তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া দেন। ইহার অল্পকালের মধ্যে তিনি সমস্ত ক্ষমতা দখল করিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি নিজেকে সমগ্র চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এই দুরাশা পূর্ণ হইবার পূর্বেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে সাধারণতন্ত্র রক্ষা পাইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে সুন্ ইয়াৎ-সেন পুনরায় প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হইলেন।

বিপ্লবোত্তর চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা

ইতিমধ্যে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশব্যাপী অবিরাম গৃহযুদ্ধ চলে। স্থানে স্থানে নিষ্ঠুর প্রকৃতির সেনাপতি স্বয়ং প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশময় অসাধু রাজনৈতিক নেতারও অভাব ছিল না। উত্তর চীনে চাঙ্‌ৎসো-লিন (Chang Tso-Lin) নামক একজন সেনাপতি পিকিং সরকারের আদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া চলিতেন। একমাত্র দক্ষিণ চীনে ডাঃ সুন্ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিং-টাং নামে জাতীয়তাবাদী দলের প্রভাব বজায় ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জাপান মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া চীনের জার্মানী অধিকৃত কিয়াউ-চাউ ও সাণ্টুং প্রদেশ দখল করে। তাহাছাড়া পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। ইহার সুযোগ লইয়া জাপান চীনের নিকট একুশ দফা দাবি পেশ করে (১৯১৫ খ্রীঃ)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করা ছাড়াও চীনে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লাভ। স্বভাবতঃই চীন এই সকল দাবি পূরণ করিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে জাপানকে কতকগুলি দাবি ছাড়িয়া দিতে হইল। যুদ্ধান্তে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা জাপান কিয়াও-চাউ অঞ্চল লাভ করে এবং চীনে জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বীকৃতি পায়। শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিগণ জাপানের দাবিসমূহের প্রতিকার প্রার্থনা করেন এবং সেই সঙ্গে বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতা যাহাতে চীনে অবাধে চলিতে না পারে তাহারও দাবি জানান। কিন্তু কোন রকম সুবিধাই চীনকে দেওয়া হয় নাই।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় ডাঃ সুন্ স্বদেশের উন্নতি বিধানের জন্য তিন দফা কর্মসূচী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিদেশীদের কবলিত সমস্ত ক্ষমতা দেশবাসীর অধিকারে আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের শাসনভার থাকিবে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের (elite) উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি জনগণের সার্বভৌম অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তদানীন্তন অবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলন করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্যও বিদেশী-বিতাড়ন অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই তিন দফা কর্মসূচী ছাড়াও ডাঃ সুন্ সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইয়া যান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে ডাঃ সুন্ উপরোক্ত কর্মসূচীর রূপায়ণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ভার্সাই সন্ধির চুক্তি জাতীয়তাবাদী চৈনিকদের মনে দারুণ নিরাশা সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই কারণে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সুন্ চৈনিক সাম্যবাদী দলকে কুয়োমিং-টাং দলের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকর হইবার পূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সুন্'-এর মৃত্যু হয়। তখন চিয়াং কাই-শেক কুয়োমিং-টাং দলের নেতা হইলেন। রাশিয়ার সাহায্যে তিনি পিকিং, নানকিং, সাংহাই প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গৃহযুদ্ধ ঃ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট উপদেষ্টা মাইকেল বোরোদিন (Michael Borodin) কুয়োমিং-টাং দলের নেতৃপদ দখল করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদী দলের সহিত সাম্যবাদী দলের বিরোধিতা দেখা দেয়। অবশেষে ইহা সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়াতে অধিকার বিস্তার করে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পুনরায় কুয়োমিং-টাং ও সাম্যবাদী দল বিভেদ ভুলিয়া গিয়া সকলেই চিয়াং কাইশেকের অধীনে মিলিত হয়। কিন্তু সমগ্র চীনের সম্মিলিত শক্তিও জাপানকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

এদিকে সাম্যবাদীদল মধ্য ও দক্ষিণ চীন অঞ্চলে ক্রমেই তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিল। ইহাতে চিয়াং কাইশেক ভীত ত্রস্ত হন। দেশের ঐক্য আনিবার জন্য তিনি সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান চালাইলেন। কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হইল না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-টাং সৈন্যদের চাপে সাম্যবাদিগণ কমরেড মাও সে তুং'এর নেতৃত্বে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে। সুদীর্ঘ ৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহারা গন্তব্যস্থলে পেঁছায়।

কিছুকালের জন্য শান্তি ফিরিয়া আসিলে চিয়াং সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করেন। স্থানে স্থানে আধুনিক যুগোপযোগী কারখানা, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মিত হইল। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই সকল কার্যে অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। কুয়োমিং-টাং দলের শক্তিবৃদ্ধি জাপানকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান পুনরায় চীন আক্রমণ করে। একে একে চীনের পূর্ব উপকূলস্থ শহর ও প্রদেশগুলি জাপানের কবলস্থ হয়। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য কুয়োমিং-টাং ও সাম্যবাদিগণ পুনরায় মিলিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে। চীন তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যথাসাধ্য সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর

হইয়া আসিল। এইরূপে চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে পরিণত হয়। মিত্রপক্ষের হস্তে জাপানের পরাজয়ের পর (১৯৪৫) চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। কুয়োমিং-টাং দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের জমিদার ও মহাজনগণ। এই দল তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে অধিক দৃষ্টি দিত। ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। মাও সে-তুং প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া চীনের কৃষক ও শোষিত জনগণের মধ্যে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন। তাহারা সাম্যবাদী দলের প্রধান সমর্থক হইয়া উঠে। অবশেষে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট হইয়াও চিয়াংকাইশেককে পরাজয় বরণ করিতে হইল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দসহ ফরমোসা (তাইওয়াং) দ্বীপে আশ্রয় নেন। সাম্যবাদীদলের জয়লাভের পর অক্টোম্বর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। মাও সে-তুং ইহার প্রথম সভাপতি হন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে নানারকমের বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও কোটি কোটি লোকক্ষয়ের পর চীনে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সঙ্গে চীনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। নূতন নেতৃবর্গ এখন সাম্যবাদের আদর্শে তাঁহাদের দেশ গড়িয়া তুলিতেছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এশিয়াখণ্ডে চীনই হইল এখন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ।

একাদশ অধ্যায়	অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা

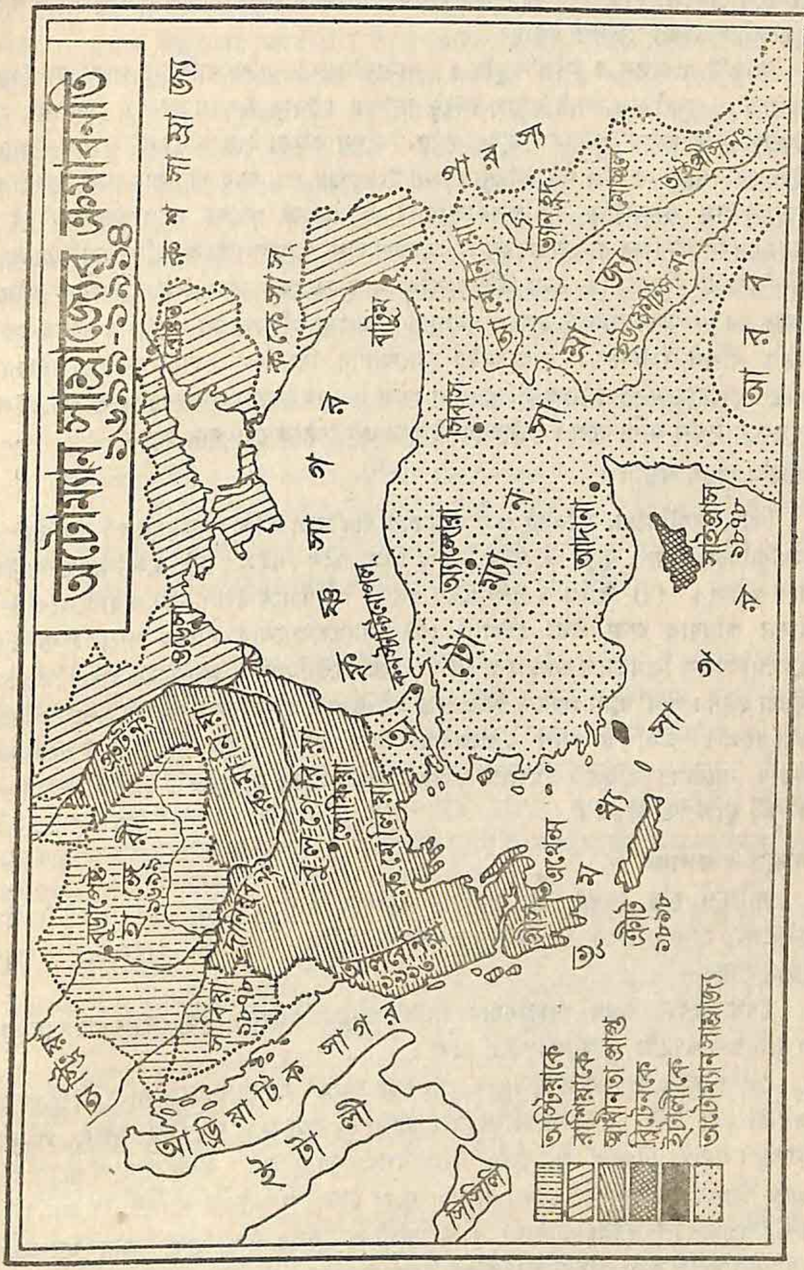
বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি, বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ রুমানিয়া, বোসনিয়া, হারজেগোভিনা ও বুলগেরিয়াতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, বার্লিন সম্মেলন ও বার্লিন চুক্তি, বার্লিন চুক্তি হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ।

বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যোগদান করে। তুরস্কের অধীনে যে সকল খ্রীষ্টান জাতি ছিল তাহাদের মঙ্গলার্থে কিছুই করা হয় নাই। এই জাতিগুলির মধ্যে স্লাভগণই শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। স্লাভগণ এই সময়ে স্বাধীনতার জন্য জলের ন্যায় রক্তক্ষয় করিতেও দ্বিধা করিল না। ইহার ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল হইল।

বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ রুমানিয়া ঃ ক্রিমিয়া যুদ্ধের শেষে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে গ্রীস, সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোকে মোটামুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখা যায়। মণ্টেনিগ্রো পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার পর মোলডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়াকে যুক্ত করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। ইহার নাম হইল রুমানিয়া।

বোস্নিয়া, হারজেগোভিনা ও বুলগেরিয়াতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ঃ মোলডাভিয়া ও ওয়ালেসিয়ার এই সাফল্যে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই দুইটি অঞ্চলে তুরস্ক তাহার শয়তানী শাসন নির্বিবাদে চালাইয়া যাইতেছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) খ্রীষ্টান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি তুরস্কের সুলতান দিয়াছিলেন তাহা পালন করিলেন না। খ্রীষ্টানদের সম্মান, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা তুর্কী শাসকদের উপর নির্ভর করিত। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইল। রাশিয়াও তাহাদের সাহায্য করিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বোস্নিয়া ও হারজেগোভিনাতে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিল। এই বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এদিকে বুলগেরিয়ার বিদ্রোহীরা কিছু সংখ্যক তুর্কী কর্মচারীকে হত্যা করিলে সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া বুলগেরীয়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করিলেন। বুলগেরিয়ার গ্রামে গ্রামে তুর্কী সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে মসীলিপ্ত করিল। বুলগেরিয়ার জনসাধারণের উপর এই অকথ্য অত্যাচারের সংবাদ যখন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে পেঁাছিল তখন সেগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় দেখা গেল এবং রাশিয়া এককভাবেই তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৭৭)। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৮-এর শুরুতেই রুশ বাহিনী এ্যাড্রিয়ানোপলএ প্রবেশ করিলে সুলতান বাধ্য হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সানস্টেফানোর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের

পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির দ্বারা সুলতান মণ্টেনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা



স্বীকার করিয়া লইলেন। বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনায় অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হইল। আর্মেনিয়াতে সংস্কার প্রবর্তন করা হইবে ঠিক হইল।

রাশিয়া বাটুম, কারস, বেসারাবিয়া ও দোব্রুদজা তুরস্কের নিকট হইতে আদায় করিল। দানিয়ুব হইতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হইল।

বার্লিন সম্মেলন ও বার্লিন চুক্তি ঃ সানস্টেফানোর সন্ধি রাশিয়ার পক্ষে এক বিরাট জয়লাভ। তুর্কী সাম্রাজ্য ইউরোপ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইল। রাশিয়ার এই সাফল্যে ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড বেশী করিয়া শঙ্কাগ্রস্ত হইল এবং রাশিয়ার শক্তি খর্ব করিবার জন্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী ডার্ডানেলিস প্রণালীতে বৃটিশ-নৌবাহিনী ও সুয়েজ খালের পথে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া রাশিয়া সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শক্তি-সমূহের এক বৈঠক আহ্বান করিতে সম্মত হয়। ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য বার্লিন নগরে একটি বৈঠক বসিল (১৮৭৮)। জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক ইহার সভাপতি হইলেন। সানস্টেফানোর সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইল। এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহাকে বার্লিন সন্ধি বলে। ডিজরেলী স্বয়ং এই বৈঠকে যোগদান করেন।

বার্লিন চুক্তির শর্ত ঃ

(ক) মন্টেনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। (খ) রাশিয়া বেসারাবিয়া, কারস্, বাটুম ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ পাইল। (গ) রুমানিয়া দোব্রুদজা লাভ করিল। (ঘ) 'শান্তি ও সুশাসনের স্বার্থে'' অস্ট্রিয়াকে বোস্নিয়া ও হারজেগোভিনা শাসন করিবার জন্য বলা হইল। (ঙ) সানস্টেফানোর সন্ধির দ্বারা সৃষ্ট বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হইল। মেসিডোনিয়াকে সুলতানের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব রুমালিয়াকে সুলতানের অভিভাবকত্বে এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হইল। অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে অভিহিত হইল। এখানে সুলতানের প্রভাব নামেমাত্র রহিল। ইংলণ্ড সুলতানের সহিত আর একটি চুক্তি দ্বারা সাইপ্রাস দ্বীপটি কুক্ষিগত করিল।

গুরুত্ব ও ফলাফল ঃ

বার্লিন চুক্তি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে এই চুক্তি বলকান্ জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল, যেমন,—

বেসারাবিয়া অঞ্চল রুমানিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া রাশিয়াকে দেওয়ায় রুমানিয়ার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ হইল।

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার শাসনে রাখিবার ফলে সার্ব জাতীয়তাকে অগ্রাহ্য করা হইল। মেসিডোনিয়াকে তুরস্কের শয়তানী শাসনের কবলে পুনরায় নিক্ষেপ করায় ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ বপন করা হইল। বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করায় একদিকে যেমন রাশিয়া ক্রুদ্ধ হইল, অপরদিকে বুলগেরীয় জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। এই সন্ধি অনুসারে ডিজরেলী বিনা যুদ্ধে এবং সসম্মানে শান্তি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন কিন্তু বার্লিন সন্ধির দ্বারা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ডিজরেলরী পক্ষে সসম্মানে

শান্তিরক্ষা করার কথা নিতান্ত দাম্ভিকতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির অভাব বুঝায়। ইহা ছাড়া এই সন্ধির শর্তানুযারী অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড অহেতুক কিছুটা রাজ্যখণ্ড লাভ করিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার নামে ইহা রাজনৈতিক দস্যুতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বার্লিন সন্ধি বলকান অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করিতে ব্যর্থ ত হইলই, বরঞ্চ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ এখানেই রোপিত হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্য অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। নূতন নূতন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল। বার্লিন সন্ধির কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। ইংলণ্ড সাইপ্রাস দখল করিবার ফলে তুরস্ক ক্ষুব্ধ হইল। অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করিবার জন্য জার্মানী রাশিয়ার বন্ধুত্ব হারাইল। বিসমার্কের 'ত্রি-সম্রাট চুক্তি' বাতিল হইয়া গেল। জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইল। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বৈত সন্ধি স্বাক্ষারিত হইল। রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটিবার ফলে রুশ-ফ্রান্স সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইল।

বার্লিন চুক্তি হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালীন নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাস বার্লিন চুক্তিকে নাকচ করিবার ইতিহাস। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রুমেলিয়া বার্লিন চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বুলগেরিয়ার সহিত যুক্ত হইল। বার্লিন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ ইহার বিরুদ্ধে কিছুই করিল না। এই যুগটিতে আবার বলকান অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দিল এবং এই সব স্বার্থ সংঘাতের ফলে নিজেদের মধ্যে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইল।

বুলগেরিয়া

বার্লিন চুক্তিতে বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ কিন্তু বেশিদিন টিকিল না। স্টামবুলফের নেতৃত্বে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেলিয়ার পুনর্মিলনের আন্দোলন দিন দিন জোরদার হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রুমেলিয়ার তুর্কী শাসককে উচ্ছেদ করিয়া পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল। সার্বিয়া ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল এই বলিয়া যে এই দুইটি রাষ্ট্রের সংযুক্তি বলকান অঞ্চলের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। ইহার পর সার্বিয়া বুলগেরিয়া আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয় এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় কোনরকমে রক্ষা পায়।

ইতিমধ্যে বুলগেরিয়াতে রুশ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী দল বুলগেরিয়াকে রুশ প্রভাবমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের দাবি ছিল 'বুলগেরিয়া বুলগেরিয়ানদের জন্য'। রাশিয়া ইহার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে। ফলে বুলগেরিয়াতে রুশপন্থী ও রুশ-বিরোধী দুইটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। কিন্তু শেষে জাতীয়তাবাদীরাই জয়ী হইল। বুলগেরিয়া হইতে রুশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করিল এবং তুর্কী সাম্রাজ্যাধীন মেসিডোনিয়ার দিকে নজর দিল।

আর্মেনীয় প্রশ্ন ও নব্য তুর্কী দল

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনিয়ার খ্রীষ্টানরা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। বার্লিন চুক্তিতে বলা হইয়াছিল যে, আর্মেনিয়ানদের প্রতি তুর্কী সরকার যাহাতে ভাল ব্যবহার করে তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইবে। তুরস্ক সরকার নিপীড়নমূলক

নীতির পরিবর্তন করিল না। ফলে আর্মেনিয়ানরা তুর্কী কুশাসন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিদ্রোহ ও বৈদেশিক সাহায্যকেই একমাত্র পথ মনে করিল। সুলতান অসহায় আর্মেনিয়ানদের হত্যা করিবরে জন্য তুর্কী সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন। কয়েক মাসে হাজার হাজার আর্মেনিয়ান খ্রীষ্টানকে হত্যা করা হইল। আর্মেনিয়ানদের উত্থান ব্যর্থ হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে এই সংকটময় অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবশেষে গণ আন্দোলন দেখা দিল। তুরস্কের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ একটি বিপ্লবী সংঘ স্থাপন করে। এই সংঘের নাম ছিল 'দি কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস' পরবর্তীকালে ইহা 'নব্য-তুর্কী নামে অভিহিত হয়। এনভার পাশা, তালাত এবং জামাল 'নব্য-তুর্কী' আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। নব্য-তুর্কী বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদী ছিল এবং তুর্কী জাতি, ইসলাম ধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহাদের আদর্শ ছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নব্য-তুর্কী বিপ্লবীরা সৈন্যদলের সাহায্যে তুরস্কের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এক গণতান্ত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করিল। নব্য-তুর্কী বিপ্লবের সাফল্যকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ও বলকান জাতিগুলি তুরস্কের দুর্বলতা বলিয়া মনে করিল। ফলে তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করিল। প্রথমে অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিল। বুলগেরিয়াও এই সুযোগে করিল স্বাধীনতা ঘোষণা। তুরস্কের দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার সুযোগে ইটালী দখল করিল লিবিয়া। কন্সটানটিনোপলের সন্নিকটে রোডস্ ও ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ ইটালী আক্রমণ করিল। নব্য-তুর্কী সরকার ইহাতে অবশ্য বিচলিত হইল না। ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকিল। ইহার ভিতর আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ দমন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া 'নব্য-তুর্কী' সরকার ইটালীর সহিত সন্ধি করিল। এই সন্ধির ফলে ইটালী ত্রিপলি নামক জায়গাটি পাইল।

প্রথম বলকান যুদ্ধ ঃ তুর্কী-ইটালী যুদ্ধে তুরস্কের সামরিক দুর্বলতা আরও প্রকাশ পাইল। ইহার ফলে প্রথম বলকান যুদ্ধ ত্বরান্বিত হইল। প্রথম বলকান যুদ্ধকে 'নব্য-তুর্কী' বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধরা হয়। নব্য-তুর্কী সরকারের 'তুর্কীকরণ' নীতির বিরুদ্ধে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র 'বলকান সংঘ' গড়িয়া তুলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘ মেসিডোনিয়ার খ্রীষ্টানদের জন্য তুরস্কের নিকট সুশাসনের দাবী জানায়। কিন্তু তুরস্ক ইহা অগ্রাহ্য করে। ফলে, বলকান সংঘ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহাকে প্রথম বলকান যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে 'বলকান সংঘ' তুরস্কের সৈন্য দলকে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজিত করিল। কেবল মাত্র এ্যাড্রিয়ানোপল, স্কুটারি এবং এবং জানিনা তুরস্কের হাতে রহিল। তুরস্কের এই পরাজয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি চিন্তিত হইল। বিশেষ করিয়া বলকান জাতীয়তাবাদের এই জয় অস্ট্রিয়াকে খুবই চিন্তায় ফেলিল, কারণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি বাস করিত। রাশিয়াও বলকান সংঘের এই জয়কে ভাল চোখে দেখিল না। সার্বিয়া যাহাতে এড্রিয়াটিক সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল না পায় তাহার জন্য অস্ট্রিয়া চেষ্টা করিল, এবং এই অঞ্চলে আলবেনিয়া নামে এক নূতন জাতীয় রাষ্ট্র যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার জন্য সে চেষ্টা

করিল। আর বুলগেরিয়া যাহাতে কন্সটান্টিনোপল দখলে না রাখিতে পারে তাহার জন্য রাশিয়া চেষ্টার ত্রুটি করিল না। এসব চেষ্টার ফলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কন্সটান্টিনোপল তুরস্কের অধীনে রহিল। আলবেনিয়া নামে এক নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইল এবং গ্রীস ক্রীট দ্বীপ পাইল।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ ঃ লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই 'বলকান সংঘ' ভাঙিয়া গেল এবং বলকান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হইল। ফলে দেখা গেল দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। এই যুদ্ধের কারণ হইল সার্বিয়া কর্তৃক মেসিডোনিয়া দখলে রাখা, বুলগেরিয়ার এ্যাড্রিয়ানোপল না পাওয়া এবং গ্রীসের স্যালোনিকা অধিকার। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বুলগেরিয়া তাহার পূর্বতন মিত্র সার্বিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। গ্রীস ও সার্বিয়ার পক্ষ লইয়া তুরস্ক বুলগেরিয়া আক্রমণ করিল। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে লণ্ডন চুক্তি বাতিল হইয়া গেল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাইল না। কারণ তাহারা একে অন্যকে সন্দেহ ও ভয় করিতেছিল। তাহারা জানিত যে বলকান যুদ্ধে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র লিপ্ত হইলে 'বলকান যুদ্ধ' ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইবে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একদিকে হইবে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া অপর দিকে থাকিবে।

এদিকে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট বুখারেস্ট সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির ফলে বুলগেরিয়াকে প্রথম বলকান যুদ্ধে পাওয়া স্থানগুলির অর্ধেকেরও বেশী ছাড়িয়া দিতে হইল।

গুরুত্ব

দুইটি বলকান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও জটিল ও ঘোরাল করিল। কোন পক্ষই বিশ্বাস করিল না যে চুক্তির শর্তগুলি টিকিয়া থাকিবে। সার্বিয়া মনে করিতে থাকিল যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারাই বোসনিয়ার সার্বদের মুক্ত করা যাইবে। বুলগেরিয়া তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মনেপ্রাণে ধ্বংস কামনা করিতে থাকিল। তুরস্ক অস্ট্রিয়াকে তাহার সম্ভাব্য মিত্র বলিয়া মনে করিল। রাশিয়া তুরস্কের দুর্বলতা দেখিয়া নিজেকে বলকান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টায় থাকিল এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে সাহায্য করিতে মনস্থ করিল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বলকান যুদ্ধ দুইটি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিল না ; বরঞ্চ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ এরূপ অবস্থায় লইয়া গেল যাহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায় | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ, কে যুদ্ধের জন্য দায়ী, যুদ্ধের গতি, প্যারিসে শান্তি সম্মেলন, ভার্সাই চুক্তিপত্র; ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা, সেণ্ট জার্মানের সন্ধি, ট্রায়াননের সন্ধি, নিউলির সন্ধি, সেভ্রের সন্ধি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল, জাতিসংঘ, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী, তুরস্কের আধুনিকীকরণ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক, কামালের আবির্ভাব, কামাল ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ: বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ঘটনা মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুইটি সর্বগ্রাসী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যেক যুদ্ধের পিছনে দুই প্রকারের কারণ থাকেই—পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। কোন একটি মাত্র কারণে যুদ্ধ ঘটে না। বিভিন্ন কারণের এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের ফলেই যুদ্ধ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও বিভিন্ন কারণের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল।

পরোক্ষ কারণ: জঙ্গীবাদ: জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলিতেন যে, জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহকঠিন-নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র পন্থা। তিনি তাঁহার কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হইলে এবং খুঁটিনাটিভাবে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিলে আধুনিককালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল অনেক রাষ্ট্রই। কেহ জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত হইল, কেহ পররাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করিল। এই সকল রাষ্ট্র একে অপরকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিল এবং ইহার ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট: এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পিছনে পরস্পর সন্দেহ ও স্বার্থ সংঘাত কাজ করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত হইল দুইটি পরস্পরবিরোধী সম-শক্তিমান রাষ্ট্রজোট। জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাকে ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) বলা হয়। এই চুক্তিতে ফরাসীরা ভীত হইল, কারণ জার্মানী ও ইটালী হইতে সরাসরি ফ্রান্স আক্রমণ করা সম্ভব। সুতরাং সে রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত মিতালি করিল। ইহারা প্রত্যেকেই জার্মান-বিরোধী ছিল সুতরাং মিত্রতা স্থাপনে কোনরূপ বাধা হইল না। এই তিন শক্তি ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া—জার্মান-আক্রমণ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি-নামায় স্বাক্ষর করিল। ইহাকে ত্রিশক্তি মিতালি (Triple Entente) বলে।

জাতীয়তাবাদ: জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। জার্মানী ও ইটালীর-ঐক্যসাধনের ইতিহাসে ইহার অবদান সর্বাগ্রে রহিয়াছে। কিন্তু নিকট-প্রাচ্যে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলে যখন এই জাতীয়তাবাদ তীব্ররূপে দেখা দিল তখনই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হইল। যেমন অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নানাজাতির সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ দেখা দিল তখন

বিভিন্ন জাতি লইয়া অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য কি করিয়া টিকিয়া থাকিবে? অস্ট্রিয়াকে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙিয়া দিয়া পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইবে। কোন সাম্রাজ্যই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে না। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যও নিজ রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করিতে চাহিল এবং যে সকল রাষ্ট্র এইরূপ ধ্বংসকারী (অস্ট্রিয়ার পক্ষে) মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিতেছিল তাহাদের বিরুদ্ধেও অস্ট্রিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল।

জার্মান-ইংরাজ বিরোধ ঃ জার্মানী ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিযোগী হইয়া পড়ে। আফ্রিকায় বিস্তৃত রাজ্যলাভের পর জার্মানীর সাম্রাজ্যলিপ্সা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বিরাট নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া ইংলণ্ডের উদ্বেগের সৃষ্টি করিলেন। তুরস্কের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া জার্মানী বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ইংলণ্ড আরও শঙ্কিত হইল, ফলে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল।

ফরাসী-জার্মান বিরোধ ঃ ফরাসীরা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের আলসেস ও লোরেন নামক সমৃদ্ধিশালী দুইটি প্রদেশ জার্মানী কাড়িয়া লইয়াছিল; ফলে ফরাসীদের মধ্যে জার্মানবিরোধী মনোভাব দেখা দিল। ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কামনা পূর্ব হইতেই করিতেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ ঃ সাম্রাজ্যবাদ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহিত উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও ইটালীর বিরোধ দেখা দিল। ইটালী অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে (নিজের সুবিধার জন্য) ত্রিশক্তি চুক্তি না মানিয়া পুরানো সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগ দেয়। তথাপি ইহা সর্বজনগ্রাহ্য যে জার্মানীর ও ইটালীর সাম্রাজ্য গঠনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণ সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ঃ ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যখন এইরূপ পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও মদোন্মত্ততায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটিল যাহা বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিল—সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড-ই এই ঘটনা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড বলকানের বসনিয়া (Bosnia) প্রদেশে সস্ত্রীক সফরে বাহির হইয়াছিলেন। ২৮শে জুন তারিখে সেরাজেভো (Serajevo) শহরে সার্বিয়ার এক তরুণ আততায়ীর হাতে যুবরাজদম্পতি নিহত হন। সার্বিয়া বলকান অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তাহারা জাতিতে শ্লাভ ছিল এবং তাহারা অস্ট্রিয়া-শাসিত শ্লাভ প্রদেশ অধিকার করিয়া জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। সুতরাং অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে শত্রুরূপে মনে করিত। সার্বিয়ার এক আততায়ীর হাতে অস্ট্রীয় যুবরাজের মৃত্যু হইলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার উপর আরও ক্ষিপ্ত হইল এবং সার্বিয়া সরকারের নিকট এক অপমানজনক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এদিকে রাশিয়ার সম্রাট জার নিজেকে বলকান উপদ্বীপের শ্লাভরাজ্যগুলির অভিভাবক মনে করিতেন। সার্বিয়ার জনসাধারণও শ্লাভ ছিল। সুতরাং রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ লইল এবং সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে ভীত হইতে নিষেধ করিল। অস্ট্রিয়া তাহার প্রেরিত চরমপত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (ত্রিশক্তি মিতালি অনুযায়ী) ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত মিলিত হইল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া জার্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, বুলগেরিয়া জার্মানীর সঙ্গে এবং ইটালী, পর্তুগাল, রুমানিয়া, গ্রীস, জাপান, চীন এবং সর্বশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া) সহিত যোগদান করে।

কে যুদ্ধের জন্য দায়ী ঃ যুদ্ধারম্ভের সময় অস্ট্রিয়া-জার্মানীর পক্ষে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মতে রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডও কতকাংশে দায়ী, কারণ ইঙ্গ-রুশ-ফরাসী প্ররোচনা ছাড়া সার্বিয়ার পক্ষে অস্ট্রিয়ার ভ্রূকুটি অবহেলা করা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে মিত্রশক্তি পক্ষাবলম্বিগণের মতে জার্মানী এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, কেননা জার্মানী সমগ্র পৃথিবীতে নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সঙ্কল্পে মাতিয়া উঠিলে যুদ্ধ দেখা দেয়।

আধুনিককালের চিন্তাশীল লোকদের অভিমত হইল যে একটি বিশেষ রাষ্ট্র (যেমন জার্মানী বা রাশিয়া) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল না। বৃহৎ পঞ্চশক্তি—জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া সমভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ শুরু হইল তাহা দীর্ঘ চারি বৎসর তিন মাস স্থায়ী হইয়াছিল। বহুদিক হইতে এই যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পূর্বেও ইউরোপে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছে, যেমন নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ইত্যাদি। এইসব যুদ্ধে যেসব দেশ লিপ্ত ছিল তাহাদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না এবং এসব যুদ্ধ চলিয়াছিল বহুদিন ধরিয়া। কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের মত সর্বাত্মক যুদ্ধ ইহার পূর্বে আর ঘটে নাই। মারণাস্ত্র তৈয়ারীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে এরূপভাবে পূর্বে কাজে লাগানো হয় নাই এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি ইহার পূর্বে কোন যুদ্ধই করিতে পারে নাই। যুযুধান প্রত্যেক রাষ্ট্রই সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, কারণ সকলেই বিশ্বাস করিত যে এই যুদ্ধের উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল।

যুদ্ধাদর্শ ঃ তৎকালীন অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের নিকট এই যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষার যুদ্ধ—সার্বিয়ার আক্রমণ হইতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ এবং রাশিয়ার বলকান অঞ্চলে অখিল শ্লাভ রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সার্বিয়ার নিকট এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। কারণ অস্ট্রিয়ার চরম প্রস্তাব মানিয়া লইলে সার্বিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব থাকিত না। এই কারণে সার্বিয়ার এই সংগ্রামকে মধ্য ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রই সহানুভূতির চোখে দেখিল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করিল রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্র যাহার নিকট সার্বিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা বড় ছিল না। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর প্রভাব যাহাতে বলকান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত

হইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে সার্বিয়াকে কাজে লাগান। এই স্ববিরোধী নীতি যুদ্ধের শুরু হইতে দেখা যায়। যাহার ফলে যুদ্ধাদর্শ সম্বন্ধে কোন পক্ষের ধারণা স্পষ্ট ছিল না এবং রাষ্ট্রজোট দুইটির সদস্যদের মধ্যে নীতিগত মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।



গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়ার সহিত গাঁটছড়া বাঁধায় নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসই দেখা যায়, গণতন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ কেবলমাত্র একটা গালভরা

কথা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন পক্ষেরই যুদ্ধনীতি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত হয় নাই। দুই পক্ষেরই যুদ্ধনীতি যুদ্ধে জয় ও আত্মরক্ষার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের গতি ঃ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বিদ্যুৎগতিতে শত্রুপক্ষকে আঘাত হানিল। বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জার্মান বাহিনী সহজেই প্রবেশ করিল এবং রাজধানী প্যারিসের পনের মাইলের মধ্যে গিয়া পেঁছাইল। কিন্তু এখান হইতে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই অবস্থা বহুদিন টিকিয়া থাকে এবং এখানে পরিখা যুদ্ধ (trench warfare) শুরু হয়। অবশ্য জার্মান বাহিনীকেও এই অঞ্চল হইতে হটান সহজে সম্ভব হইল না। পশ্চিম রণাঙ্গনে এরূপ অবস্থা যখন দেখা দিল পূর্ব রণাঙ্গনে তখন কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতে থাকিল। এই রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী প্রথমে কিছুটা কৃতিত্ব দেখাইলেও কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। জলপথেও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রবল নৌযুদ্ধ যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই শুরু হইল। তবে প্রথম হইতেই নৌশক্তিতে ইংলন্ডের প্রাধান্য বজায় থাকে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে কয়েকটি অঞ্চলে যুদ্ধ তীব্রভাবে বাধিয়া উঠে। দূরপ্রাচ্যে জার্মানী তাহার দখলে যে সব অঞ্চল ছিল সেগুলি হারাইল। মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানী বিশেষ সফলতা লাভ করে। পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হইল। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত রহিল। নৌযুদ্ধে এই বছরেই জার্মানী ডুবো জাহাজের ব্যবহার শুরু করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইউরোপে জার্মানীই সফলতা অর্জন করে। সার্বিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই পশ্চিম রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দুই প্রতিপক্ষই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালায় কিন্তু জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হইল না। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর জয় অব্যাহত থাকে।

যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গ-ফরাসী জোটে যোগ দেওয়ার ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়। অপরদিকে রাশিয়াতে বিপ্লব দেখা দিল; ফলে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল এবং রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সে জার্মানীর সহিত এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

যুদ্ধের শেষ বৎসরে জার্মানী যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য তৎপর হইল। পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হইবার ফলে সে পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে। কিন্তু সেনাপতি মার্শাল ফসের নেতৃত্বে মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন বাহিনী জার্মানীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ করিয়া দেয়। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের পরাজয় ঘটিতে থাকে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ইহার পূর্বেই জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্রগুলি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুসারে জার্মানী তাহার অধিকৃত অঞ্চল হইতে সরিয়া গেল এবং এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

প্যারিসে শান্তি সম্মেলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ডাকা হয়। ইহাতে ৩২টি দেশ যোগদান করে। পরাজিত শত্রুদের সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইল না। চুক্তিপত্রগুলির খসড়া তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর ঐগুলিতে স্বাক্ষর দিবার জন্য তাহাদের ডাকা হয়। সম্মেলনের যোগদানকারীদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনশো এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই ছিলেন শান্তি সম্মেলনের কর্ণধার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিল। পরাজিত শত্রুর প্রতি করুণা এবং জাতিসংঘের পরিকল্পনা লইয়া আসিলেন উইলসন। চীনে বিশেষ সুবিধা যাহাতে পাওয়া যায় তাহার জন্য জাপান উপস্থিত হয়। লাভের বাঁটোয়ারা এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য গিয়াছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী। উইলসনের ১৪ দফাকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধ লক্ষ্য হিসাবে লইয়াছিল সত্য কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সেগুলি গ্রাহ্য করা হইল না। এক উইলসন ছাড়া সকলেই স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা পরিচালিত হইলেন। উইলসন ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও তিনি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। যুদ্ধশেষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত স্থির করিলেন শান্তি চুক্তিতে তাঁহার ১৪ দফা পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। যাহার ফলে রাষ্ট্রগুলি আর গোপন চুক্তি করিবে না, নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হইবে, জলপথে অবাধ বিচরণ করা সম্ভব হইবে সকলের পক্ষে এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে। উইলসনের ইউরোপের তৎকালীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলিয়াই তিনি যুদ্ধশেষে এরূপ আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। প্যারিসে গিয়া তিনি যখন অন্যান্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সহিত লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো প্রভৃতির মনোভাবের কত পার্থক্য। ফলে উইলসন তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।



উইলসন

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁহার প্রখর ছিল। শান্তি সম্মেলনে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে তাঁহার অবদান বেশী ছিল।



লয়েড জর্জ

ফ্রান্সের প্রতিনিধি ক্লিমেনশোকে 'বাঘ' বলা হইত। রাজনীতিতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। প্যারিস সম্মেলনে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করা। তিনি চাহিলেন জার্মানীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং ফ্রান্সের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খনিগুলি।

ইটালীর প্রতিনিধি অর্লেণ্ডো সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও অভিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ্ ছিলেন। শান্তিচুক্তির ফলে ইটালী কি করিয়া লাভবান হইবে এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি প্যারিস সম্মেলনে যোগ দেন।

অতএব প্যারিস সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের বা নীতির সংঘাত দেখা দিল। এক দিকে ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন এবং অপর দিকে শক্তিসাম্য, পরাজিত শত্রুকে শক্তিহীন করার ইচ্ছা এবং বিজয়ী শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। পরিশেষে স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিটিরই জয় হইল।



ক্লিমেনশো

ভর্সাই চুক্তিপত্র বিভিন্ন শর্ত ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীর সহিত ৪৪০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রথম মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে জার্মানীকে এই চুক্তি অনুসারে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

জার্মানীকে আলসাস্ ও লোরেন ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দিতে হয়। পোসেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া এই দুইটি অঞ্চল পোল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট হইতে পাইল। জাপানকে জার্মানী কিয়াও-চৌ দিতে বাধ্য হইল। উত্তর স্লেজউইগ, ইউপেন, ম্যালমেডি এবং মরেসনেটে গণভোট গ্রহণ করা হইল। ফলে উত্তর স্লেজউইগ ডেনমার্ক লাভ করিল এবং অবশিষ্ট অঞ্চলগুলির জনগণ বেলজিয়ামের সহিত সংযুক্তির প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিল। উত্তর সাইলেশিয়ার কিছু অংশের জনগণ গণভোটের দ্বারা পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। ডানজিগ জার্মানী হারাইল এবং ইহা লীগের সংরক্ষণাধীনে একটি স্বাধীন শহর হিসাবে বিবেচিত হইল। মিত্রশক্তিবর্গ মেমেল জার্মানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, মরক্কো, সাইবেরিয়া, চীন এবং শ্যাম দেশে জার্মানী যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জার্মানীর যে সকল উপনিবেশ ছিল সেইগুলির শাসন পরিচালনার

ভার গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম এবং নিউজিল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। অবশ্য স্থির হয় যে ঐ সকল অঞ্চল ম্যানডেট হিসেবে জাতি সংঘের অধীনে থাকিবে।

ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে বিশেষ দুর্বল করিয়া দেওয়া হয়। জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারেও জার্মানীর উপর কঠোর বাধা আরোপ করা হইল; বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা জার্মানী করিতে পারিবে না। জার্মানীর নৌবাহিনীও এই চুক্তির দ্বারা বিশেষ ভাবে হ্রাস করা হইল। জার্মানী যাহাতে ভার্সাই চুক্তি মানিয়া চলে সেই উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী রাইন নদীর পশ্চিম দিকে জার্মানীর যে ভূখণ্ড ছিল তাহা দখলে রাখিল। জার্মানী চুক্তি মানিয়া চলিলে ঐ সৈন্যবাহিনী একে একে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল। রাইন নদীর বাম পার্শ্বস্থ অঞ্চল এবং দক্ষিণ পার্শ্বেরও কিছু অঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত (demilitarised) হইল। কাইজার এবং অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা করা হইল।

এই চুক্তির ফলে অর্থনৈতিক বিষয়েও জার্মানীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আলসাস্-লোরেনের লোহ ও পেট্রোলিয়াম সম্পদ হইতে জার্মানীকে বঞ্চিত হইতে হয়। সার অঞ্চলের কয়লা সম্পদ ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। ঠিক হয় যে ১৫ বছর পর গণভোটের দ্বারা যদি ঐ অঞ্চলের জনগণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে তাহা হইলে জার্মানীকে সার অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি ক্রয় করিতে হইবে। জার্মানী ও লাক্সেমবার্গের মধ্যে যে বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়ায় জার্মানীর অসুবিধা হইয়াছিল।

জাতিসংঘের কাউন্সিলের মতামত ভিন্ন জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করা চলিবে না। ইহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য জার্মানী এই চুক্তি অনুসারে মিত্রশক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল। ডানিয়ুব, এলব (Elbe), নীমেন, ওডার এবং রাইন নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে স্বীকার করা হইল।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা ঃ প্যারিস শান্তি বৈঠকের ফলস্বরূপ ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই চুক্তিটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে হইবে।

(ক) জার্মান প্রতিনিধিদের সহিত কোন আলোচনা করা হয় নাই। তাহাদের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে এক প্রকার বাধ্য করা হইয়াছিল। তাহাদের প্রতি বিজেতা রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণেই জার্মানগণ ভার্সাই সন্ধিকে জোরপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া সন্ধিরূপে আখ্যায়িত করে। (খ) জার্মানীর অখণ্ডতা নষ্ট করিয়া মূলত ফ্রান্সের শক্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। পোল্যাণ্ড-জার্মান সীমানা এমনভাবে ঠিক করা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের অজস্র সুযোগ থাকে। (গ) জার্মানীর সামরিক শক্তি নষ্ট করা হয় এবং তাহার উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হয়। (ঘ) জার্মানীকেই যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী করা হয়, যাহা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। (ঙ) জার্মানী যেহেতু যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী বলিয়া চিহ্নিত হয়, সেহেতু তাহার উপর এক বিরাট অঙ্কের

ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানী একেবারেই অসমর্থ ছিল।

জার্মান দৃষ্টিতে ঃ

ভার্সাই সন্ধির আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়—জার্মান দৃষ্টিতে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। জার্মান দৃষ্টিতে ভার্সাই সন্ধির সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী ভার্সাই সন্ধি। ইহাকে একটি উৎপীড়ন করার কক্ষ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কক্ষ হইতে জার্মানরা কেবলমাত্র যুদ্ধের দ্বারা বাহির হইতে পারে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জার্মানদের এই অভিসন্ধিমূলক সমালোচনা একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ ভার্সাই সন্ধিকে উৎপীড়নমূলক বলার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র ছিল ক্ষতিপূরণ। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ ত জার্মানরা শোধ করে নাই, জার্মানী আমেরিকার নিকট হইতে যতটা ঋণ পাইয়াছিল তাহার অনেক কম ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রশক্তিদের দিয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জার্মানী আর কোন ক্ষতিপূরণ দেয় নাই। আরও মজার ব্যাপার যে, জার্মানী যে অর্থ ঋণ হিসাবে লইয়াছিল তাহাও কখনো শোধ করে নাই।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঃ

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভার্সাই সন্ধিটি কতকগুলি অবাস্তব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি তাহাদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। জার্মানীতে গণতন্ত্রের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া ইংলণ্ড-আমেরিকার ধাঁচে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। চুক্তিটির অর্থনৈতিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, নবগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

অন্যান্য চুক্তি ঃ সেণ্ট্ জার্মেন-এর সন্ধি দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে এবং ইহার বদলে অস্ট্রিয়াতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধের জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দায়ী থাকায় অস্ট্রিয়াকে মিত্রশক্তি বর্গকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেহেতু জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার নূতন সরকার এই দুইটি রাষ্ট্রের মিলনের পক্ষপাতী ছিল সেইজন্য এই চুক্তির দ্বারা স্থির হইল যে, এই দুইটি দেশকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেওয়া হইবে না। এই চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়া ইটালীকে দক্ষিণ টাইরল, ট্রেন্টিনে, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া এবং ডালমাসিয়ার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ টাইরেলে প্রায় ২৮ লক্ষ জার্মান ভাষাভাষী লোক থাকা সত্ত্বেও ইহা ইটালী লাভ করে, কারণ গোপন চুক্তি অনুসারে ইহা ইটালীর প্রাপ্য ছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, নিম্ন অস্ট্রিয়ার এক অংশ (Part of lower Austria) এবং অস্ট্রিয়ান সাইলেশিয়া এই সকল অঞ্চল লইয়া চেকোশ্লাভাকিয়া নামক এক নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়া পাইল বুকোভিনা। সার্বিয়া, বসনিয়া, হার্জিগভিনা এবং ডালমাসিয়ার উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জ লইয়া যুগোশ্লাভিয়া নামে এক নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল।

এই চুক্তির অবশিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন শর্তের অনুরূপ ছিল।

ট্রায়াননের সন্ধি ঃ ১৯২০ সালে ৪ঠা জুন ট্রায়ানন প্রাসাদে মিত্রশক্তিবর্গ হাঙ্গেরীর সহিত ট্রায়ানন সন্ধি সাক্ষর করে। এই সন্ধি অনুসারে নূতন রাষ্ট্রের নাম হাঙ্গেরী করা হইল, হাঙ্গেরিয়ান প্রজাতন্ত্র নয়। এই চুক্তির ফলে হাঙ্গেরীর নিকট হইতে রুমানিয়া ট্রানসিলভানিয়া এবং টেম্‌স্‌ভরের অনেকাংশ পাইল। যুগোশ্লাভিয়া ক্রোসিয়া, শ্লাভোনিয়া এবং টেম্‌স্‌ভরের কিছু অংশ লাভ করিল, চেকোশ্লোভাকিয়া শ্লোভাকিয়া ও ক্যারপাথিয়ান পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ও পূর্ব ভূখণ্ডের কিছু অংশ লাভ করে। পশ্চিম হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৩৫,০০০ নির্দিষ্ট করা হইল। হাঙ্গেরীকেও যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়।

নিউলির সন্ধি ঃ নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়ার নিকট হইতে পশ্চিম বুলগেরিয়ার চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লাভ করে। গ্রীসকে পশ্চিম থ্রেস এবং ইজিয়ান উপকূলের কিছু কিছু অঞ্চল দেওয়া হয়। বুলগেরিয়া তাহার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এর অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবে না ঠিক হয়। বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য করা হয়।

সেভ্রের সন্ধি ঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আগস্ট সেভরের সন্ধি অনুসারে তুরস্ক ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো এবং টিউনিসিয়ায় সকল অধিকার হারাইল। ইহা ছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া এবং সিরিয়ার উপরও তুরস্ক তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। স্মার্না ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর অস্থায়িভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে রাখা হইল। গ্রীস ইজিয়ান সাগরস্থ কতগুলি দ্বীপ এবং পূর্ব থ্রেস তুরস্কের নিকট হইতে লাভ করে। রোড্‌স ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইটালীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

তুরস্ক আর্মেনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করিল। প্রকৃত পক্ষে আনাটোলিয়া (এশিয়া মাইনর) এবং ইউরোপের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত তুরস্ককে অবশিষ্ট সকল ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিতে হইল। এমন কি আনাটোলিয়ার উপরও ফ্রান্স ও ইটালী প্রভাব বিস্তারের অধিকার একটি চুক্তির দ্বারা লাভ করে। তুরস্কের সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধিগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন বটে কিন্তু এই সন্ধির বিরুদ্ধে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে আন্দোলন হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা লসেনের সন্ধি দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ঃ এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফল একদিক হইতে যেমন বেদনাদায়ক, অন্যদিকে তেমনি শুভফলসূচক হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। অনেক দেশে যুদ্ধ-শেষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে ধন ও প্রাণের যে হানি হয় তাহা অতি ভীষণ। দুই পক্ষের প্রায় এক কোটি সৈন্য নিহত হয় এবং নিহত বেসামরিক লোকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ত্রিশলক্ষ।

মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয় এবং কোন রাষ্ট্রই ইহা হইতে রক্ষা পায় নাই। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় বেকারের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে।

সুফল : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন লইয়া আসে।



এই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জাপান পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লয়। ইউরোপে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন হ্রাস পায়। কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের অধীনস্থ আরব দেশগুলি অর্ধ-স্বাধীনতা লাভ করে।

যুদ্ধের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রসার হইতে থাকে। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। গণতন্ত্রের ফলেই বিভিন্ন দেশে নারী জাগরণ দেখা দেয় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে পুরুষের তুল্য রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়।

এই ভয়াবহ যুদ্ধে নিরর্থক নৃশংসতা দেখিয়া বিশ্ববাসীর মনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মনোভাব দেখা দেয়। ফলে জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনস্ নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা ও যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গঠনে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে সাফল্য দাবি করিতে পারে।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভাঙিয়া অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া—এই তিনটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন হইল। রাশিয়ার দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বরাজ পাইল ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। ১৯২০-এর মানচিত্রে জারশাসিত রাশিয়ার বদলে দেখা দিল সমাজতন্ত্রী রাশিয়া। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে নূতন করিয়া দেখা দিল পোল্যাণ্ড। আঠারো শতকে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া তিনবার পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেশটির বিলোপ ঘটায়। প্যারিস বৈঠকে পোল্যাণ্ডের পুনর্জন্ম হইল। বল্কান অঞ্চলে পুরনো সার্বিয়া রাষ্ট্রটি বর্ধিত হইয়া যুগোশ্লোভিয়া নামে দেখা দিল ; সার্ব, ক্রোট ও স্লোভেন জাতির বাসভূমি রূপে এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, রুমানিয়া ও গ্রীসের আয়তন বৃদ্ধি পাইল। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কের আয়তন কমিয়া গেল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আইরিশ-ফ্রি-স্টেট (বর্তমানে আয়ার) নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

জাতিসংঘ (League of Nations)

অতি জাতীয়তার স্বপ্নে মানুষ এতদিন বিভোরই ছিল, ইহার সার্থক রূপায়ণ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠায়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারও অবদান কম নয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধ যাহাতে আর না ঘটিতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করেন। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি সমিতি—জাতিসংঘ সমিতি (League of Nations Society) এবং স্বাধীন জাতিদের লইয়া জাতিসংঘ সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উইলসন্ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে 'বিশ্বশান্তির জন্য জাতিসংঘের' উপর এক বক্তৃতা দেন। তাঁহার বিখ্যাত চৌদ্দদফায় (Fourteen Points) যুদ্ধশেষে জাতিসংঘ

প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম দফা রূপে স্থান পায়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী সরকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মার্টস্ তাঁহাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। ইতিমধ্যে ধ্বংসকারী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধশেষে সর্বদিকে ধ্বংসের নিদর্শন ও বিভীষিকার ফলে মানুষের মনে চিরশান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনা ও ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (Covenant) প্রণীত হয়, এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘের নিয়মপত্রকে, ভার্সাই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জাতিসমূহের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ঃ জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যুদ্ধভীতি হইতে রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করা এবং কার্যকর নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত না হইবার দায়িত্ব লয় এবং জাতিগুলির মধ্যে যাহাতে ন্যায়সঙ্গত, সম্মানজনক ও খোলাখুলি সম্পর্ক গড়িয়া উঠে সেদিকেও নজর দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের উপর জোর দেওয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধিগুলি রাষ্ট্রগুলি যাহাতে মানিয়া চলে তাহার কথাও বলা হয়।

জাতিসংঘের নিয়মাবলী ঃ জাতিসংঘে দুই প্রকারের সদস্য ছিল—প্রাথমিক সদস্য এবং পরবর্তীকালে যে যে রাষ্ট্র সদস্য হয়। চুক্তি স্বাক্ষরকারী (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাদে) মিত্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক সদস্য। ইহাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও জাতিসংঘের প্রাথমিক সদস্য হিসাবে গণ্য হয়। বিজিত রাষ্ট্রগুলির এবং পরবর্তীকালে যে সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে তাহাদের দ্বিতীয় প্রকারের সদস্য বলা যাইতে পারে। প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪০। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোট সংখ্যা হয় ৫৫। জাতিসংঘের সভার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোন রাষ্ট্রকে সদস্যভুক্ত করা যাইত। পরাজিত শত্রু রাষ্ট্রগুলি এবং রাশিয়া প্রথমে জাতিসংঘের সদস্য ছিল না। জাতিসংঘ পরিত্যাগ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র পূর্ব হইতে নোটিশ দিয়া ইহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিত। আবার চুক্তিভঙ্গকারী, জাতিসংঘের আদর্শচ্যুত কোন রাষ্ট্রকে অন্য সদস্যরা সর্বসম্মত ভোটে সংঘ হইতে সরাইয়া দিতে পারিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘে সদস্য হিসাবে যোগ দেয় নাই।

স্বরূপ ঃ জাতিসংঘ একটি রাষ্ট্র বা অতিজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। সদস্যরাষ্ট্রগুলি সার্বভৌমিকতার একবিন্দুও পরিত্যাগ করে নাই। জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্য-বাহিনী ছিল না। ইহার শক্তি নির্ভর করিত সদস্য রাষ্ট্রগুলির সদিচ্ছার উপর।

সংস্থাগুলি ঃ জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সভা, কাউন্সিল, কর্মদপ্তর প্রধান ছিল। আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাকেও জাতিসংঘের দুইটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ বলা যাইতে পারে।

সভা (Assembly) ঃ প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই সভার সদস্য ছিল এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা ছিল।

জাতিসংঘের চুক্তিপত্র অনুসারে সভা সংঘের আওতায় অথবা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারিত। সাধারণতঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোট দরকার হইত। সভা নূতন সদস্য নির্বাচিত করিত ($\frac{2}{3}$ ভোটের দ্বারা)। সভা সংঘের চুক্তিপত্রও সংশোধন করিতে পারিত। অবশ্য ইহা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন সভাই করিত। তাহা ছাড়া, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিত। পরিষদের কার্য, ম্যানডেট অঞ্চলের শাসন এবং জাতিসংঘের বাৎসরিক বাজেট প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা ইহার এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল।

পরিষদ (Council)ঃ জাতিসংঘের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান নির্বাহক ছিল পরিষদ। বৃহৎ শক্তিগুলি ইহার স্থায়ী সদস্য ছিল। ইহার সংখ্যা ছিল ৫ এবং অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ছিল ১১। জাতিসংঘের এলাকাভুক্ত বা বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে কোন বিষয় আলোচনা করিয়া পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান, সভার সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করা ইত্যাদি পরিষদের কার্যতালিকার মধ্যে ছিল। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কাউন্সিলকে সদাসর্বদা চেষ্টা করিতে হইত। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মধ্যস্থতা নিয়োগের দ্বারাও যদি অমীমাংসিত থাকিত তাহা হইলে কাউন্সিলই বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিত এবং বিষয়টি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশ করিতে পারিত। জাতিসংঘের চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পরিষদেরই ছিল।

কর্মদপ্তর (Secretariat)ঃ জাতিসংঘের কাজকর্ম সুচারুরূপে চালাইবার জন্য একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। একজন প্রধান কর্মসচিবের (Secretary-General) অধীনে এই বিভাগটি ছিল। প্রধান কর্মসচিব সভার দ্বারা সমর্থিত পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সভা এবং পরিষদের কার্যতালিকা প্রণয়ন, জাতিসংঘের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ, জাতিসংঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা ইহার কার্যের মধ্যে ছিল।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ঃ ইহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিচারালয় নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক চুক্তির গঠন, দায়িত্ব ইত্যাদির সুবিচার এই আদালতের আওতায় আসে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাঃ এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই সংস্থার সদস্য ছিল।

তুরস্কের আধুনিকীকরণঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে এবং যুদ্ধশেষে পরাজিত তুরস্কের অবস্থা শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের দুর্বল সুলতানকে সেভ্রের সন্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়। সেভ্রের সন্ধির শর্তগুলি খুবই কঠোর ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদিগণ তুমুল আন্দোলন শুরু করে। সেভ্রের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের রাজ্যসীমা একেবারে সঙ্কুচিত করা হয়। পশ্চিম আনাটোলিয়া গ্রীসকে দেওয়া হয়। গ্রীস এই অঞ্চল দখল করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। মিত্রশক্তি

গ্রীসকে সামরিক সাহায্য করে। গ্রীক সৈন্যদল স্মার্ণা দখল করে এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুলতানের সৈন্যদল উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে অক্ষম হয়।

কামালের আবির্ভাব : জাতির এই সংকট-মুহূর্তে তুরস্কে এক তরুণ নেতার আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম কামাল পাশা। তাঁহার নেতৃত্বে তুরস্কে এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে।

প্রথম জীবন : মুস্তাফা কামাল পাশা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত সালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তুরস্কের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন (১৯০৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সবিশেষ সামরিক কৃতিত্ব দেখান এবং জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি সেভ্রের অপমানজনক সন্ধি প্রথম হইতে অগ্রাহ্য করেন এবং জাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

নেতৃত্বপদে কামাল : তুরস্কের অকর্মণ্য সুলতান ছিলেন ইংরাজদের একান্ত বংশবদ। ইংরাজরা চেষ্টা করিতেছিল তুরস্কের স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করা যায়। সুলতান কামালকে পছন্দ করিতেন না, কারণ জনসাধারণ তখন কামালকে তাহাদের প্রিয়তম নেতা হিবাবে গ্রহণ করিয়াছে। সুলতান কামালকে ভয় করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জনপ্রিয়তা কমাইবার জন্য কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল হইতে কামালকে আনাটোলিয়া নামক প্রদেশে প্রেরণ করেন। কামাল গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং নিজের দলকে শক্তিশালী করিয়া তুলেন।



মুস্তাফা কামাল পাশা

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং তুরস্কের কয়েকটি শহর দখল করে। গ্রীক সৈন্য আঙ্কারার অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাকারিয়ার যুদ্ধে কামালের নেতৃত্বে তুর্কী সৈন্য বীরবিক্রমে বাধা দেওয়ায় গ্রীকসৈন্য আঙ্কারা দখল করিতে অসমর্থ হয়। এই সময় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র বৃটেনই গ্রীকদের সাহায্য করে। কামাল ফ্রান্সের সহিত একটি চুক্তি সাক্ষর করেন। যাহার ফলে ফরাসীবাহিনী সিলিসিয়া নামক স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। মিত্রশক্তিবর্গ এই সময় গ্রীক-তুর্কী বিবাদের একটা মীমাংসার কথা বলেন। কিন্তু কামাল আনাটোলিয়া হইতে গ্রীক সৈন্য অপসারিত না হইলে কাহারও সহিত মীমাংসা করিতে চাহেন না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কামালের নেতৃত্বে তুর্কী সৈন্য গ্রীক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে এবং গ্রীক সৈন্য হটিতে আরম্ভ করে। তুর্কী সৈন্য স্মার্ণা পুনর্দখল করে। এই সময়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কামালের সৈনদলকে বাধা দিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের নিকট আবেদন করেন। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছাড়া আর কোন শক্তিই এই আবেদনে সাড়া দেয় নাই।

মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৃথা মনে করে। ইতিমধ্যে কামাল তুরস্ক হইতে সুলতানের পদ লোপ করিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্ক ও মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য লসেনে এক বৈঠক বসে। এই সম্মেলনে তুরস্কের প্রতিনিধিদের সহিত মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিবার ফলে সম্মেলনের বৈঠক কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্মেলনের বৈঠক পুনরায় বসে এবং জুলাই মাসে সম্মেলনের কার্য শেষ হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই লসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা সেভ্রের চুক্তিটিকে বাতিল করা হয়। সেভ্রের চুক্তির কঠোর শর্তাদি আর তুরস্ককে মানিতে হইল না। সেভ্রের সন্ধি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেই সেই চুক্তি নাকচ করা হইল।

কামাল ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য ঃ কামাল তাঁহার অনুচরদের লইয়া তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন এবং একটি জাতীয় সরকার আঙ্গোরায় বা আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আঙ্কারায় জাতীয় সভা কর্তৃক মৌলিক আইন গৃহীত হয়। ইহাতে তুরস্কের জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার ঘোষণা করা হয় এবং তুরস্ককে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার প্রস্তাব করা হয়।

বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করিয়া কামাল তুরস্কের অবিসংবাদী জাতীয় নেতারূপে স্বীকৃতিলাভ করিলেন। সুলতান রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক হইলেন এবং তুরস্কের প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিলেন।

অভ্যন্তরিণ নীতি ঃ কামাল নব্য তুরস্কের স্রষ্টা। তিনি বহু সামাজিক কুপ্রথা তুলিয়া দেন। পুরাতন আচার-ব্যবহারের আমূল পরিবর্তন করিলেন। নারীদের স্বাধীনতা দান করিলেন, অবরোধ প্রথা দূর হইল; বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হইল; ফেজটুপির পরিবর্তে পাশ্চাত্য পোশাক ও টুপি (Hat) চালু হইল। আরবী অক্ষরের বদলে রোমান বর্ণমালার প্রবর্তন করা হইল। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যক করা হইল; তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইল। তিনি খলিফার পদ তুলিয়া দিলেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মত তিনি তুরস্কের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রবর্তন করিলেন। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যও তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। দেশে রেলপথ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিস্তারলাভ করিল। উন্নত ধরনের কৃষিপ্রথা প্রবর্তিত হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং দেশের কৃষি, সেচব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিজের সদ্ব্যবহার এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ কামাল কেবলমাত্র একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন না, বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। বৈদেশিক নীতিতে তিনি শান্তির পথ পছন্দ করিতেন। প্রথমদিকে তিনি বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। এ কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নকে একমাত্র মিত্ররাষ্ট্র বলিয়া মনে করেন এবং

মিত্রতামূলক সন্ধিও স্বাক্ষর করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রাশিয়ার বিদেশে সাম্যবাদ প্রচারের নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের অবসান ঘটান। ইহার ফলে তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্বমূলক সন্ধি সম্পাদিত করেন। তুরস্ক জাতিসংঘের সদস্য হয়। কামাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কামাল গ্রীস ও রুমানিয়ার সহিত একটি মৈত্রীমূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার ফলে তুরস্ক ও বলকান রাষ্ট্রগুলির প্রতি তুরস্কের যে বৈরী মনোভাব বর্তমান ছিল তাহা দূরীভূত হইল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কামাল লসেনের সন্ধির কতকগুলি শর্ত পরিবর্তনের দাবী জানান। এদিকে মুসোলিনী আবিসেনিয়া আক্রমণ করার ফলে তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে। ফলে তুরস্ক দার্দানেলিজ ও বসফোরাসে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করে এবং যুদ্ধ বাঁধিলে জাতিসংঘের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করিবে কেবল সেই সকল দেশের জন্য এই দুইটি প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

কামাল তুরস্কের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানকে লইয়া একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে কামাল এইভাবে তুরস্ককে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

বর্তমান তুর্কীজাতির জনক কামাল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার কার্যাবলীর দ্বারা অনগ্রসর তুরস্ককে সর্ববিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির মত উন্নত করিয়া যান। তিনি নব্য তুরস্কের স্রষ্টা। তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে 'কামাল আতাতুর্ক' বা তুর্কী জাতির জনক কামাল, এই সম্মানজনক আখ্যা দিয়াছে। এই উপাধি প্রদান করিয়া তুরস্কবাসীরা যথার্থ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একক সংগ্রামের দ্বারা সেভ্রের সন্ধি নাকচ করিয়া তিনি লসেনের সন্ধিতে তাহাদের স্বাক্ষরদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দ্বারা তুরস্কের জাতীয় জীবনে নূতন প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তিনি তুরস্ককে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব

রুশ বিপ্লবের কারণ, রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়, মহান অক্টোবর বিপ্লব, সোভিয়েট শক্তির জয়যাত্রা, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ, নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রবর্তন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সৃষ্টি, রুশ বিপ্লবের প্রভাব।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের তথা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ থাকিলেও রাশিয়ার এই বিপ্লব ইউরোপীয় ইতিহাসের বিবর্তনের পথে একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা ছিল। আধুনিক যুগের শুরু হইতে যে সব শক্তি ও প্রবণতাগুলি ইউরোপের সামগ্রিক পরিবর্তন লইয়া আসিয়াছিল তাহারই একটি বিশেষ পর্যায় হইল এই রুশ বিপ্লব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লব যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণীকে প্রচারিত করিয়া এক নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত করে তাহারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটিল রুশ বিপ্লবে।

রুশ বিপ্লবের কারণ ঃ এই বিপ্লবের পিছনে দুইটি মূল কারণ দেখা যায়। প্রথমত, রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা ও জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসন পরিচালনায় পরিপূর্ণ অক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত, রাশিয়ায় পশ্চিমী ভাবধারার প্রসার ও জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার অভ্যুদয়। এই দুইটি সাধারণ কারণ ছাড়াও রুশ বিপ্লবের অনেকগুলি বিশেষ কারণও দেখা যায়। সবশেষে বলা যায় যে রাশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দেশে এমন এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানিকে কেন্দ্র করিয়া বিস্ফোরণমুখী হয় এবং এক সার্থক বিপ্লব সংগঠিত হয়।

রাজনৈতিক কারণ ঃ রাশিয়ার সম্রাটদের জার বলা হইত। রোমানফ বংশীয় জাররা তিনশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের ন্যায় কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাশিয়ায় ছিল না। গোয়েন্দা পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে জার দেশ শাসন করিতেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়ায় পেঁছাইল তখন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জারের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়িয়া উঠিল। জারের অনেক কর্মচারী ইহাদের হাতে নিহত হইল। দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্থাপিত হইল এবং শাসন-সংস্কার দাবি জানাইল। জার তাহাদের দাবি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি দমনমূলক আইন ও কঠোর নির্যাতন দ্বারা সংস্কার আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করেন। অগণিত দেশভক্তকে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মার্কস্-পন্থী সাম্যবাদী দলটি প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকায় জারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধ্বংস করিতে পারিল না। এই সময় কিন্তু জারের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না ; কুচক্রী রাসপুটিন জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালাইতেছিল। রাজ্য শাসনের

যাহা কিছু ব্যবস্থা সবাই রাসপুটিন করিত। একদিকে এই রাসপুটিন-চালিত দুর্নীতি-অনাচারের পঙ্কিল স্রোত আর একদিকে শাসন-বিশৃঙ্খলার ফলে দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষ-বিদ্রোহের তীব্র বহ্নি জ্বলিতে থাকিল। স্বৈরতন্ত্র অটুট রাখিতে হইলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হইল সুদক্ষ নেতার বা শাসনকর্তার। প্রাক্-বিপ্লব যুগে রাশিয়ায় ইহার চরম অভাব ঘটিল। দ্বিতীয় নিকোলাস ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে ভাল ছিলেন কিন্তু স্বৈরাচারী রুশ-সরকারের প্রধান হইবার কোন যোগ্যতাই তাঁহার ছিল না। ফলে দুর্বলমতি জার ও অশিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী রাসপুটিনের কার্যকলাপ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিল।

এই সময় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত একযোগে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ : জার দ্বিতীয় নিকোলাস বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। এই সব জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তরে বিশেষ তারতম্য ছিল। রুশরা ইউরোপীয় সভ্যতায় যেমন বিশেষ অগ্রসর ছিল তেমনি সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা বর্বর জীবন যাপন করিত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি হাজার রুশ প্রজাদের মধ্যে ১৭ জন অভিজাত, ১২৫ জন ব্যবসায়ী ও শহরবাসী এবং ৮০০ জনের বেশি কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। ভূমিদাস প্রথা তিরোহিত হইলেও যে গ্রাম্য মির বা পঞ্চায়েতের উপর জমির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহা শোষণ ও অত্যাচারের একটি স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয়। কৃষকদের জমি বিক্রয়ের কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা মিরের নিকট বন্দী ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারকে শোচনীয় দুরাবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করিতে দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যে জমির ক্ষুধা খুবই উদগ্র হইয়া উঠে। রাশিয়ার ২৫ লক্ষ কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল শ্রমিকদের অসহনীয় দুরবস্থা। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল বিদেশীরা। ইহারা শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। জারতন্ত্রও শ্রমিকদের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই করে নাই। বরঞ্চ শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশাকে স্থায়ী করাই ছিল জার-শাসিত শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইহার ফলে সহজেই সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

রাশিয়ার নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বেশী ছিল। জারতন্ত্র জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে নাই। ধর্মযাজকরাও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয়। রাশিয়ার সমাজজীবন তাহারা আরও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ রাশিয়ার গণজীবনে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিল।

মানসিক কারণ : রাশিয়ায় বহু পূর্বেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ গণজীবণে গভীরভাবে দেখা দিবার ফলে মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় নতুন চিন্তাধারা

প্রবর্তিত হয়। বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল লোকেদের সম্মিলিত সাধনা রাশিয়ায় এক নতুন যুগের অবতারণা করিয়াছিল। গোগল, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, গর্কি, ডসটয়েভস্কি, প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ অকর্মণ্য ও অযোগ্য স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলকেই ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে ইউরোপের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা অতি হীন। জনসাধারণের এই মনোভাব ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়া রাশিয়ায় রাজনৈতিক প্রচারকার্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রচারকরা তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক বাণী প্রচার করিতে থাকিলেন। লেনিনের প্রবর্তিত রুশ বলশেভিক্ বিপ্লবীদের মুখপত্র সুবিখ্যাত প্রাভদা পত্রিকার অবদানও কম নয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গণ-বিপ্লববাদী পত্রিকাটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বলশেভিক' বিপ্লবীদের মুখপত্র হইলেও রুশ-জনসাধারণের মধ্যে প্রাভদা পত্রিকা পড়িবার প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে যথেচ্ছাচারী জার এবং তাঁহার অনুগত অনুচর দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কিরূপ মনোভাব ছিল।

রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারতন্ত্রের জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতির ফলে রুশ বাহিনীর চরম ক্ষতিস্বীকার ও পরাজয়।

প্রত্যক্ষ কারণঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীকেই মূলত লড়াই করিতে হয়। জার সরকারের চরম অকর্মণ্যতার ও অব্যবস্থার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে দলে দলে রুশ সৈন্য জার্মানদের হাতে নিহত ও বন্দী হইতে থাকিল। জার-সরকার বলপূর্বক লক্ষ লক্ষ রুশ-কৃষককে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করিল। তাহাদের ঠিকমত সামরিক কলা-কৌশল না শিখাইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে। সামরিক প্রশিক্ষণের এবং যুদ্ধের উপকরণের অভাবে তাহারা সুশিক্ষিত জার্মান সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারিল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই রুশ বাহিনীর ১০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হইল। রুশ সৈন্যদের সামনে জার সরকার কোন সুষ্ঠু যুদ্ধনীতি তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। এদিকে কৃষকদের সৈন্য বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করায় দেশে কৃষিকার্য ব্যাহত হইল। ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। জার সরকার সৈন্য বাহিনীর জন্য খাদ্য সংগ্রহেই ব্যস্ত রহিল। রাশিয়ার কলকারখানাগুলিও সামরিক চাহিদা মেটাইতে ব্যস্ত থাকায় দেশে অত্যাবশ্যক পণ্যের খুবই অভাব হইল। ঐ সময় বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হওয়ায় এই অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলি চালাইতে আদেশ করিলে তাহারা সে আদেশ অমান্য করিল, সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিক একজোটে শান্তির দাবি জানাইল। পরিশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটিল তাহার ফলেই জারতন্ত্রের অবসান হইল।

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিক বিক্ষোভ অত্যল্পকাল মধ্যেই বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কুখ্যাত রাসপুটিন পূর্বেই নিহত হইয়াছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রিন্স জর্জ লভব-এর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠিত হইল। সরকারে

বলশেভিক ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ দলগুলির কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যদলের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল না। অথচ তাহারাই বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে। সুতরাং ঐ সরকার যে বেশিদিন টিকিতে পারে না তাহা পূর্বেই বোঝা গেল। এই সময় রাশিয়ায় দুইটি ক্ষমতাকেন্দ্র চোখে পড়ে। একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত সরকার, অপরদিকে সোভিয়েটগুলিতে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতা। বলা বাহুল্য যে সোভিয়েটগুলি ছিল মেহনতী জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি। অতএব দুইটির মধ্যে শ্রেণীসংঘাত প্রবলভাবে দেখা দিল। অস্থায়ী সরকারের নিকট হইতে জনসাধারণ বহু কিছু আশা করিল। কিন্তু সেরূপ কিছুই পাইল না। বরঞ্চ অস্থায়ী সরকার জনস্বার্থবিরোধী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে মনস্থ করিল। মেনশেভিক নেতা কেরেনস্কীকে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করিল।

কেরেনস্কী সরকার :

অস্থায়ী সরকার একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন না করিতে পারায় গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ বিদ্রোহ শুরু করে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকগণও গণবিক্ষোভের পরিকল্পনা লইলেন। ১৮ই জুন (১লা জুলাই) তারিখের বিক্ষোভ অস্থায়ী সরকারকে বিচলিত করিল। অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটিল। ৮ই (২১শে) জুলাই কেরেনস্কী প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং সামরিক সর্বাধিনায়ক হইলেন কর্নিলভ। কেরেনস্কী অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও যুদ্ধনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও যুদ্ধনীতির সহিত বলশেভিকদের মতৈক্য ছিল না। কেরেনস্কী সরকার অগ্রিম সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল এবং শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা লওয়া হইল। ইহার ফলে রুশ বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশে ছেদ পড়িল। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া সরকার ক্ষমতা পাইয়া গৃহযুদ্ধকে আহ্বান জানাইল। স্বভাবতই শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষককুল সক্রিয় হইল এই সরকারের পতন ঘটাইতে। লেনিন এই সময় বলশেভিক নেতা। তিনি ছিলেন অভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে সমাপ্ত করিবার পক্ষপাতী ও যুদ্ধনীতি বিরোধী। সর্বহারাদের শাসন প্রতিষ্ঠা তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। এই অবস্থায় কেরেনস্কী সরকারের সহিত বলশেভিকদের দ্বন্দ্ব অনিবার্যরূপে দেখা ছিল।

মহান অক্টোবর বিপ্লব : লেনিনের নেতৃত্ব : কেরেনস্কী সরকার বলশেভিকদের ধ্বংস করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল বিপ্লবী জনগণের নিকট প্রতিরোধের আহ্বান জানাইল। ফলে প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক লালরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেয়; পেট্রোগ্রাড শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায় নগরের সৈন্যাবাস, বাল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকরা এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা। ফলে কেরেনস্কী সরকার বলশেভিকদের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে পারিল না। কার্যতঃ এই ব্যর্থতা কেরেনস্কী সরকারের দুর্বলতা যেমন প্রকাশ করিয়া দিল অপরদিকে বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা ঘোষণা করিল, বলশেভিক দলের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। গোটা দেশ জুড়িয়া সোভিয়েটগুলিতে বলশেভিক মতবাদ গ্রহণ করার প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। কেরেনস্কী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঘনাইয়া আসিল। ৭ই (২০শে) অক্টোবর ফিনল্যাণ্ড হইতে লেনিন গোপনে পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিলেন। ১০ই (২৩শে) অক্টোবর তিনি বলশেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ঐতিহাসিক বৈঠক পরিচালনা

করেন এবং এই বৈঠকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। ১২ই (২৫শে) অক্টোবর গঠিত হয় পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট সামরিক বিপ্লবী কমিটি। বলশেভিকদের ও বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে দমন করিবার জন্য অস্থায়ী কেরেনস্কী সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে শুরু করে। ২৪শে অক্টোবর (৬ই নভেম্বর) অস্থায়ী সরকার বলশেভিক পত্রিকা প্রাভদা-র প্রকাশ বন্ধ করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হইল। কেরেনস্কী সরকার বিশেষ বাধা দিতে পারিল না। ২৫শে অক্টোবর* (৭ই নভেম্বর) সকাল দশটায় বিপ্লবের বিজয় সম্বন্ধে রুশ অধিবাসীদের প্রতি একটি ঘোষণাপত্র বিপ্লবী কমিটি ঘোষণা করিল। লেনিন লিখিত এই দলিলে বলা হয়—অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখন পেট্রোগ্রাড সর্বহারা ও সৈন্যাবাসের নেতা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েটের বিপ্লবী সামরিক কমিটির হস্তে। যে লক্ষ্যে জনগণ লড়াই করিয়াছেন অতিশীঘ্র গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব, ভূমি বন্দোবস্তে জমিদারির অবসান, উৎপাদনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও সোভিয়েট সরকারের প্রতিষ্ঠা—সে লক্ষ্যের পূরণ সুনিশ্চিত।



লেনিন

নয়া রুশ সরকারের নীতি :

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে দ্বিতীয় অখিল সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন হইল। এই কংগ্রেস শান্তির ডিক্রি ও ভূমির ডিক্রি পাশ করিল। শান্তির ডিক্রিতে সোভিয়েট সরকার ন্যায্য গণতান্ত্রিক শান্তি স্থাপনের জন্য কথাবার্তা চালাইবার প্রস্তাব দেয় সমস্ত যুদ্ধে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলিকে, আর ভূমির ডিক্রিতে জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হয় ; বিনা খেসারতে জমিদারী সম্পত্তি কৃষকদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা হইল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হইল। কংগ্রেস হইতে নির্বাচিত হইল একটি অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং প্রথম সোভিয়েট সরকার গঠিত হইল।

সোভিয়েট শক্তির জয়যাত্রা : পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েটে শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হইতে সমগ্র দেশে সোভিয়েট শক্তির জয়যাত্রা শুরু হইল।

৩রা নভেম্বর (১৬ই) লালরক্ষীরা ক্রেমলিন দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোতে সোভিয়েট শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পর একে একে সমস্ত প্রাদেশিক রাজধানী-

---

* প্রাক্-বিপব যুগে রাশিয়ায় জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে তারিখ গণনা করা হইত। একারণে ২৫শে অক্টোবর গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে ৭ই নভেম্বর। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাম্যবাদী সরকার গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা সমগ্র রাশিয়ায় চালু করেন। ফলে অক্টোবর বিপ্লব নভেম্বর মাসে উদ্যাপিত হইয়া আসিতেছে।

গুলিতে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া বিপ্লব অব্যাহত গতিতে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ট্রান্সককেসাস, মধ্য এশিয়া, কাজাকস্তান ও অন্যান্য অ-রুশ অঞ্চলে সহজে অবশ্য সোভিয়েট শাসন চালু করা যায় নাই। এইসব অনুন্নত অঞ্চল সোভিয়েট শাসন স্থাপনের বিরুদ্ধে বন্য প্রতিরোধ চালায়। নয়া সরকার অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হয় এবং রাশিয়ার জাতি-সমূহের অধিকার বিষয়ে ঘোষণার দ্বারা এই অঞ্চলগুলির জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করে। ফলে এই সব অঞ্চলে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি প্রতিরোধ করিয়া যাইতে থাকে। এইসব প্রতিরোধ লালরক্ষী বাহিনী শ্রমিকদের সাহায্যে চূর্ণ করিয়া দেয়। ১৯১৭'র অক্টোবর আর ১৯১৮'র ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েট-শাসন রাশিয়ার বিপুল ভূখণ্ড জুড়িয়া প্রসারিত হইয়া জয়লাভ করিল। ফলে উক্রেনে, বাল্টিক উপকূল এলাকায়, বেলো-রাশিয়ায়, উত্তর ককেশাস, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হইল।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ : সোভিয়েট শক্তির বিজয় ও সংহতি এবং নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলি এবং রাশিয়ার উৎখাত শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লবী দলগুলির মধ্যে সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রতি এক অহেতুক ঘৃণা ও হিংসা উদ্রেক করে। সোভিয়েট শাসন যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ না করে এবং এই শাসন যাহাতে লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হয় তাহার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চলে। ইহা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য ১৯১৮-তে সোভিয়েট-বিরোধী শক্তিগুলি একটি জোট গড়িয়া তুলে। এই জোটে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিল এবং অভ্যন্তরীণ শ্বেতরক্ষীদের সাহায্য দিতে থাকিল। অসংখ্য বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনগণকে লড়াই করিতে হয়।

প্রথমদিকে বৈদেশিক শক্তিগুলির সহায়তায় অভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লবীরা সোভিয়েট রাশিয়ার এক বিরাট অঞ্চল দখল করিয়া লইল এবং জমিদারি ব্যবস্থা এইসব অঞ্চলে পুনরায় চালু করা হইল। এই সময় সোভিয়েট রাশিয়ায় বেশ কয়টি প্রতিবিপ্লবী সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে সামবায় স্থাপিত শ্বেতরক্ষী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী সরকার, ওমস্কে সাইবেরীয় সরকার, ইয়াকাতেরিনবুর্গে উরাল সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষী সরকারগুলি এ্যাডমিরাল কলচাকের নেতৃত্বে একটি সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং তাহাকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা ছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে একাধিক বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল ভিতরকার ও বাহিরের প্রতিবিপ্লব। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ চলিয়া যায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে।

সোভিয়েট সরকার অবশ্য শত্রুকে প্রতিহত করিবার জন্য সর্বশক্তি ও সম্পদ সংহত করিয়া লড়াইয়ের জন্য পুনর্গঠিত করে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন, দেশকে পরিণত করে একটি সামগ্রিক সশস্ত্র শিবিরে। লেনিন এই সময় ধ্বনি দেন—'সব কিছুই ফ্রণ্টের জন্য'। লেনিনের মহান নেতৃত্বে এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের ও

জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টায় সোভিয়েট রাষ্ট্র এতগুলি বিরোধী শক্তিকে একে একে পরাভূত করিল এবং দেশে সাম্যবাদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অক্টোবর বিপ্লব হইতে গড়িয়া উঠা সোভিয়েট সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো যুদ্ধের দুঃখকষ্ট ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার অবিনাশী শক্তির পরিচয় দিল।

নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রবর্তন ঃ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের মতিগতি দেখিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে লেনিনের সুপ্রসিদ্ধ নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি (New Economic Policy বা N. E. P.) গৃহীত হয়। এই নয়া অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে চাষবাস, ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য রুশ জনসাধারণের ব্যক্তিগত লাভের জন্য অধিকার দেওয়া হইল। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার রহিল সোভিয়েট সরকারের উপর। ইহার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে পরাস্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সৃষ্টি ঃ লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে তাহার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ছিল বলিয়াই বাহিরের ও ভিতরকার অসংখ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে নয়া রুশ সরকার শুধু টিকিয়া রহিল না এই সব শত্রুদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। তবে বুঝা গেল যে নয়া রাষ্ট্রকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হইতে হইলে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে একটি একক রাষ্ট্রীয় ইউনিয়নের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সময় লেনিন নূতন ধরনের একটি রাষ্ট্র, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের নীতির বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেস মস্কোয় বসে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর এবং এই কংগ্রেস সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের ঘোষণাপত্র বিচার ও অনুমোদন করে। ঘোষণায় প্রজাতন্ত্রগুলির মূল নীতি সুস্পষ্টভাবে লেখা হয় ; তাহাদের সমানাধিকার ; বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সহ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভুক্তি ; নূতন প্রজাতন্ত্রকে সদস্য করিয়া লইবার ব্যবস্থাও থাকে। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের চুক্তিটি কংগ্রেস বিচার ও অনুমোদন করে। এই চুক্তিটিতে ঠিক করিয়া দেওয়া হয় ইউনিয়নের আওতায় কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিবে ও রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রপ্রশাসনের উচ্চতর সংস্থাগুলির কাঠামো কি হইবে, তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও বিস্তৃতভাবে বলা হয়। তাহা ছাড়া, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্ব হইবে সমান।

নয়া শাসনতন্ত্র

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল। এগারটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিল। এখন সংখ্যা হইল ১৮টি। প্রতি নগরে ও জেলায় একটি শ্রমিক সভা গঠিত হইল। প্রাদেশিক সভা গঠিত হইল নগর ও জেলার শ্রমিক সভার প্রতিনিধি লইয়া। প্রাদেশিক শ্রমিক সভার প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সভা গঠন করিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমিক সভা দ্বারা কেন্দ্রীয়

কমিটি গঠিত হইল। এই কেন্দ্রীয় কমিটি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করিত। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার মিলনে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র রচিত হইল। এই নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নাম হইল "Union of the Soviet Socialist Republics" সংক্ষেপে U. S. S. R.

রুশ বিপ্লবের প্রভাব ঃ রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম এক নূতন ধরনের সমাজ গড়িয়া উঠিল—এই সমাজে শ্রেণীগত ভেদাভেদ রহিল না। দেশের যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ—সবই হইল সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রকারের শোষকদের শোষণ বন্ধ করিয়া শোষণহীন স্বাধীন মানবসমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইল। রাশিয়ায় এক নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিল। এই সমাজে নিজে পরিশ্রম না করিয়া অপরকে খাটাইয়া অপরের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া, নিজস্ব সম্পত্তির দৌলতে, সেখানে কাহারও আর থাকিবার উপায় রহিল না। ইহার ফলেই শোষণের অবসান ঘটিল। রাশিয়ায় বিপ্লবের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বলিতে হইবে। বিপ্লবের ফলে রাশিয়া মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

রুশ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে রাশিয়ার বিত্তহীন শ্রমিকগণ দেশ-শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করিল এবং তাড়াতাড়ি ধনতান্ত্রিক রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রুশবিপ্লবীগণ সকলেই কার্ল মার্কসের মতের অনুগামী। মার্কসের মতবাদ (সাম্যবাদ) আন্তর্জাতিক মতবাদ। 'শ্রমিকদের কোন দেশ নেই'—মার্কসের এই বাণী সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদিগণ মানিয়া লইলেন এবং ট্রট্স্কি প্রমুখ কয়েকজন নেতা অন্যান্য দেশেও রাশিয়ার মত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করতে থাকেন। ইহার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ কমিনটার্ণ স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি) এক ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা একদিকে রাশিয়াকে শক্তির দ্বারা ধ্বংস করিতে চাহিল ও অন্যদিকে নিজ নিজ দেশে শ্রমিককল্যাণ আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকদের শোষণ সীমিত করিতে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি রাষ্ট্র উগ্র জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করিয়া সাম্যবাদকে ধ্বংস করিতে চাহিল। জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হইল। তবুও একথা স্বীকার্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এশিয়ার শোষিত দেশগুলিতে সাম্যবাদ সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। চীনদেশে সাম্যবাদীদলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং পরবর্তীকালে এই দলই চীন দেশে ক্ষমতা দখল করে। ভারতেও এই সময় কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া, রাশিয়া তাহার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি করিল তাহা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট আদর্শস্থানীয় হইল। পৃথিবীর বহুরাষ্ট্র এবিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিল।

চতুর্দশ অধ্যায় | একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা

শান্তির সম্ভাবনা ঃ লোকার্ণ চুক্তি ও প্যারিস চুক্তি, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা, জাতিসংঘের কার্যাবলী, জাতিসংঘের ব্যর্থতা, ইউরোপে একনায়কতন্ত্রের জয়যাত্রা ঃ যৌথ নিরাপত্তার অবসান, ইটালীতে একনায়কতন্ত্র, মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ নীতি, বৈদেশিক নীতি, জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, হিটলারের ক্ষমতা দখল, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি, ফ্যাসিস্ট প্রভাবে জাপান, স্পেনে গৃহযুদ্ধ এবং একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ; রাশিয়ায় স্ট্যালিনের একক শাসন, মিউনিক চুক্তি; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি।

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিতে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি বজায় ছিল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া এই যুগটিকে শান্তির যুগ বলা যায় না। ইহাকে যুদ্ধবিরতি বা যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগটিতে অবশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায়। ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপে যেখানে মাত্র পাঁচটি সাধারণতন্ত্র ছিল, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সেখানে ষোলটি সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব হইল।

রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ যুগটিতে তিনটি নূতন পরীক্ষা শুরু হইল। কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজম্।

আশা করা গিয়াছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ফলে আর কোন যুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ আগাইয়া যাইবে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মন হইতে যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মুছিয়া গেল এবং তাহারা যুদ্ধবাজ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা ঃ লোকার্ন চুক্তি ও প্যারিস চুক্তি ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যুদ্ধশেষে সন্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রকৃত শান্তি আসে নাই। যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ফ্রান্সের জার্মান-ভীতি নির্মূল হয় নাই। তাই ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য রাইন নদী এবং ইহার সেতুগুলি তাহার অধীনে রাখিবার দাবি জানায়। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গ রাইন সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা ফ্রান্সের হাতে দিতে অস্বীকৃত হইল। ইহার বিনিময়ে স্থির হইল যে রাইন নদীর বাম তীর ১৫ বৎসর যাবৎ মিত্রশক্তির অধিকারে থাকিবে এবং এই অঞ্চলের নিরস্ত্রীকরণ হইবে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিশেষ চুক্তি দ্বারা ঠিক হইল যে বিনাকারণে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ঐ দুই শক্তি তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভার্সাই সন্ধি মানিয়া লইতে রাজী না হওয়ায় ব্রিটেন ও আমেরিকা কর্তৃক ফ্রান্সকে সাহায্য দেওয়ার এই চুক্তি নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইল। ফ্রান্স তাহার প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হইতে বঞ্চিত হইয়া জার্মান-ভীতি দূর করিবার জন্য (ক) সন্ধি-মূলক আত্মরক্ষার অঙ্গীকার এবং (খ) একটি মৈত্রী ব্যবস্থার শরণাপন্ন হইল ; সে জাতিসংঘের নিয়ম-পত্রের আশ্বাসে থাকিতে পারিল না। আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্স বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া,

যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার সহিত সামরিক মৈত্রী স্থাপন করিয়া জার্মানীর চারিদিকে বেড়াজালের সৃষ্টি করিল। ইহাতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না।

জার্মানী নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিল (১৯২২) যে সে ও ফ্রান্স পরস্পরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি দিবে। কিন্তু ফ্রান্স এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

লোকার্ন চুক্তির পটভূমিকা :

এদিকে জার্মানীর আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পক্ষে ভার্সাই চুক্তি মত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ইহাতে ক্রুদ্ধ হয় এবং সে জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র রুর অঞ্চলে দখল করিয়া লয়। ইহাতে কিন্তু ফ্রান্সের কিছু লাভ হয় নাই। জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়াই বন্ধ রাখিল না, সে রুর অঞ্চলের অধিবাসীদের ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে নির্দেশ দিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্মানী উভয়েই তাহাদের অনুসৃত নীতি যে ভুল তাহা বুঝিতে পারে এবং একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। অবশেষে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ সি. জি. ডাওএস (Dawes)-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হইল। এই কমিটির রিপোর্টে রুর অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ, জার্মানীকে বাৎসরিক কত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইবে; এবং তাহাতে কত বৈদেশিক অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী রুর অঞ্চল ফরাসী শাসনমুক্ত হয়। জার্মানীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ পাইয়া ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করে। জার্মানীতে এই সময় স্ট্রেসম্যানের প্রভাব আরম্ভ হয়। তিনি ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে আগ্রহী ছিলেন। ফ্রান্সেও এই সময় র‍্যাডিকাল দল নির্বাচনে জয়ী হয় এবং এই দল মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তির উদ্যোগী হয়। ইংলণ্ডও এই সময় র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে প্রথম শ্রমিক মন্ত্রিসভা শাসনক্ষমতা হস্তগত করে।

এই সকল ঘটনার পটভূমিকায় ইউরোপে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইল। ডাওএস রিপোর্ট কাজে পরিণত হওয়া মাত্র ১৯২৫-এর প্রথম দিকে জার্মান নেতারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে সখ্যবন্ধনের প্রস্তাব করিলেন—ভার্সাই নির্ধারিত জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত লইয়া তাঁহারা আর গণ্ডোগোল করিবে না এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তদনুসারে লোকার্ন শহরে প্রাথমিক আলোচনা বৈঠক বসে এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে লণ্ডনে কতকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিগুলির সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্ন শহরে শুরু হয় বলিয়া এই চুক্তিগুলি লোকার্ন চুক্তি বলিয়া পরিচিত।

শর্তাবলী :

প্রথম চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয় জার্মানী, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের মধ্যে। এই চুক্তি অনুসারে ফরাসী-জার্মান ও জার্মান-বেলজিয়াম সীমানা অপরিবর্তনীয় বলিয়া স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি স্বীকার করিয়া লয়। গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী এই চুক্তিটির জামিনস্বরূপ থাকে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে জার্মানী যদি ফ্রান্স অথবা

বেলজিয়াম আক্রমণ করে তবে ঐ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী যে দেশকে জার্মানী আক্রমণ করিবে তাহাকে সামরিক সাহায্য দান করিবে। আবার জার্মানীর উপর যদি ফ্রান্স বা বেলজিয়াম আক্রমণ করে তবে ইংলণ্ড ও ইটালী জার্মানীকে সামরিক সাহায্য দান করিবে। ইহার পূর্বে যে সকল নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেগুলির দ্বারা কেবলমাত্র ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রথম জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হইল। দ্বিতীয় চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয় জার্মানী এবং পোল্যাণ্ড, জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে। এই চুক্তিপত্রগুলির দ্বারা ঠিক হয় যে, চুক্তিস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবে না, সালিশীর দ্বারা করিবে। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের সহিত চেকোশ্লোভাকিয়ার ও পোল্যাণ্ডের পারস্পরিক অঙ্গীকার চুক্তিগুলি বজায় রাখিবার গ্যারাণ্টি দেওয়া হইল। স্থির হইল যে, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর জার্মানী জাতিসংঘে যোগদান করিবে এবং ইহার কাউন্সিলের একটি স্থায়ী সভ্যপদ লাভ করিবে।

চুক্তিটির তাৎপর্য ঃ

লোকার্ন চুক্তির ফলে অসুবিধা দেখা দিল জার্মানীর পূর্ব-সীমান্ত লইয়া। ইংলণ্ড ও ইটালী যুক্তভাবে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সহিত জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত রেখা অবিচলিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও, পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলায় সে দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত ছিল না। যদিও জার্মানী এই সময় কথা দেয় যে এই দুইটি রাজ্যের সঙ্গেও সকল বিবাদের নিষ্পত্তি সালিশীর সাহায্যে হইবে। তথাপি লোকার্ন চুক্তির শান্তিরক্ষার চেষ্টার অন্তরালে পূর্বদিকে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা থাকিয়া গেল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু সকলে এই চুক্তির ভাল দিকটাই দেখিয়াছিল। তখন ফরাসী ও জার্মান দাবির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া গেল। বৃহৎ শক্তিগুলির গোষ্ঠীতে জার্মানীকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হইল; জাতিসংঘের পরিষদেও জার্মানী সভ্যপদ লাভ করিল। ইহার পর ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সদ্ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। সমগ্র ইউরোপে সেইজন্য একটা আশ্বাস্তির আরাম ছড়াইয়া পড়ে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অস্টিন চেম্বারলেন লোকার্ন চুক্তিকে যুদ্ধকাল এবং ইহার পরবর্তী শান্তিযুগের মধ্যে একটি প্রকৃত সীমারেখা হিসাবে বর্ণনা করিলেন।

প্যারিস চুক্তি (১৯২৮) ঃ জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে অনেক দোষত্রুটি ছিল। প্রথমত, ইহাতে আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। আবার কাহাকে আক্রমণকারী বলা হইবে সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই। তাহাছাড়া যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে এরূপ দাবি সদস্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে জাতিসংঘ করে নাই। বরঞ্চ এ বিষয়ে তাহাদের চিন্তা করিবার সময় দিয়াছিল; জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিপত্রের এই ত্রুটিগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলশ্রুতি কতকটা জেনেভা প্রটোকলে (১৯২৪) দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিসংঘকে শক্তিশালী করিবার জন্য এই প্রটোকলটি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। ইহাতে সকল প্রকারের আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ জাতিসংঘের নিকট সালিশীর জন্য প্রেরণ করার কথা বলা হয়। এই একই সময় অবশ্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামরিক

শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে তাহারও উল্লেখ থাকে। কিন্তু ব্রিটেন প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য এই প্রটোকলটি গৃহীত হয় নাই।

ইহার পর জাতিসংঘের পরিষদে সমস্ত প্রকারের যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই।

কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের বাহিরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যারিস বা কেলাগ-ব্রিঁয়া চুক্তি ১৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে ইউরোপে প্রবল উল্লাস দেখা দেয়। এই চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে ফ্রান্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিঁয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কেলগ-এর অবদান সব চেয়ে বেশি ছিল।

চুক্তিটির দুইটি অনুচ্ছেদ ছিল। প্রথম অনুচ্ছেদটির দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসার জন্য যুদ্ধ শুরু করাকে নিন্দা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যুদ্ধকে ত্যাগ করিতে বলা হয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সকল প্রকার সমস্যার ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই চুক্তিতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে বর্জন করিবার কথা বলা হয় নাই।

এই চুক্তিটিতেও ফাঁক থাকিয়া যায়। প্রথমত, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির বিশেষ দায়িত্বের কথা অনুল্লিখিত থাকে। দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার অধিকার বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহাও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। হিটলার যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, জার্মানী আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্যারিসের শান্তি চুক্তিটির একটি নৈতিক ঘোষণা ছিল একারণে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের সহিত ইহাকে পৃথক্ করা সম্ভব হয় নাই।

সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন না হইলেও প্যারিসের চুক্তি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইহা ছিল প্রায় সমস্ত বিশ্বের গ্রহণযোগ্য প্রথম রাজনৈতিক চুক্তি। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে শুরু করিয়া বিশ্বের ৬৫টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বনের মুখোশ পরিয়া এই চুক্তি লঙ্ঘন করিল এবং জাতিসংঘের সদস্যপদে ইস্তফা দিল। পরে ইটালী ও জার্মানী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অজুহাতে এই চুক্তি লঙ্ঘন করিল।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা ঃ জাতিসংঘ স্থাপিত হইবার সময়ে ইহার চুক্তিপত্রে বলা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করিবে। ভার্সাই সন্ধিতে পরাভূত রাষ্ট্রগুলিকে নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য করা হইলেও প্রধান প্রধান বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি এ সম্বন্ধে নিজেরা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিল না।

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণের জন্য ছয়বার বৈঠক বসে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা দেয়। সদস্যগণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা পেশ করিতে থাকে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ও রেষারেষি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে বাধাস্বরূপ হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন নিরস্ত্রীকরণ

সম্মেলনের শেষ বৈঠক বসে। ইহার পর বৃহৎ শক্তিগুলি অস্ত্রসজ্জা দ্রুততর করিতে শুরু করে। ফলে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আর কিছুই করিতে পারিল না।

জাতিসংঘের বাহিরেও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল। নৌশক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। প্রথমে ওয়াশিংটনে এক বৈঠক বসে (১৯২২)। এই বৈঠকের ফলে যে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল তাহা কার্যকর হয় নাই। ফ্রান্সের অনমনীয় মনোভাব ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। জেনেভায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং লণ্ডনে (১৯৩০) যে নৌ-সম্মেলন বসে সে দুইটিও নৌশক্তি হ্রাস করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা বিলীন হইয়া যায়।

জাতিসংঘের অপরাপর কার্যাবলীঃ জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা। এই সংঘ কুড়ি বৎসরে প্রায় চল্লিশটি ছোটবড় রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে সক্ষম হয়। যেমন, ইরাক-তুরস্ক, গ্রীক-বুলগেরিয়া, ইটালী-গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড-রাশিয়া, পোল্যাণ্ড-লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরী-রুমানিয়ার সীমান্ত প্রভৃতি বিষয় লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল সেগুলির মীমাংসা জাতিসংঘ ভালভাবেই করে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘ বিশেষ চেষ্টা করে। পরাজিত দেশগুলির উপনিবেশগুলির সুশাসনের জন্য জাতিসংঘের ম্যানডেট কমিশন প্রভৃত কাজ করিয়াছিল। পনের বৎসর ধরিয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী সার (Saar) অঞ্চল জাতিসংঘ সুষ্ঠুভাবে শাসন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের লইয়া কতকগুলি কমিটি গঠিত হয়। দুর্গত অস্ট্রিয়াকে জাতিসংঘের চেষ্টাতেই অর্থ সাহায্যের দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা হয়। হাঙ্গেরীও অনুরূপ সাহায্য পায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা আলোচিত হয়; বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যও জাতিসংঘ তৎপর ছিল। ক্রীতদাস প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার জন্য জেনেভাতে একটি সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া শিশুদের ও নারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা করে। জাতিসংঘের আর্থিক সাহায্যের ফলে দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়িয়া উঠে। একটি হইতেছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয় (The permanent court of International Justice)। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রথমটি এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় সংস্থাটি গঠিত হয়।

১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতিসংঘ সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই সময়ে ইহার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়।

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণঃ শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের

ইতিহাস কিন্তু অতীব বেদনাদায়ক। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘ তাহার মূল লক্ষ্যে পেঁছাইতে পারে নাই।

জাতিসংঘের শাসনতন্ত্রেই ইহার ব্যর্থতার বীজ লুক্কায়িত ছিল এবং এই শাসনতন্ত্রে আমরা তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখিতে পাই। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইবার সময় কাউন্সিল বা পরিষদে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন হইত। ইহা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তাহা ছাড়া যে সকল বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হইত সে সব বিষয়েও কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে হইলে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হইত ; কারণ সংঘের নিজস্ব কোন সামরিক শক্তি ছিল না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উগ্র জাতীয়তাবোধ থাকার জন্য জাতিসংঘের ক্ষমতা বৃদ্ধি তাহারা পছন্দ করিল না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলি সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিতেছে না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইটালীর আবিসিনিয়া অধিকার, জার্মানীর ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন, জাতিসংঘ প্রতিহত করিতে চাহিলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতির ফলে তাহা সম্ভব হইল না। প্রথম হইতেই যদি জার্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার অভাবেই জাতিসংঘের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

ইউরোপে একনায়কতন্ত্রের জয়যাত্রা ঃ যৌথ নিরাপত্তার অবসান ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সমগ্র ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ইহার কোন সুরাহা করা সম্ভবপর হইল না। ফলে একে একে ইটালী, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, গ্রীস, বুলগেরিয়া, স্পেন ও পর্তুগালে ডিক্টেটরী বা একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় সোভিয়েট রাশিয়াতে যোশেফ স্টালিন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। একনায়কগণ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জঙ্গীবাদ গ্রহণ করায় যৌথ নিরাপত্তার অবসান ঘটে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ইহা বুঝা যায়। তিনি এই ঘোষণায় উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘ বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিবে এইরূপ আশ্বাস বা উৎসাহ দেওয়া ভুল। ইহার পর যৌথ নিরাপত্তা বলিয়া কিছু রহিল না।

ইটালীতে একনায়কতন্ত্র ঃ মুসোলিনীর শাসনকাল ঃ ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল জার্মান ভীতির জন্য নহে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে কিছু রাজ্যাংশ পাইবার জন্য। যুদ্ধ শেষে যদিও ইটালী অনেক নূতন জায়গা পাইয়াছিল কিন্তু তাহার পাইবার আশা আরও বেশি থাকায় ইটালী যুদ্ধের শেষে অতৃপ্ত দেশে পরিগণিত হয়। ইটালীতে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইটালীবাসীরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান কখনো ছিল না। যুদ্ধোত্তর ইটালীতে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বলিয়া কিছুই রহিল না। একটির পর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে থাকিল। নূতন মন্ত্রিসভা দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। দেশে খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে

খণ্ডযুদ্ধ, ধর্মঘট ইত্যাদি দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইল। রাজনৈতিক সাম্য, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারায় জনসাধারণের মধ্যে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রে অবিশ্বাস প্রকট হয়। সমাজতন্ত্রী দল ইটালীতে রাশিয়ার মত সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হয়। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেনিটো মুসোলিনী একটি ফ্যাসীদল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এক কালোকোর্তা বাহিনী গঠন করেন। ইটালীর যুবকবৃন্দ দলে দলে তাঁহার কালোকোর্তা বাহিনীতে যোগদান করিয়া ফ্যাসীদলের সক্রিয় সদস্য হয়। মুসোলিনীর ফ্যাসীদল প্রথমে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তাহাদের সভা বা অন্যান্য কার্যকলাপ পণ্ড করাই প্রথমে ফ্যাসীদলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সমাজতন্ত্রীরা মিলান প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রিক শহরে সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করিলে ফ্যাসীদল ঐ সকল হরতাল ভাঙিয়া দিতে সক্ষম হয়। এইভাবে ফ্যাসীদল ইটালীর পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করে। ফলে তাহাদের ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পায়। ফ্যাসীদল একে একে ইটালীতে সমস্ত সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি দখল করে। ইহার পর ১৯২২ সালে মুসোলিনী সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গোদের লইয়া রোমে গিয়া জোরপূর্বক ক্ষমতা হস্তগত করেন। ইটালীর রাজা মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল মানিয়া লইলেন এবং মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। মুসোলিনী নামে প্রধানমন্ত্রী হইলেও আসলে তিনি ইটালীর সর্বেসর্বা হইলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইটালীর নবযুগ আরম্ভ হইল।



মুসোলিনী

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ নীতিঃ মুসোলিনী প্রবর্তিত ফ্যাসীবাদ প্রধানতঃ চারিটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—(ক) রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা ; রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা ; (খ) ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের কোন স্থান নাই ; (গ) ইহা সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তিরক্ষা রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। মার্কসবাদের সব কিছুই ইহা ভ্রান্ত ও প্রমাদ বলিয়া মনে করে এবং শ্রমিকদের সাম্যবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাতি-মাহাত্ম্যের উপর জোর দেওয়া হয়। (ঘ) ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল না। মুসোলিনী বলিতেন, "শাসনকার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তির সন্ধান করা উচিত ; তাঁহাকে কর্তৃত্ব ও শ্রদ্ধার উচ্চতম বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ;"

মুসোলিনী উপরিউক্ত নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। ইহাতে শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি

পায়। কয়েক বৎসর পর তিনি পার্লামেণ্ট তুলিয়া দেন এবং নিজে ডুসে (Duce) পদবীগ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি ধ্বংস করা হয়। ফ্যাসীদল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কলকারখানায় ধর্মঘট ও কাজ বন্ধ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকার তুলিয়া দিয়া শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত গুণের উপর ভোটাধিকার নির্ধারিত করেন। ইটালীর বৈষয়িক উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইল। ইহাতে দেশের কৃষি ও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয়। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী পোপের সহিত বহুদিনের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইল। ইহার ফলে মুসোলিনী ধর্মযাজকদের সমর্থন লাভ করেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ মুসোলিনী শান্তিবাদকে অস্বীকার করিতেন। সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ফ্যাসী রাষ্ট্রের চরম ও পরম কাম্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইটালীকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা, ইটালীর উপনিবেশের পরিধির বিস্তার ঘটান এবং ভূমধ্যসাগরকে ইটালীর হ্রদে পরিণত করা। এই সকল উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সকল প্রকার সামরিক শক্তির বৃদ্ধি সাধন করেন। প্রথম দিকে মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি ছিল ফরাসী ও যুগোশ্লাভিয়া বিরোধী। তাঁহার ফরাসী বিরোধী নীতি গ্রহণ করিবার কয়েকটি কারণও ছিল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স এমন কতকগুলি স্থান দখল করিয়াছিল যেগুলি ইটালীর প্রাপ্য বলিয়া মুসোলিনী মনে করিতেন। ইহা ছাড়া পূর্ব ইউরোপে দানিয়ুব-তীরবর্তী দেশসমূহে প্রভাব বিস্তারের জন্য ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই অঞ্চলে মুসোলিনী কয়েকটি রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ ঘটে নাই। বরঞ্চ জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানে ইটালী ও ফ্রান্সের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক হইতে দেখা যায়। অবশ্য এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মুসোলিনী আফ্রিকাকে ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। স্বভাবতই তিনি এদিকে নজর দিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দেশটি ইটালী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। জাতিসংঘ ইহার সমালোচনা করিলে ইটালী জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে। আবিসিনীয় যুদ্ধের পর ইটালীর সহিত জার্মানীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। সোভিয়েট রাশিয়া বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রসারের জন্য কমিণ্টার্ন নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করেন। ফলে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি সম্পূর্ণ হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের অব্যবহিত পরই মুসোলিনী ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে সফলতা লাভ করিলেও ইটালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। মুসোলিনীর দেশবাসীরাই তাঁহাকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে।

জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানী পরাজিত ও লাঞ্ছিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাহার ভৌমিক অখণ্ডতা নষ্ট হয়; উপনিবেশ বলিয়া কিছুই থাকে না, সামরিক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর ঋণের ভার তাহার উপর বর্তায়। জার্মানী রাজনৈতিক গণ্ডগোলের শ্রেষ্ঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন ত্যাগ করিলে তথাকথিত ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেডারিক ইবার্ট এবং ফিলিপ শিডাম্যান নূতন সরকার পরিচালনার ভার পান। জার্মানীতে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনটি এক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব বলিয়া কিছু ঘটে নাই। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি জার্মানীতে রাজনৈতিক পরিবর্তন দাবি করিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়; জার্মান জনসাধারণ এই পরিবর্তন চাহে নাই। তাহারা প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসীও ছিল না। এই কারণে জার্মানীতে অচল অবস্থা রহিয়া যায় এবং নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিতে থাকে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঃ ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানীর উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়। তাহার ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কলকারখানার উৎপাদন একেবারে কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া ফ্রান্স জার্মানীর শিল্পকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র রুর অঞ্চল ক্ষতিপূরণ বাবদ জোর করিয়া দখল করে। ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও রুর অঞ্চল দখলের ফলে ও অন্যান্য কারণে জার্মানীতে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রজাতান্ত্রিক সরকার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ লইয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করিলেও ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দার হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারে নাই। ঠিক এই সময়েই প্রজাতন্ত্র-বিরোধী নাৎসী দলের নেতা অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতা দখল করিতে উদ্যত হন। জনসাধারণকে, বিশেষ করিয়া যুবক সম্প্রদায়কে তিনি আশার কথা শুনাইলেন।

হিটলারের ক্ষমতা দখল ঃ হিটলার জার্মানীর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া 'নাৎসী' দল গড়িয়া তোলেন এবং মুসোলিনীর কালকোর্তা বাহিনীর অনুকরণে একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করেন। জার্মান যুবক সম্প্রদায় ইহাতে দলে দলে যোগ দেয়। মুসোলিনী অপেক্ষা হিটলারের সংগঠনী প্রতিভা অনেক বেশি ছিল। তিনি তাঁহার দলের রীতিনীতি ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত করেন। স্বস্তিকা চিহ্নকে দলের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই সময় হিটলারের 'যুবসংঘ' বলিয়া একটি বিশিষ্ট সংঘ স্থাপিত হয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকবৃন্দই হিটলারের যুব-আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ ছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী দল রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং হিটলার প্রধান মন্ত্রীরূপে



হিটলার

নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদেরই একটি সংস্করণ। জাতি এবং রাষ্ট্রই সব কিছু। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু নাই। জার্মান রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সকল ব্যক্তি ও সংঘের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। নাৎসীবাদ নেতৃপূজা ও জাতিপূজা পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং জঙ্গীবাদের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ। মানুষের জীবনে যুদ্ধই প্রাণশক্তি ; এবং জার্মান জাতিই প্রকৃত আর্য জাতি এই ছিল নাৎসীবাদের অন্যতম দুইটি প্রধান মূলমন্ত্র। ফ্যাসীবাদের ন্যায় নাৎসীবাদও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের কঠোর সমালোচক ও শত্রু ছিল।

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরই জার্মানীর শাসনতন্ত্রে এক বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসেন। এই পরিবর্তনগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

সাংবিধানিক পরিবর্তন ঃ পূর্বেকার জার্মান রাজ্যগুলিকে নামে মাত্র রাখা হইল। তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল। ইহার ফলে জার্মানী যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রকৃতপক্ষে হইল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত।

শাসনতান্ত্রিক ঃ সরকারী কর্মচারী আইন দ্বারা (১৯৩৪) জার্মান ভিন্ন অন্যান্য কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করিতে বলা হইল। এই আইন বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ফলে নাৎসী শাসনের বিরোধিতা করিবার জন্য কেহ রহিল না।

বিচার সম্বন্ধীয় ঃ বিচার ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হইল। বলা হইল রাষ্ট্র এবং নাৎসী শাসন আইনকে যেমনভাবে ব্যাখ্যা করিবে তাই আইনের সঠিক ব্যাখ্যা বলিয়া ধরা হইবে। জনতা বিচারালয় (People's Court) বলিয়া এক প্রকারের নূতন বিচারালয় স্থাপন করা হইল। এই শ্রেণীর বিচারালয়ের কাজ হইল রাষ্ট্রবিরোধী এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপের সত্বর বিচার করা।

রাজনৈতিক ঃ জার্মানীতে নাৎসী দলই একমাত্র রাজনৈতিক দল রূপে পরিগণিত হইল। অন্যান্য দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হইল।

জাতিগত ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হিটলার তথা নাৎসীদল জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার প্রসারে পঞ্চমুখ ছিল। জার্মানদের এই জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য নাৎসী সরকার জার্মানীতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে। বিশেষ করিয়া ইহুদীদের উপর অত্যাচার চরমে পেঁছায়। লক্ষ লক্ষ ইহুদী প্রাণভয়ে জার্মানী হইতে পলায়ন করে, আর যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না তাহাদের অধিকাংশই বন্দিশিবিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

শ্রমিক সম্বন্ধীয় ঃ শ্রমিক সংস্থাগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। নাৎসীদলের অঙ্গ হিসাবে নাৎসী শ্রমিক ফ্রন্ট খোলা হয়। ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধ রাখা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। শ্রমিকদের উন্নতির জন্য নাৎসী সরকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ছিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই নীতির সুফল পাওয়া যায়। জার্মানী হইতে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়। দেশের উন্নতির জন্য জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

হিটলার তথা নাৎসী সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। দেশকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলে। কারণ, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, পরনির্ভরশীলতা পূর্বে হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সময় জার্মানীর শিল্পোন্নতিও চরমভাবে দেখা যায়। জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় জার্মানীর কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে থাকে যেগুলির চাহিদা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রভুত পরিমাণে দেখা দেয়। ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ়তর হয়।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি : হিটলারের সকল চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বে ; ভবিষ্যতে বিশ্ব শাসনের দায়িত্ব জার্মানীর উপর যে ন্যস্ত হইবে সে বিষয়ে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাহার আত্মজীবনীতে (Mein Kampf) তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন—তদানীন্তন জার্মান রাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থিত জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করা (Third Reich) হিটলারের একান্ত প্রয়োজন বলিয়া দাবি করিতেন। হিটলারের জোরদার বৈদেশিক নীতির আর একটি দিক হইল ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলি ভঙ্গ করা এবং ভার্সাই সন্ধির মারাত্মক সমালোচনা করা। হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই কিন্তু আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ তিনি উদ্দেশ্যমূলক শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্রনীতির কার্যকর রূপ : হিটলার প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে জার্মান প্রতিনিধিদের দেশে ফিরিতে আদেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অস্ত্রসজ্জার কথা ঘোষণা করেন। জার্মানী জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ইউরোপে যখন আবিসিনিয়া লইয়া গণ্ডগোল চলিতেছিল সেই সুযোগে হিটলারের সৈন্যবাহিনী রাইন অঞ্চল দখল করিয়া বসিল (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস) এই ভাবে হিটলার ভার্সাই চুক্তি এবং লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গ করিলেন। হিটলার বুঝিলেন যে তাঁহার পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করিতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন। ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের ফলে এইরূপ একটি সুযোগ আসিল। কারণ ইটালী আবিসিনিয়া দখলের ফলে ইটালীর সহিত গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইটালী আবিসিনিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় হিটলার অস্ট্রিয়ায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে অস্ট্রিয়া একটি জার্মান রাজ্য (German State) বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিল এবং জার্মানী অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেন। ইহার ফলেও জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্কের আরও উন্নতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দুই দেশ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অক্টোবর প্রটোকল' নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট-বিরোধী এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীও এই চুক্তিটি গ্রহণ করে। বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষশক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরিয়া বিশ্বের রাজনীতিতে স্থির বিন্দুরূপে থাকিয়া যায়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য নির্লজ্জ আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিলেন। নানা অজুহাতে তিনি অস্ট্রিয়া দখল করিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার পর সুদেতেন অঞ্চল লইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত হিটলার বিবাদ শুরু করেন। এই অঞ্চলে বহু জার্মান ভাষা-ভাষী লোক বাস করিত; ইহাদের সংখ্যা ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। চেকসরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করিলেও হিটলার ও নাৎসী দলের প্ররোচনায় ইহারা জার্মানীর সহিত যুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় মিউনিক চুক্তি হইল; চেক সরকার হিটলারকে সুদেতেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলার জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইহাতে কিন্তু হিটলারের রাজ্যগ্রাস লিপ্সার নিবৃত্তি ঘটিল না; বরঞ্চ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি লিথুয়ানিয়াকে মেমেল শহর সমেত অঞ্চলটি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ক্ষুদ্র লিথুয়ানিয়া হিটলারের আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইল না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট ড্যানজিগ বন্দর ও সন্নিহিত অঞ্চল দাবি করিলেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইতিমধ্যে বুঝিয়াছিল যে তোষণ-নীতি দ্বারা হিটলারের পররাজ্য গ্রাস করিবার তৃষ্ণা দূর করা যাইবে না। তাহারা ঘোষণা করিল যে জার্মানী যদি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্র ঐ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।

রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি

হিটলার তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের জন্য সাময়িক ভাবে রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নও আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীর সহিত চুক্তি করিতে মনস্থ করে। কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতির ফলে হিটলার একের পর এক অঞ্চল দখল করিতেছিলেন। স্টালিন বুঝিলেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। হিটলার এই সুযোগে রাশিয়ার সহিত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিয়া বসিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ফ্যাসিস্ট্-প্রভাবে জাপান: ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ জাপানের এই আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিবাদ করিলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপান জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে। এই বছরেই চীনের জেহল নামক প্রদেশটি দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে চীনের বিস্তৃত উপকূলভাগে প্রভাব বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়। জাপানের এই আক্রমণাত্মক কার্যে সমগ্র চীনদেশে এক প্রবল জাপ-বিরোধ মনোভাব দেখা দেয় এবং চীনারা জাপানী পণ্য বর্জন করে। ইহাতে জাপান আরও ক্রোধান্বিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক একটি নীতি-নির্ধারক ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাটি টানাকা মেমোরিয়ালের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা চীনের উপর জাপান সর্বময় কর্তৃত্ব

দাবী করে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত চীনের সম্পর্ক জাপান নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সময় অবশ্য জাপান তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ইহাকে এশিয়ার নূতন ব্যবস্থা (New Order) বলিয়া বলা হয়। ইহার দ্বারা জাপান এশিয়াকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির শোষণ হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' বলিয়া ঘোষণা করিল।

এশিয়ায় নূতন ব্যবস্থা

এই নূতন ব্যবস্থায় এশিয়ার পরাধীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে জাপানের প্রতি শ্রদ্ধাই জাগরূক হইবার কথা কিন্তু জাপানের সম্প্রসারণ নীতি শীঘ্রই প্রমাণ করিল যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বদলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করাই জাপানের উদ্দেশ্য। 'নূতন ব্যবস্থায়' জাপানই মধ্যমণি হিসাবে থাকিবে, আর অন্য রাষ্ট্রগুলি তাহার তল্পিবাহকের কাজ করিবে। এই কারণে জাপানের বহুল প্রচারিত নূতন ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রই বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। ইহার ফলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের মূল ভূখণ্ড অধিকার করিবার জন্য বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় চীন আক্রমণ করিল। প্রথমে জাপান চীনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে কিন্তু চীনরা বারংবার পরাজিত হইয়াও জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই অঘোষিত যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল। চীন জয় করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই চীন ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। অবশ্য আমেরিকা চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে যথেষ্ট সাহায্য করে। জাপান সাম্যবাদী রাশিয়াকে প্রথম হইতেই সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে এবং সাম্যবাদী রাশিয়াকেই তাহার প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান জার্মানীর সহিত কমিণ্টার্ন-বিরোধী (Anti-Comintern Pact) চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান সম্পর্কে বিশেষ অবনতি দেখা যায়। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার অধিকার ও মাঞ্চুকো ও মোঙ্গলীয় সীমান্ত লইয়া উভয়ের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। চীনের উপর কর্তৃত্ব লইয়াও জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। এই কারণে জার্মানী রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিলে জাপান জার্মানীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে ১৯৩৬-৩৭-এর কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে ফাটল ধরিবার উপক্রম দেখা দেয়। এই সময় জাপান ঘোষণা করে যে, সে এখন হইতে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিবে। এইজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জাপান নিরপেক্ষ থাকে।

স্পেনে গৃহযুদ্ধ এবং একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব : ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় স্পেন ছিল খুবই অনুন্নত দেশ। রাজনৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে স্পেনে গণতন্ত্র বলিয়া কিছুই ছিল না। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ধনীদের অত্যাচার এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের মধ্যে আত্মকলহ—ইহাই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধের পূর্বেকার স্পেনের ইতিহাস।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রী সরকার সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তখন দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং পরিশেষে বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়

মরক্কোর সৈন্যদলের সেনাপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো, সরকারের বিরুদ্ধে এক সামরিক উত্থান ঘটাইয়া স্পেনের মূল ভূখণ্ডে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি স্পেনের পশ্চিম অঞ্চল দখল করিয়া রাজধানী মাদ্রিদের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেশের মধ্যে ফ্রাঙ্কোর প্রধান সহায় ছিল জমিদারবর্গ এবং ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়। প্রথম হইতেই ফ্রাঙ্কো ইটালীর সাহায্য পাইলেন, জার্মানীও সমরাস্ত্র দিয়া সাহায্য করিল। জার্মানী ও ইটালী স্পেনের গৃহযুদ্ধটিকে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সংগ্রাম বলিয়া ধরিয়া লয় এবং ফ্যাসিবাদ যাহাতে জয়ী হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইল। সোভিয়েট রাশিয়া প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানাইল। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শাসকদল এই গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও এই দুই দেশের প্রগতিবাদী যুবকগণ স্বেচ্ছাসৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়া এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করিয়াছিল। স্পেনে প্রায় তিন বৎসর লড়াই চলিবার পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো পূর্ণ জয়লাভ করেন। ফলে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার দলের নাম হইল ফ্যালাঞ্জ; তিনি 'কডিলো' বা নেতা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সমস্ত শাসন বিভাগের উপর তাঁহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

রাশিয়ায় স্টালিনের একক শাসন ঃ লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার অনুচরদের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই অনুচরদের মধ্যে একদলের নেতৃত্ব করেন স্টালিন এবং অন্যদলের ট্রট্স্কি। পরিশেষে স্টালিন বিজয়ী হন এবং ট্রট্স্কি প্রাণ লইয়া দেশ হইতে পলায়ন করেন। ট্রট্স্কির সমর্থকদের প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়। ইহার পর কিছুদিন স্টালিনের বিরোধিতা করিবার মত আর সেরূপ কেহই রহিল না। স্টালিন একাধারে কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পাইয়া স্টালিন রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।



স্টালিন

স্টালিন রাশিয়ায় অপ্রতিহত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি খুবই সন্দিগ্ধপরায়ণ হইয়া পড়েন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্দেহের বশবর্তী হইয়া জিনোভিয়েভ্, কামেনভ ও আরও পাঁচজন কমিউনিষ্ট নেতাদের রাষ্ট্রবিরোধী (স্টালিন বিরোধী ?) কার্যকলাপের জন্য বিচারের প্রহসন করিয়া হত্যা করা হয়। স্টালিনের হাত হইতে সামরিক বাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপতিগণও রেহাই পান নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিছক সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকজন প্রকৃত সাম্যবাদী দলের নেতা এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়। এগুলিকে ইংরেজী ভাষায় 'purge' বলা হয়। নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখিবার জন্য

স্টালিন মাঝে মাঝেই এরূপ "পার্জের" আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্টালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রাশিয়ায় তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। এদিক হইতে হিটলার ও মুসোলিনী অপেক্ষা তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কম ছিল না। অনেকে মনে করেন স্টালিন এরূপ নীতি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র স্থাপনের ইতিহাসে স্টালিনের অবদান কেহই অস্বীকার করেন না। তবে দেশ শাসনে তিনি যেরূপ ডিক্টেটরী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং রুশ জনসাধারণকে ব্যক্তি পূজায় (স্টালিন পূজায়) বাধ্য করিয়াছিলেন তাহা কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না।

বৈদেশিক নীতিতে স্টালিন বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসেন। কারণ হিটলার রাশিয়াকেই তাঁহার প্রধান শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্টালিন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি, অনাক্রমণ-চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদিত করেন। রাশিয়া জাতিসংঘেও যোগ দেয়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দিয়া রাশিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আবেদন জানায় এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারও জনসাধারণকে সর্বদা সজাগ থাকিতে বলে। কিন্তু রাশিয়ার এই চেষ্টা সার্থক হয় নাই। কারণ গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখিত। এমন কি তাহারা জার্মানী, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপে কোনরূপ বাধা না দিয়া তোষণনীতির দ্বারা ইউরোপে শান্তি বজায় রাখিতে চাহিল। সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পেঁছাইল। ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি হিটলার ও মুসোলিনীকে শক্তিমত্তায় ও দিগ্বিজয়ে প্রলুব্ধ করিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমষ্টিগত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল। কিন্তু স্টালিন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত করিয়া এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটাইলেন।

নেভিল চেম্বারলেন ও এদুয়ার্দ দালাদিয়েরঃ আর্থার নেভিল চেম্বারলেন ছিলেন ব্রিটেনের বিখ্যাত চেম্বারলেন পরিবারের সদস্য। তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁহার ভ্রাতা অস্টিন চেম্বারলেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে লোকার্ন সন্ধি স্বাক্ষর করেন। অস্টিন চেম্বারলেন যেমন শান্তিবাদী ছিলেন, নেভিল চেম্বারলেনও বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। তবে নেভিল চেম্বারলেন তোষণ নীতির দ্বারা এই শান্তি রক্ষা করা যাইবে বলিয়া মনে করিতেন। একারণে হিটলার যখন ইউরোপে একটির পর একটি দেশ গ্রাস করিতেছিলেন তখনও নেভিল চেম্বারলেন সামরিক শক্তির দ্বারা হিটলারকে প্রতিরোধ করিতে হইবে বলিয়া মনে করেন নাই। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে হিটলার রণং দেহি মূর্তি ধারণ করিবার ফলে, ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হইতে পারে এই আশঙ্কায় নেভিল চেম্বারলেন খুবই উদ্বিগ্ন হন। এই ব্যাপারে অবশ্য তিনি একা ছিলেন না ; ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার্দ দালাদিয়েরকে, যিনি মুখে তোষণ নীতির বিরোধী ছিলেন ; সঙ্গী পান। তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হন এবং রুশবিরোধী নীতি অনুসরণ করেন।

একারণে তিনিও চেম্বারলেনের ন্যায় হিটলারের নীতির নিষ্ক্রিয় সমর্থক হন। তাঁহাদের ধারণা ছিল তোষণ নীতির দ্বারা একদিকে যেমন যুদ্ধকে পরিহার করা যাইবে, অপরদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে কাজে লাগান সম্ভব হইবে। উভয়েই অবশ্য তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন। যখন হিটলার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়া পোল্যাণ্ডের নিকট ড্যানজিগ শহর ও পোলিস কোরিডর দাবি করিলেন, চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের তখন তোষণ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। নেভিল চেম্বারলেন ও এদুয়ার্দ দালাদিয়ের-এর হিটলারের প্রতি তোষণ-নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এই নীতি পুরাপুরি কাজে লাগান হয় নাই। এই নীতির একটা ভাল দিক অবশ্য ছিল। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ চাহে না, তাহারা যুদ্ধ পরিহার করিতেই চাহে।

মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮): যুদ্ধের পথে ইউরোপ: হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দখলের চেষ্টা আরম্ভ করেন। সুদেতেন অঞ্চলের অধিবাসিগণ অধিকাংশই জাতিতে ছিলেন জার্মান। সুতরাং হিটলারের মতে ঐ অঞ্চলটি জার্মানীর সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। তিনি তাঁহার প্রচার দপ্তরদ্বারা চেক-সরকার কর্তৃক সুদেতেন জার্মানদের উপর তথাকথিত অত্যাচারের কথা ঘোষণা করিতে থাকেন এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের-সুদেতেন অঞ্চলকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবি জানাইবার জন্য প্ররোচিত করেন। হিটলার চেকোশ্লাভাকিয়ার সীমান্তে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিবারও নির্দেশ দেন। একদিকে ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া এ ব্যাপারে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় ইউরোপে এক বড় রকমের যুদ্ধ শুরু হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর সুদেতেন অঞ্চলের জার্মানগণ চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জার্মানীতে চেক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়িয়া উঠে। চেক সরকার সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন। হিটলারও যুদ্ধের হুমকি দেন। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চেকোশ্লোভাক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব রাখেন। চেম্বারলেনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হিটলার ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বানে রাজী হন। ইতিমধ্যে হিটলারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স একটি যুক্ত প্রস্তাবে চেক সরকারকে সুদেতেন অঞ্চলটি জার্মানীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানায়। চেক-সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু হিটলার ১লা অক্টোবরের পূর্বেই সুদেতেন অঞ্চলটি যাহাতে জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার জন্য দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার ইহার বিরোধিতা করিলে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ফরাসী সরকার প্রস্তাব করে যে ১লা অক্টোবরের পূর্বেই সুদেতেন অঞ্চলের কিছু অংশ জার্মানীকে দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ ১০ই অক্টোবরের পূর্বেই জার্মানী পাইবে। মুসোলিনীর অনুরোধক্রমে হিটলার এই প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হন এবং মিউনিকে ২৮শে সেপ্টেম্বর এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে হিটলার, নেভিল চেম্বারলেন, মুসোলিনী এবং দালাদিয়ের উপস্থিত ছিলেন। চেকোশ্লাভাকিয়ার কোন প্রতিনিধিকে

এই বৈঠকে আসন গ্রহণ করিতে বলা হইল না। সোভিয়েট রাশিয়াকেও বাদ দেওয়া হইল। এই সম্মেলনের ফলে ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাকেই মিউনিক চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তিতে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীকে দেওয়া হইল।

তাৎপর্য

মিউনিক চুক্তির ফলে হিটলার অচিরেই আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে আরও উৎসাহী হইলেন। যদিও তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশ দখল করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করা। তাহা প্রমাণিত হইল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ, যখন হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়া লইলেন। একারণে বলা যায় যে মিউনিক চুক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে এক কূটনৈতিক পরাজয়। এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে যেমন রক্ষা করা যায় নাই, অপরদিকে ইউরোপে যুদ্ধ রোধ করাও সম্ভব হয় নাই।

যুদ্ধের পথে ইউরোপ

চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিবার পর হিটলার লিথুনিয়াকে মেমেল প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। ইহার পরে তিনি পোল্যান্ডকে ড্যানজিগ শহর ফিরাইয়া দিতে বলিলেন এবং জার্মানী ও ড্যানজিগের মধ্যে যোগাযোগ-পথের অধিকারও দাবি করিলেন। এইবার ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিঃশব্দে হিটলারের দস্যুতা মানিয়া লইল না। উভয় রাষ্ট্রই জার্মানীকে জানাইয়া দিল যে, পোল্যান্ড আক্রান্ত হইলে তাহারা উহাকে সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে হিটলার কূটনৈতিক চাল চালিয়া রাশিয়ার সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিলেন। রাশিয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া হিটলার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই পোল্যান্ড আক্রমণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও কারণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, বলা যায় যে ভার্সাই সন্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ। ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর উপর এমন সব কঠোর শর্তাদি আরোপ করিয়াছিল যে তাহার পক্ষে কোন ক্রমেই ঐ সব শর্ত মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। ইহার ফলে জার্মানী বুঝিতে পারে যে একমাত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধের দ্বারাই তাহার ঐ সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভার্সাই চুক্তি প্রণয়নের সময় জার্মানীর প্রতিনিধিদের মতামতকে কোন মূল্যই দেওয়া হয় নাই এবং ঐ সন্ধিকে গ্রহণ করিতে জার্মানীকে বাধ্য করা হইয়াছিল। এমনকি জার্মান প্রতিনিধিগণের প্রতি সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যও দেখান হয় নাই। ইহার ফলে জার্মানগণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং সুযোগ পাইলেই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। ভার্সাই চুক্তি একদিকে যেমন জার্মানীকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলে, আবার অপর দিকে তাহাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর অর্থ দিতেও বলা হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত জার্মানীর পক্ষে অত ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই সকল কারণে জার্মানরা কখনই ভার্সাই সন্ধিকে ন্যায়সঙ্গত সন্ধি বলিয়া মনে করে নাই।

দ্বিতীয়ত, জার্মানীতে নাৎসীদের অভ্যুত্থানও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে নাৎসীদের আদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল : (১) ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে অস্বীকার করা ; (২) ইউরোপের যে সকল অঞ্চলে জার্মান জাতির লোক বেশী বাস করে ঐসকল অঞ্চলগুলিকে লইয়া এক বৃহত্তর জার্মানী গড়িয়া তোলা ; (৩) ঐ দলের মতে যেহেতু জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি অতএব জার্মান জাতির নৈতিক দায়িত্ব হইতেছে অপর জাতিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে নাৎসীবাদের মূল ধারণাগুলিকে কার্যকর করিতে হইলে যুদ্ধ করা ভিন্ন উপায় ছিল না, কারণ ঐ সকল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত করিতে হইবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়ত, হিটলারের পররাষ্ট্রনীতিও যুদ্ধের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। হিটলার যে ভাবে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। হিটলার যখন অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলেন তখন পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিগুলি তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করিয়াও যদি তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলেও যুদ্ধকে রোধ করা যাইত। কিন্তু হিটলার তখন পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সুতরাং হিটলারের আগ্রাসী নীতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করে।

চতুর্থত, দূরপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলেও জাপানকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। জাতিসংঘও জাপানের বিরুদ্ধে কোন সামরিক বা অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। ইহার ফলে জাতিসংঘের মর্যাদা ও সম্মান বহুলাংশে হ্রাস পায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান অতি তৎপরতার সহিত সম্প্রসারণ নীতি কার্যকর করিতে থাকে। এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপান সুদূর-প্রাচ্যের একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করিতে সমর্থ হয়। জাপান যেভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগুলি লঙ্ঘন করিয়া তাহার সম্প্রসারণ নীতি কার্যকর করিয়াছিল তাহার ফলে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইটালীর পররাষ্ট্র নীতিও দায়ী ছিল। ইটালীতে মুসোলিনীর অধীনে ফ্যাসিস্ট দলের ক্ষমতালাভের ফলে ইটালীও সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে। ইটালীর অভিযোগ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালীকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল সে তাহার উপযুক্ত মূল্য পায় নাই। এজন্য মুসোলিনী ক্ষমতা লাভ করিয়া ইটালীর উপর যে অন্যায় করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইটালীর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে দখল করা। ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখলের ফলে জাতিসংঘ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠত, জার্মানী, জাপান এবং ইটালী কর্তৃক একটি রাষ্ট্রজোট (Axis Powers) গঠন করার ফলেও যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হিটলার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট-বিরোধী "কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি" সম্পাদন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইটালী ও ঐ দুইটি রাষ্ট্রের

মধ্যে মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনটি রাষ্ট্র পরস্পরের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার ফলেও হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে জার্মানী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করায় তাহার প ক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

সপ্তমত, জাতিসংঘের দুর্বলতা ও শোচনীয় ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটি তাহার প্রধান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। ইহার জন্য প্রধানত দুইটি কারণ ছিল। একটি হইতেছে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে এমন কতকগুলি গলদ ছিল যে সেগুলির ফলে জাতিসংঘের পক্ষে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান করিবার বিশেষ কোন উপায় ছিল না। অন্য কারণ হইতেছে, জাতিসংঘের প্রধান সভ্যগণও তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তেমন সজাগ ছিল না। ঐ সকল রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থের কথাই বেশী চিন্তা করিত। ইহাছাড়া জাতিসংঘে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করে নাই। এবং প্রথম দিকে জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নও ইহার সভ্য ছিল না। ইহার ফলেও জাতিসংঘ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে আমরা দেখিতে পাই যে জাপান, জার্মানী ও ইটালী যখন জাতিসংঘ সংক্রান্ত চুক্তি ভাঙিয়া রাজ্য গ্রাস করিতেছিল জাতিসংঘ তখন ঐ কাজে প্রকৃত বাধাদানে অসমর্থ হয়।

অষ্টমত, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জার্মানী, জাপান ও ইটালীর প্রতি তোষণ নীতিও যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট দায়ী। অনেকে মনে করেন যে ইঙ্গফরাসী তোষণ নীতিই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে প্রথম হইতেই যদি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একত্রে জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে চেষ্টা করিত তাহা হইলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে খুব সম্ভব রোধ করা যাইত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নবম কারণ হইতেছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে স্বার্থপর নীতি গ্রহণ করে। ঐ দুইটি দেশ ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করে। ইহাছাড়া দুইটি দেশ যুক্তভাবে একই নীতি গ্রহণ না করায় শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র জার্মানী, ইটালী ও জাপানকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ। হিটলার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করিয়াও যখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না এবং মিউনিক চুক্তি ভাঙিয়া পোল্যাণ্ডের ড্যানজিগ বন্দর এবং পোলিশ্ করাইডর দাবী করিয়া বসিলেন তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের তোষণনীতি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। এবং ইহার ফলে ঐ দুইটি দেশ জার্মানীর প্রতি তাহাদের আপসমূলক নীতি পরিত্যাগ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বুঝিল যে জার্মানীকে বাধা দিতে না পারিলে হিটলার সমগ্র ইউরোপ অধিকার করিয়া বসিবেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্থির

করে যে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করিলে তাহারা পোল্যান্ডকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এই জন্যই গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের দুইদিন পরে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ঃ যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে বারবার ঘটিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত সর্বনাশা যুদ্ধ আর হয় নাই। এই যুদ্ধের পরিধি ছিল পৃথিবীব্যাপী। এই যুদ্ধে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সৈন্যরা যুদ্ধ করে নাই। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা এবং কলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও শ্রমিকেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে এমন সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল যাহা মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। যুধ্যমান প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিতে চাহিয়াছিল এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে **সামগ্রিক যুদ্ধ** (Total war) বলা হয়।

যুদ্ধের গতি ঃ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। ইহার দুইদিন পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইটালী যুদ্ধের প্রথম দিকে নিরপেক্ষ থাকিল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানী অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অভিজ্ঞ সেনাপতিদের দ্বারা সুপরিচালিত দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা পোল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহার উপর পূর্ব-পশ্চিমদিক হইতে রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করিল। যুদ্ধ শুরু হইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে জার্মানী ও রাশিয়া পোল্যান্ড দখল করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইল।

ফ্রান্সের পতন ঃ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে জার্মানী পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ শুরু করিল। একে একে নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর নিকট পরাজিত হইল। ফ্রান্স সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল। জার্মানী ফ্রান্সের উত্তরভাগ ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি নিজের অধিকারে রাখে। দক্ষিণ ফ্রান্সে জার্মানীর তাঁবেদার এক সরকার (ভিসি সরকার) প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু স্বাধীনতাকামী ফরাসীগণ আফ্রিকায় অবস্থিত উপনিবেশগুলি হইতে জেনারেল দ্যগলের নেতৃত্বে ফ্রান্সের মুক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিল।

ফ্রান্সের পতনের পর বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া স্বেচ্ছায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। এইবার জার্মানী ব্রিটেনকে কাবু করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিল। ব্রিটেনের উপর অবিরাম বিমান আক্রমণ চলিতে থাকিল। উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে গ্রেট ব্রিটেন আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে উদ্যোগী হইল।

জার্মান-রুশ সংগ্রাম ঃ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভাগ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জার্মানীর অগ্রগতি কোথাও বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৯৪১-এর জুন মাসে অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত ভাঙ্গিয়া হিটলার হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধের গতিপথে এই ঘটনা এক নাটকীয় পরিবর্তন। রাশিয়ার সৈন্যদল যুদ্ধের প্রথম দিকে পিছু হটিলেও এবং রাশিয়ার প্রায় অর্ধেকটা জার্মান বাহিনী দখল করিতে সমর্থ

হইলেও এই বিরাট দেশকে গ্রাস করা সম্ভব হইল না। রুশবাসীদের অদম্য দেশপ্রেম ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা হিটলারের রাশিয়া অধিকার করিবার আশা বিনষ্ট করিল।

১৯৪৩-এ রাশিয়ানরা প্রবলবেগে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া দখলীকৃত রাশিয়া শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করে।

ইটালীর যুদ্ধে যোগদান ও পরাজয়ঃ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হইয়া আসিলে মুসোলিনী জার্মানীর পক্ষে যোগদান করেন। ইটালীর সৈন্যবাহিনী আফ্রিকায় অবস্থিত কতকগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশ জয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংরেজরা তাহাদের বিতাড়িত করে। কিন্তু জার্মান সৈন্যবাহিনী আফ্রিকায় আগমন করিলে যুদ্ধের গতি অন্যরূপ ধারণ করে। জার্মান সেনাপতি রোমেল আফ্রিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মধ্যে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। কিন্তু ইউরোপে সৈন্যের প্রয়োজন হওয়ায় হিটলার আফ্রিকা হইতে অধিকাংশ জার্মান সৈন্য সরাইয়া লইলে ইংরাজদের পক্ষে হৃত স্থানগুলি পুনর্দখল করা সহজ হয়। এবং উত্তর আফ্রিকা হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি মিত্রশক্তি ইটালী আক্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনীর পতন হয়। তখন ইটালীর নূতন প্রধানমন্ত্রী মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের বিজয়াভিযানঃ জার্মানীর বিজয়ে জাপান উল্লসিত হয় এবং জার্মানীর হাতে পরাজিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলি এই সুযোগে অধিকারে আনিবার জন্য সে সচেষ্ট হইল। জাপান মনে করিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার চিরাচরিত নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিয়া জাপানকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। এই অবরোধ যাহাতে তুলিয়া লওয়া হয় তাহার জন্য জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 'শান্তি বৈঠক' চালাইতে থাকে। কিন্তু 'শান্তি বৈঠক' চলাকালীন জাপান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে এবং ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর সে কোনরকম যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত পার্লহারবার নামক মার্কিন নৌঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করে। ফলে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী এবং ইটালীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

যুদ্ধে যোগদান করিয়াই জাপান অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত ফিলিপিন, হংকং, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জয় করিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপনীত হইল। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপানের অগ্রগতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই। একমাত্র হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হইয়া যায়।

জয়ের পথে মিত্রশক্তিঃ জার্মানী ও জাপানের এই চমকপ্রদ অগ্রগতি স্থায়ী হইল না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিক হইতে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত রণাঙ্গনে বিপুল শক্তি যোগাইতে থাকে। ফলে যুদ্ধের গতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল। মিত্রশক্তির ইটালী আক্রমণ ও ইটালীর আত্মসমর্পণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন জেনারেল আইজেনহাওয়ারের

নেতৃত্বে ব্রিটেন হইতে এক বিপুল সেনাদল ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফরাসী উপকূলে নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করে। জার্মানরা প্রবলভাবে বাধা দিয়াছিল সত্য কিন্তু মিত্র-শক্তির প্রবল আক্রমণের সম্মুখে তাহাদের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ হইয়া যায়। জার্মান বাহিনী ফ্রান্স ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দুইদিক হইতে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ বাহিনী জার্মানীতে মিলিত হয়। এই সময় রুশরা যাহাতে বার্লিনে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার না করিতে পারে সেজন্য হিটলার আত্মহত্যা করেন। হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে।

জাপানের পরাজয়ঃ এদিকে প্রাথমিক সাফল্যের পর মিত্রশক্তির নিকট জাপানের পরাজয় ঘটিতেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে। ১৯৪৪-এ মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। এইভাবে দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জাপানের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া পড়িতেছিল। ৬ই ও ৯ই আগস্ট (১৯৪৫) যথাক্রমে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া একলক্ষ ছয় হাজার জাপানীর প্রাণনাশ করিলে জাপান ২রা সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি ম্যাক আর্থারের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে প্রাণহানি হইয়াছে কত তাহার একটি হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, বিভিন্ন দেশে মোট নিহতের সংখ্যা হইল দেড় কোটি। অহতের সংখ্যা আরও বেশি। সম্পদ হানির পরিমাণ অকল্পনীয় বলিয়া এখনো সম্পূর্ণ হিসাব করা সম্ভব হয় নাই।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। রেনেসাঁ, রিফরমেশান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ ও ফলাফল নির্ণয় কর।

২। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। অস্ট্রিয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। ইউরোপের ইতিহাসে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৫। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধশেষে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও।

৬। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

৭। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৮। দ্বিতীয় যোসেফের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। শাসক হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতা উল্লেখ কর।

৯। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

১০। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিলুপ্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। অথবা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) রেনেসাঁ বলিতে কি বুঝ ? (খ) ইহা কিভাবে এবং কোথায় শুরু হয় ? (গ) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ঘ) উপনিবেশ স্থাপনে ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে কোন্ দুইটি দেশ অগ্রণী হইয়াছিল এবং কেন হইয়াছিল ?

২। (ক) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল ? (খ) কি কি সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ? (গ) এই যুদ্ধে ফলাফল কি হইয়াছিল ?

৩। (ক) ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? (খ) তাহাকে কেন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না ? (গ) এই সময় ফ্রান্সের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৪। (ক) জ্ঞানদীপ্তির যুগ কাহাকে বলে ? (খ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসন বলিতে কি বুঝ ? (গ) ইহার কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ? (ঘ) ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসন দেখা দেয় নাই এবং কেন ? (ঙ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ব্যর্থ হইয়াছিল কেন ?

৫। (ক) ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে কি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত ? (খ) প্রাশিয়ার উন্নতির জন্য তিনি কি কি করিয়াছিলেন ? (গ) তাঁহাকে 'মহান্' বলা হয় কেন ?

৬। (ক) রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেন ? (খ) তাঁহার বৈদেশিক নীতি কিরূপ ছিল ? (গ) তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি কোন্ কোন্ অঞ্চল অধিকার করেন ? (ঘ) পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলে রাশিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিল ? (ঙ) দ্বিতীয় ক্যাথারিণ কিভাবে নিকট প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব ঘটান ? (চ) তাঁহাকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক কি হিসাবে বলা যায় ?

৭। (ক) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে যোসেফকে কেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় ? (খ) তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? (গ) তিনি কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেন ? (ঘ) তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? (ঙ) এক্ষেত্রে তিনি কিরূপ সফলতা অর্জন করেন ? (চ) শাসক হিসাবে তিনি কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিলেন ?

দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। (ক) সপ্তবর্ষব্যাপীযুদ্ধ শেষ হয় কবে ? (খ) প্যারীর চুক্তি (১৭৬৩) কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হয় ? (গ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরচার শাসন ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে দেখা যায় নাই ? (ঘ) ফ্রেডারিক দি গ্রেট কোথাকার রাজা ছিলেন এবং কত বৎসর রাজত্ব করেন ? (ঙ) তিনি কি কি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন ? (চ) তাঁহার সমসাময়িক দুইজন রাজার নাম লিখ। (ছ) অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা কে স্থাপন করেন ? (জ) দ্বিতীয় কাথারিণ কোন্ রাজ্যের সিংহাসনে কত সালে আরোহণ করেন ? (ঝ) কুস্থক-কাইনার্ডজির সন্ধি কত সালে কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হয় ? (ঞ) ক্রিমিয়া দখল করিয়া ক্যাথারিণ কোথায় নৌঘাটি স্থাপন করেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। শিল্প-বিপ্লব বলিতে কি বুঝায় এবং ইংলণ্ডে ইহা প্রথম দেখা দিবার কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

২। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল আবিষ্কারের দ্বারা বয়ন শিল্পে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহা আনুপূর্বিক বর্ণনা কর।

৩। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লব লইয়া আসে সে সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

৪। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল উল্লেখ কর এবং তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে লিখ।

৫। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকার ছিল কিনা এবং তাহারা শ্রমিক সংঘ গঠন করিতে পারিত কিনা আলোচনা কর।

৬। শিল্প-বিপ্লব গণতন্ত্রের প্রসারে সাহায্য করিয়াছে না প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আলোচনা কর।

৭। কৃষির উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) শিল্প-বিপ্লব বলিতে কি বুঝ? (খ) ইহাকে 'বিপ্লব' কেন বলা হয়? (গ) ইহার সহিত ফরাসী বিপ্লবের পার্থক্য কোথায়?

২। (ক) কোন্ দেশে শিল্প-বিপ্লব প্রথম শুরু হয় এবং কখন? (খ) কি কি কারণে ইহা দেখা দেয়? (গ) কোন্ কোন্ যন্ত্র সুতা কাটার ক্ষেত্রে এবং কোন্ কোন্ যন্ত্র বস্ত্র বুনিবার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়াছিল? (ঘ) এই যন্ত্রগুলি কিসের দ্বারা পরিচালিত হইত? (ঙ) জেমস্ ওয়াট কে ছিলেন? (চ) তিনি কি আবিষ্কার করেন? (ছ) এই আবিষ্কারের ফলে কি ঘটিল? (জ) স্থল-পরিবহন ও জল-পরিবহনে বাষ্পের প্রয়োগ কিভাবে হইল? (ঝ) কুটিরের বদলে কারখানাগুলি কিভাবে এবং কেন শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হইল?

৩। (ক) শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী কিভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল? (খ) ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা কি করিয়াছিল? (গ) তাহাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটিয়াছিল? (ঘ) শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদের উদ্ভবে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল? (ঙ) পুঁজিবাদ কিভাবে সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল?

৪। (ক) ইংলণ্ড কিভাবে 'বিশ্বের কারখানায়' পরিণত হয়? (খ) ইংলণ্ডের শহরগুলির উৎপত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব কিরূপ? (গ) শিল্প-বিপ্লব কি কি সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে? (ঘ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটিল কিভাবে?

দুই এককথায় উত্তর দাও ঃ

১। (ক) শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে কি কি জিনিসের প্রয়োজন ছিল? (খ) শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম কোথায় শুরু হয়? (গ) উন্নত প্রকারের মাকু সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন? (ঘ) জেমস্ হরগ্রিভ্স্ কি আবিষ্কার করেন এবং তাহার কি নাম দেন? (ঙ) ক্রমটন ও রিচার্ড আর্করাইট কি কি আবিষ্কার করেন? (চ) প্রথম বাষ্প চালিত ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন? (ছ) জেমস্ ওয়াট কি আবিষ্কার করেন? (জ) সেফটি ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা কে? (ঝ) পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিবার উপায় কাহারা প্রথম উদ্ভাবন করেন? (ঞ) স্টিফেনসন যে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী করেন তাহার নাম কি? (ট) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করিবার অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কবে স্বীকার করে?

তৃতীয় অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ কিরূপে দেখা দিল সে সম্বন্ধে লিখ; এই যুদ্ধের স্বরূপ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

৩। আমেরিকানদের বিজয়ী হওয়ার ও ইংরাজদের পরাজিত হইবার কারণগুলি বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশগুলি কিভাবে গড়িয়া উঠে? (খ) উপনিবেশগুলির সহিত ইংলন্ডের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? (গ) এগুলিতে ইংলন্ডের কি কি রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা হইয়াছিল? (ঘ) উপনিবেশগুলিতে কিরূপ সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল? (ঙ) ইহা কিভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাবের উন্মেষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিল?

২। (ক) তৃতীয় জর্জ কে ছিলেন? (খ) তাঁহার নীতি কি ছিল? (গ) আপামর ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহার নীতির কেন সমর্থক ছিল না? (ঘ) স্টাম্প আইন কি? কাহারা ইহার বিরোধিতা করিল এবং কেন? (ঙ) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণ কি?

৩। (ক) স্বাধীনতা ঘোষণায় কি কি আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়? (খ) ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কেন যোগ দিল? (গ) আর কোন্ কোন্ দেশ আমেরিকানদের সহিত যোগ দিয়াছিল?

৪। (ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিভাবে দেখা দিল? (খ) যুদ্ধে ইংলন্ডের পরাজয়ের কারণ কি?

দুই এককথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) আমেরিকায় সর্বপ্রথম ইংলন্ডের কোন্ উপনিবেশটি গড়িয়া উঠে এবং কত সালে? (খ) তেরটি উপনিবেশের মধ্যে সর্বশেষ উপনিবেশটি কবে স্থাপিত হয় এবং নাম কি? (গ) প্রতিটি উপনিবেশে গভর্ণর কে নিযুক্ত করিতেন? (ঘ) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে আমেরিকায় ইংলন্ডের হাতে কে পরাজিত হয়? (ঙ) কোন্ ইংরাজ সেনাপতি কানাডা জয় করেন? (চ) স্টাম্প অ্যাক্ট কে কবে পার্লামেন্টে পাশ করান? (ছ) রাজস্বমন্ত্রী টাউনসেন্ড উপনিবেশগুলিতে কি কি জিনিসের উপর আমদানি শুল্ক বসান? (জ) লর্ড নর্থ কোন্ জিনিসের উপর শুল্ক বজায় রাখেন? (ঝ) আমেরিকানরা সমুদ্রের জলে চায়ের পেটি ফেলিয়া দেয় কোথায়? (ঞ) ইহাকে কি বলা হয়? (ট) উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা কোথায় মিলিত হন? (ঠ) আমেরিকায় সৈন্যদলের অধিনায়ক কে হইলেন? (ড) তিনি কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? (ঢ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় শুরু হয়? (ণ) উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া কবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? (ত) সশস্ত্র 'নিরপেক্ষ লীগ' কাহারা গঠন করে? (থ) ইয়র্ক টাউনে কে কাহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন? (দ) কোন্ চুক্তির দ্বারা ইংলন্ড আমেরিকায় উপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল?

চতুর্থ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব যে সব ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি বর্ণনা কর।

২। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ষোড়শ লুইর প্রচেষ্টা বর্ণনা কর।
অথবা, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। স্টেট্স জেনারেলের সংবিধান সভায় রূপান্তর বর্ণনা কর।

৪। ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ পর্যালোচনা কর।

৫। দার্শনিকগণ ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তিভূমি কতটা রচনা করেন সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। ফরাসী বিপ্লবের জন্য ফরাসী রাজতন্ত্রকে কতদূর দায়ী করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। বিপ্লব দেখা দিবার পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা কর। এই প্রসঙ্গে সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীনদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

৮। ইউরোপের অন্যান্য দেশে না ঘটিয়া বিপ্লব ফ্রান্সেই কেন ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। ফ্রান্সে সংবিধান সভার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের (১৭৮৯-৯১) অবদান ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।

১১। ফরাসী বিপ্লবে জেকোবিনদের (১৭৯২-৯৪) ভূমিকা বর্ণনা কর।

১২। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন যে ঘটনাবলীর পরিণতি তাহা বর্ণনা কর।

১৩। নেপোলিয়নের উত্থানের পূর্বে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত ইউরোপের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর।

১৪। নেপোলিয়নের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৫। সংস্কারক হিসাবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব নিরূপণ কর। এই প্রসঙ্গে তাহাকে বিপ্লবের সন্তান বলা যায় কিনা বিচার কর।

১৬। মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের কারণ ও ইহার ফলাফল আলোচনা কর।

১৭। স্পেন ও রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১৮। নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

১৯। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। (ক) অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবকে কিভাবে ত্বরান্বিত করিয়াছিল ? (খ) বিপ্লব ফ্রান্সেই কেন প্রথম দেখা দিল ? (গ) ষোড়শ লুই কিরূপ রাজা ছিলেন ? (ঘ) তিনি স্টেটস্-জেনারেল কেন আহ্বান করিয়াছিলেন ? (ঙ) স্টেট্স্-জেনারেল কাহাকে বলিত ? (চ) তৃতীয় স্টেট্ কি কি দাবি করিয়াছিল ? (ছ) ঐ সকল দাবির প্রতি রাজার মনোভাব কিরূপ ছিল ? (জ) টেনিস কোর্টের শপথটি কি ? (ঝ) ইহাকে বিপ্লবাত্মক বলা হয় কেন ?

২। (ক) মোঁতেসকিয়া, ভোলটেয়ার ও রুশো কে ছিলেন ? (খ) তাঁহাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা কিরূপ ছিল ?

৩। (ক) জাতীয় সভা ও স্টেট্স জেনারেলের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল ? (খ) ব্যাস্টিল দুর্গের উপর আক্রমণ ও ভার্সাই প্রাসাদ অভিমুখে নারী বাহিনীর

মিছিলের মাধ্যমে জাতীয় সভার প্রতি প্যারিসের সর্বহারাদের মনোভাবের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ? (গ) প্যারিস কিভাবে এবং কেন বিপ্লবের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছিল ?

৪। (ক) জাতীয় সভা বা সংবিধান সভা কি কি সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিল ? (খ) এই সকল সংস্কার দ্বারা সমাজের কোন্ শ্রেণী বেশি উপকৃত হইয়াছিল ? (গ) কোন্ শ্রেণী সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ?

৫। (ক) মানবাধিকার ঘোষণায় কি উল্লেখ ছিল ? (খ) ইহার তাৎপর্য কি ? (গ) মানবাধিকার ঘোষণাটির সহিত আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র ও আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধ-এর মিল ও অমিল কোথায় ? (ঘ) এই তিনটিতে কি একই প্রকারের অধিকারের কথা উল্লেখ রহিয়াছে ?

৬। (ক) ফরাসী বিপ্লবের সময় রাষ্ট্র ও চার্চের সহিত দ্বন্দ্ব লাগিবার কারণ কি ? (খ) সংবিধানে রাজার ক্ষমতা কিভাবে সংকুচিক করা হয় ? (গ) সংবিধানে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন আনা হয় ? (ঘ) এইগুলি কতদিন টিকিয়া ছিল ?

৭। (ক) 'এমিগ্রা' কাহাদের বলিত ? (খ) বিপ্লব সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব কি ছিল ? (গ) ষোড়শ লুই ও তাঁহার পরিবারবর্গের এমিগ্রাদের প্রতি কিরূপ মনোভাব ছিল ? (ঘ) ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফরাসী বিপ্লবের প্রতি মনোভাব কিরূপ ছিল ? (ঙ) বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি ফরাসী বিপ্লবীদের কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল ?

৮। (ক) আইনসভা কিরূপ ছিল ? (খ) আইনসভায় বিভিন্ন দলের বৈদেশিক যুদ্ধ সম্বন্ধে মনোভাব কিরূপ ছিল ? (গ) ইউরোপের সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ কেন বাধিল ? (ঘ) এই যুদ্ধ ষোড়শ লুইর ভাগ্য কিভাবে নির্ধারিত করিল ? (ঙ) এই যুদ্ধ কিভাবে বিপ্লবীদের আরও চরমপন্থী করিয়া তুলিল ?

৯। (ক) কখন এবং কি পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় ? (ক) আইন-সভার সহিত জাতীয় কনভেনসন-এর কিভাবে তুলনা করিবে ?

১০। (ক) সন্ত্রাসের রাজত্ব বলিতে কি বুঝায় ? (খ) ইহা কিভাবে বিপ্লবকে রক্ষা করিয়াছিল ? (গ) রোবেস্পিয়র কে ছিলেন ? (ঘ) জাতীয় কনভেনসনের শেষ বৎসর মধ্যবিত্তশ্রেণী কিভাবে তাহাদের প্রভাব স্থাপনে সফল হইয়াছিল ? (ঙ) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে কিরূপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল ? (চ) ইহা কি গণতান্ত্রিক ছিল ?

১১। (ক) থার্মিডোরিয়ান কনভেনশন কি কি কাজ করিয়াছিল ? (খ) অধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণায় কি বলা হয় ? (গ) ডাইরেক্টরী শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ কিরূপ ছিল ? (ঘ) এই শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটিল কি ভাবে ?

১২। (ক) নেপোলিয়ন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে কি ভাবে বিপ্লবকে বাঁচাইলেন ? (খ) কন্সালেট শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট কি ছিল ? (গ) কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়ন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন আনয়ন করেন ? (ঘ) কোড নেপোলিয়ন কি ? (ঙ) আমিয়াঁর সন্ধিতে কি স্থির হইয়াছিল ? (চ) ফরাসীরা নেপোলিয়নকে সম্রাট হিসাবে মানিয়া লইল কেন ?

১৩। (ক) নেপোলিয়ন কিভাবে ইউরোপের পুনর্গঠন করেন ? (খ) নেপোলিয়ন-এর সাম্রাজ্যের স্বরূপ কিরূপ ছিল ? (গ) মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কি ? (ঘ) ইহার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি জান ? (ঙ) নেপোলিয়নের পতনের জন্য ইহা কতটা দায়ী ছিল ?

১৪। (ক) স্পেনের সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধিবার কারণ কি ? (খ) ইংলণ্ড কিভাবে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় ? (গ) স্পেনীয় যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ কি ? (ঘ) স্পেনীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল ?

১৫। (ক) রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের বিরোধ বাধিবার কারণ কি ? (খ) মস্কো অভিযান কিভাবে ব্যর্থ হয় ? (গ) নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন কেন ? (ঘ) শত দিবস বলিতে কি বুঝায় ? (ঙ) ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন কিভাবে পরাজিত হইলেন ? (চ) আত্মসমর্পণের পর নেপোলিয়নের কিরূপ অবস্থা হইল ?

১৬। নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি কি ?

১৭। নেপোলিয়নের পরাজয়ে নৌশক্তির গুরুত্ব কিরূপ ছিল ?

১৮। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

দুই এককথায় উত্তর দাও—

(১) বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে কোন্ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন ? (২) পঞ্চদশ লুই'র মৃত্যুর পর কে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (৩) ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি প্রথমে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন কাহাকে ? (৪) 'পার্লামেণ্ট অব প্যারিস' কি ছিল ? (৫) ষোড়শ লুই কি মহাসভা গঠনের জন্য নির্বাচনের আদেশ দেন ? (৬) এই মহাসভা কত খ্রীষ্টাব্দে আহ্বান করা হয় ? (৭) বাস্তিলের পতন কত খ্রীষ্টাব্দ কোন্ তারিখে ঘটিয়াছিল ? (৮) ফরাসী বিপ্লবের মোটামুটি কয়টি কারণ আছে এবং কি কি ? (৯) বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী সমাজ কি কি ভাগে বিভক্ত ছিল ? (১০) তৎকালীন ফ্রান্সে প্রচলিত তিনটি প্রত্যক্ষ করের নাম লিখ। (১১) 'কনট্রাক্ট সোস্যিয়াল' কাহার লেখা ? (১২) নূতন সংবিধানে ফ্রান্সে কিরূপ সরকার প্রবর্তন করিবার কথা বলা হয় ? (১৩) ফ্রান্সের নাগরিকদের কি কি ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল ? (১৪) সংবিধানে সমগ্র ফ্রান্সকে কয়টি ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা হয় ? (১৫) যে কাগজী মুদ্রা প্রচলন করা হয় তাহার নাম কি ? (১৬) যাজক সম্প্রদায়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য কি প্রবর্তন করা হয় ? (১৭) ষোড়শ লুই গোপনে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে কোথায় সপরিবারে ধরা পড়েন ? (১৮) নূতন আইনসভায় কয়টি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে এবং কি কি ? (১৯) পিলনিজের ঘোষণা কাহারা করেন ? (২০) ডিউক অব ব্রান্সউইক কে ছিলেন ? (২১) তাঁহার ঘোষণার উত্তর ফরাসীরা কিভাবে দেয় ? (২২) ফরাসীদের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতটি কি ? (২৩) ইহার রচয়িতার নাম কি ? (২৪) ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড কবে হয় ? (২৫) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ কবে গঠিত হয় এবং ইহার সদস্য কোন্ রাষ্ট্রগুলি ছিল ? (২৬) জননিরাপত্তা কমিটির শোণিতাক্ত শাসনকে কি বলা হয় ? (২৭) এই শাসনকালের দুইজন বিখ্যাত নেতার নাম লিখ। (২৮) ডাইরেক্টরী শাসনব্যবস্থা শুরু হয় কবে ? (২৯) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

(৩০) ইটালীতে তিনি কি কি যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন ? (৩১) পিরামিডের যুদ্ধ কাহার সহিত কাহার হইয়াছিল ? (৩২) নীল নদের যুদ্ধে কে জয়ী হয় ? (৩৩) নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল হন কত সালে ? (৩৪) দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিবার জন্য নেপোলিয়ন কি স্থাপন করেন ? (৩৫) পোপের সহিত নেপোলিয়ন যে চুক্তি করেন তাহাকে কি বলা হয় ? (৩৬) কোড নেপোলিয়ন কি লইয়া রচিত ? (৩৭) লুনাভেলের সন্ধি কাহাদের মধ্যে কত সালে স্বাক্ষরিত হয় ? (৩৮) কোন্ সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন ? (৩৯) কোন্ সালে নেপোলিয়ন সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন ? (৪০) অস্টারলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ন কাহাদের পরাজিত করেন ? (৪১) রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য নেপোলিয়ন কি চুক্তি স্বাক্ষর করেন ? (৪২) ইংলণ্ডকে ধ্বংস করিবার জন্য নেপোলিয়ন কি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ? (৪৩) স্পেনের সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ কি নামে পরিচিত ? (৪৪) স্পেন ও পর্তুগালে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন ? (৪৫) নেপোলিয়ন কত সালে রাশিয়া আক্রমণ করেন ? (৪৬) নেপোলিয়ন কোন্ যুদ্ধে সর্বপ্রথম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ? (৪৭) ওয়াটারলুর যুদ্ধ কত সালে হইয়াছিল ? (৪৮) নেপোলিয়ন কাহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন ? (৪৯) তাঁহাকে কোথায় নির্বাসিত করা হয় ? (৫০) কত বৎসর তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। অথবা, ভিয়েনা চুক্তির (১৮১৫) গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। ভিয়েনা ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত কর।

৩। ভিয়েনা ব্যবস্থার (১৮১৫) মূলনীতিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া উহার শর্তগুলির মধ্যে সেগুলি কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

৪। চতুঃশক্তি চুক্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহার ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ কর।

৫। ইউরোপীয় সংঘের উৎপত্তি, লক্ষ্য, কার্যাবলী ও ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। মেটারনিক-এর চরিত্র ও নীতি আলোচনা কর। তিনি 'পুরানো আমল' অক্ষুণ্ণ রাখিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিয়াছিল কেন ? (খ) যাহারা ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল তাহারা এই বৈঠক হইতে কি আশা করিয়াছিল ? (গ) ভিয়েনা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান শর্তগুলি কি ? (ঘ) অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড এই ব্যবস্থা দ্বারা কিরূপ লাভবান হইয়াছিল ? (ঙ) পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে কি করা হয় ? (চ) জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম সম্বন্ধে কি

কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? (ছ) এগুলির ক্ষেত্রে ভিয়েনা সম্মেলনের কোন্ কোন্ নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছিল ? (জ) ফরাসী আক্রমণ হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল ?

২। (ক) ভিয়েনা ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? (খ) এই ব্যবস্থায় কি ত্রুটি ছিল ? (গ) ট্রপো প্রটোকল কি ? (ঘ) ইহা দ্বারা কি করিতে চাওয়া হইয়াছিল ? (ঙ) মেটারনিক ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় ? (চ) ইহার পতন ঘটিল কেন ? (ছ) ইংলণ্ড কেন মেটারনিকের নীতির বিরোধিতা করিয়াছিল ? (জ) জার্মানীতে উদার নীতির বিরুদ্ধে মেটারনিক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ভিয়েনা সম্মেলনের বৈঠক শুরু হয় কবে ? (খ) এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কে ? (গ) ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কে কে যোগ দেন ? (ঘ) ভিয়েনা সম্মেলনে কি কি নীতি গ্রহণ করা হয় ? (ঙ) জার্মানীতে কি গঠন করা হইবে বলা হয় ? (চ) অস্ট্রিয়া ইটালীর কোন্ কোন্ স্থান পাইল ? (ছ) চতুঃশক্তি চুক্তি কাহাদের লইয়া গঠিত হয় ? (জ) ইউরোপীয় সংঘের প্রথম বৈঠক বসে কোথায় ? (ঝ) ট্রপো ঘোষণাপত্রের রচয়িতা কে ছিলেন ? (ঞ) ট্রপো বৈঠকের মুলতুবী অধিবেশন বসে কোথায় ? (ট) ইউরোপীয় সংঘের তৃতীয় অধিবেশন বসে কোথায় ? (ঠ) মেটারনিক কে ছিলেন ? (ড) কার্লসবাড আদেশসমূহ কোথায় প্রবর্তিত হয় ? (ঢ) মেটারনিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে কবে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস বর্ণনা কর এবং এই প্রসঙ্গে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহার কারণগুলি বর্ণনা কর।

৩। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্ণনা করিয়া তাহার ফলাফল ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত যুগটির স্বরূপ কিরূপ ছিল ? (খ) অষ্টাদশ লুই শাসনতন্ত্রে কি কি পরিবর্তন সাধন করেন ? (গ) নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে কিরূপ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল ? (ঘ) দশম চার্লসের সিংহাসনচ্যুত হইবার কারণ কি ?

২। (ক) ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল কি হইল ? (খ) জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব কি ?

৩। (ক) লুই ফিলিপের শাসনকালে ফ্রান্সে কি কি রাজনৈতিক দল ছিল ? (খ) তিনি কাহাদের সমর্থন পাইয়াছিলেন ? (গ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কি ?

৪। (ক) গ্রীস কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে? (খ) বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল কেন? (গ) বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা কিরূপ ছিল? (ঘ) গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

দুই-এককথায় উত্তর দাও

(ক) নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে কে বসেন? (খ) দশম চার্লস কে ছিলেন? (গ) তাঁহার সময়ে ফ্রান্সে কি ঘটিয়াছিল? (ঘ) ইহাকে কি বলা হয়? (ঙ) লুই ফিলিপ কে ছিলেন? (চ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কত সালে হয়? (ছ) গ্রীকরা কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? (জ) কোন্ কোন্ রাষ্ট্র গ্রীকদের সাহায্য করিয়াছিল? (ঝ) কোন্ রাষ্ট্র সব চেয়ে বেশি সাহায্য করিয়াছিল? (ঞ) ন্যাভারিনোর জলযুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ট) এড্রিয়ানোপল-এর সন্ধিতে কি স্বীকার করা হয়? (ঠ) স্বাধীন গ্রীকরাজ্য কবে স্থাপিত হয়?

সপ্তম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

২। হাঙ্গেরীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর। অথবা হাঙ্গেরীতে বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

৩। অস্ট্রিয়ায় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৪। জার্মানী ও ইটালীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব কি ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা বিচার কর।

৬। ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগুলির প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে লিখ। এই প্রসঙ্গে এই বিপ্লবগুলির ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে দেখা দেয়? (খ) এই সব দেশে বিপ্লব ঘটিবার কারণ কি? (গ) এই বিপ্লবের ফলাফল কি হইয়াছিল?

২। (ক) ফ্রান্সে অস্থায়ী সরকার কি কি কাজ করিয়াছিল? (ই) ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রভাব হ্রাস পাইল কেন? (গ) নূতন সংবিধানের স্বরূপ কি ছিল?

৩। (ক) লুই কসুথ কে ছিলেন? (খ) তাঁহার নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে বিপ্লব কি ভাবে দেখা দিল? (গ) বিপ্লব প্রথমে জয়যুক্ত হইয়াছিল কি ভাবে? (ঘ) এই বিপ্লব কিভাবে দমন করা হয়?

৪। (ক) মেটারনিকের পতন কিভাবে ঘটিল? (খ) লম্বার্ডি ও ভেনিস প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল কেন? (গ) অস্ট্রিয়ার পক্ষে এই বিদ্রোহগুলি দমন করা সহজ হইয়াছিল কেন?

৫। (ক) ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট কি ? (খ) ইহা কিজন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ? (গ) ইহা ব্যর্থ হইল কেন ?

৬। (ক) ইটালীতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রকাশ কিভাবে ঘটিয়াছিল ? (খ) এই বিপ্লবে পিডমণ্টের অবদান কিরূপ ? (গ) চার্টিস্ট্ আন্দোলন কি ? ইহা কোথায় এবং কেন দেখা দিয়াছিল ?

৭। (ক) ১৮৪৮-৫০ বিপ্লবগুলির স্বরূপ কি ছিল ? (খ) দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় ? (গ) বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোথায় দেখা দিয়াছিল ? (ঘ) এই বিদ্রোহগুলির পরিণতি কি হইয়াছিল ? (ঙ) কি কি কারণে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগুলি ব্যর্থ হইয়াছিল ? (চ) এই বিপ্লবগুলির গুরুত্ব কোথায় ? (ছ) ১৮৪৮-কে বিপ্লবের বৎসর কেন বলা হয় ?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কয়টি রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে ? (খ) বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কাহার নেতৃত্বে কিরূপ সরকার স্থাপিত হয় ? (গ) হাঙ্গেরী কোন্ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ? (ঘ) এখানে কোন জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ? (ঙ) আর কি কি জাতি হাঙ্গেরীতে বসবাস করিত ? (চ) হাঙ্গেরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির নেতা কে ছিলেন ? (ছ) তাঁহার নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে কি দেখা দিল ? (জ) জেলাস্থচিক কে ছিলেন ? (ঝ) রাষ্ট্রপতি হইয়া কসুথ কি করিলেন ? (ঞ) হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ কোন্ রাষ্ট্রের সাহায্যে দমন করা হয় ? (ট) অস্ট্রিয়ায় আর কোন্ কোন্ স্থানে বিক্ষোভ দেখা দেয় ? (ঠ) জার্মানীর কোন্ কোন্ রাজ্যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ? (ড) ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট কি ? (ঢ) সিসিলির রাজধানীতে কবে এবং কাহারা বিদ্রোহ করে ? (ণ) ইটালীর আর কোন্ কোন্ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় ? (ত) এই সময় পিডমণ্টের রাজা কে ছিলেন ? (থ) চার্টিসট্ আন্দোলন কোথায় দেখা দেয় ? (দ) ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগুলির যে দুইটি সাধারণ প্রকৃতি ছিল তাহা লিখ।

অষ্টম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

২। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা কর। এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিবার কারণ সম্বন্ধে বিচার কর।

৩। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও নীতি বর্ণনা কর।

৫। তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীর অবস্থা লিখ।

৮। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া কিভাবে নেতৃত্ব পাইল তাহা আলোচনা কর।

৯। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে লিখ।

১০। প্লমবিয়ার্স ও ভিলাফ্রঙ্কা বৈঠকের তাৎপর্য বিচার কর।

১১। ইটালীর ঐক্য সাধনে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর ও ভিক্টর ইমানুয়েলের অবদান নিরূপণ কর।

১২। ভিয়েনা সম্মেলনের ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা কর।

১৩। জার্মানীর ঐক্য সাধনের ইতিহাসে স্লেজউইগ হলস্টেন প্রশ্নটির মূল্য কিরূপ তাহা বিচার কর।

১৪। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে লিখ।

১৫। স্যাডোয়া যুদ্ধের তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখ।

১৬। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

১৭। জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। অথবা, জার্মানীর ঐক্যলাভ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

১৮। জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে বিসমার্কের অবদান বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

১৯। ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন দুইটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

২০। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

২১। কাভুর ও বিসমার্কের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। নিকট প্রাচ্য সমস্যা কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে দেখা দেয়? উনবিংশ শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্য সমস্যার স্বরূপ কিরূপ ছিল?

২। (ক) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি? (খ) ইহার ফলাফল কি হইল? (গ) এই যুদ্ধের তাৎপর্য কি?

৩। (ক) ক্রিমিয়া যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে কি কি মত রহিয়াছে? (খ) এই যুদ্ধের মূল কারণ কি? (গ) পবিত্র স্থানের কর্তৃত্ব লইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ দেখা দিল কেন? (ঘ) প্যারিসের সন্ধিতে কি ঠিক হইল? (ঙ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল কি? (চ) ইহার পরোক্ষ ফল কি?

৪। (ক) লুই নেপোলিয়ন কে ছিলেন? তিনি কিভাবে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি হন? (খ) তিনি কিভাবে সম্রাট হন? (গ) তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি কিরূপ ছিল? (ঘ) কি রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল? (ঙ) বাস্তবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য কিসের উপর ভিত্তি করিয়া ছিল? তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোতে হস্তক্ষেপ করিলেন কেন? (চ) তিনি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেন কেন? (ছ) তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব কি?

৫। (ক) ১৮৪৮-এ ইটালীতে কি কি রাষ্ট্র ছিল? (খ) এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য বোধ কিভাবে দেখা দেয়? (গ) ম্যাটসিনি কে ছিলেন? (ঘ) তাঁহার লক্ষ্য কি ছিল? (ঙ) জিওবার্টি কে ছিলেন? (চ) ইটালীর ঐক্য সাধন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি ছিল? (ছ) এ ব্যাপারে কাভুরের অভিমত কি ছিল?

৬। (ক) সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ কিভাবে দেখা দিল ? (খ) এই যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা কিরূপ ছিল ? (গ) দুই সিসিলি রাজ্য, ভেনিস ও রোম কিভাবে ইটালী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল ? (ঘ) ইটালীর ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে কি কি বাধা ছিল ? (ঙ) সেগুলি কিভাবে দূর করা হইল ?

৭। (ক) জার্মান যৌথ রাজ্য কাহাকে বলিত ? (খ) অস্ট্রিয়ার প্রভাব এখানে কিরূপ ছিল ? (গ) জার্মানীতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল ? (ঘ) মেটারনিক ব্যবস্থার উপর, প্রাশিয়ার রাজার উপর এবং জাতীয় ঐক্য প্রসারের ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব কিরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল ?

৮। (ক) বিসমার্ক কে ছিলেন ? (খ) তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ কি ছিল ? (গ) কিভাবে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন ? (ঘ) তিনি ক্ষমতায় কতদিন অধিষ্ঠিত থাকেন ?

৯। (ক) বিসমার্ক ও রাজা প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন কেন ? (খ) কিভাবে তাঁহারা ইহা বৃদ্ধি করেন।

১০। (ক) জার্মানীর ঐক্য সাধনের জন্য বিসমার্কের কি পরিকল্পনা ছিল ? (খ) স্যাডোয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি কিভাবে পরিকল্পনাটি রূপ দেন ?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

১। (ক) ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য কি কি অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল ? (খ) এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে রাশিয়ার কি নীতি ছিল ? (গ) রাশিয়ার এই নীতির বিরোধিতা করিল কাহারা ? (ঘ) তুরস্কের উপর রাশিয়ার দাবি কি প্রশ্ন লইয়া শুরু হয় ? (ঙ) তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কি করিতে চাহিলেন ? (চ) এই সময় রাশিয়ার জার কে ছিলেন ? (ছ) সিনোপের জলযুদ্ধে কি হইয়াছিল ? (জ) কত সালে সিবাস্তোপোলের পতন ঘটে ? (ঝ) কোন্ সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ? (ঞ) এই সন্ধিতে কাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিল ? (ট) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বলা হয় কেন ?

২। (ক) লুই নেপোলিয়ন কত সালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হন ? (খ) তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কে ছিলেন ? (গ) লুই নেপোলিয়ন কত সালে ফ্রান্সের সম্রাট হন এবং তিনি কি নামে পরিচিত হইলেন ? (ঘ) নূতন সংবিধানে আইন সভার সদস্য সংখ্যা কত নির্দিষ্ট হইল ? (ঙ) তিনি কাহার নিকট পরাজিত হন ?

৩। (ক) কার্বোনারিরা কে ছিলেন ? (খ) নব্য ইটালী সমিতি কে স্থাপন করেন ? (গ) কাভুর কে ছিলেন ? (ঘ) তিনি কোন্ যুদ্ধে কাহাদের সহিত যোগ দেন ? (ঙ) তিনি কোথায় কাহার সহিত এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন ? (চ) অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল কোন্ কোন্ যুদ্ধে পরাজিত হইল ? (ছ) কোন্ কোন্ রাজ্যের জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়া কি দাবি করিল ? (জ) তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত কোথায় যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করেন ? (ঝ) গ্যারিবল্ডি সৈন্য লইয়া সর্বপ্রথম কোথায় যান ? (ঞ) নেপল্‌স্-এর জনসাধারণ কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ? (ট) ইটালী রাজ্য কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কে রাজা হন ? (ঠ) ভেনিস ও রোম ইটালী রাজ্যের সহিত কোন্ কোন্ সালে যুক্ত হয় ? (ড) ইটালীর রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত হয় ?

৪। (ক) জোলভারিন কথার অর্থ কি? (খ) ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত হন? (গ) তিনি কবে এবং কাহাকে প্রাশিয়ার চান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন? (ঘ) জার্মানীর ঐক্য সাধনের জন্য প্রাশিয়াকে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল? (ঙ) ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ কোন্ দুইটি স্থান লইয়া দেখা দেয়? (চ) গেস্টিনের চুক্তি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ছ) অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়? (জ) কোন্ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (ঝ) এম্‌স টেলিগ্রাম কে কাহার নিকট পাঠান? (ঞ) ফ্রান্স কোন্ যুদ্ধে পরাজিত হয়? (ট) ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কি চুক্তির দ্বারা অবসান ঘটে?

নবম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়—আলোচনা কর।

৩। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৪। বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জার্মানীর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির সহিত ইহার তুলনা কর।

৭। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও। এইগুলির ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে 'মুক্তিদাতা জার' বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নীতির বিবরণ দাও।

১০। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল বর্ণনা কর।

১১। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

১২। ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৩। কি কি কারণ ও ঘটনায় প্রভাবে ত্রিশক্তি মিতালি দেখা দিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

১৪। কি কি কারণ ও ঘটনার প্রভাবে এই চুক্তিগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা কর: ফ্রান্স ও রাশিয়ার চুক্তি, ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি, ইঙ্গ-রুশ চুক্তি।

১৫। যে সকল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিশক্তি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

১৬। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের কূটনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) বিসমার্ক কেন্দ্রীয় সরকারকে কিভাবে শক্তিশালী করেন ? (খ) বিসমার্কের নীতির বিরোধী কাহারা ছিল ? (গ) তাহাদের বিরুদ্ধে বিসমার্ক কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে তিনি কিরূপ ব্যবস্থা লইয়াছিলেন এবং কেন লইয়াছিলেন ? (ঙ) সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? (চ) বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপন করিতে চাহেন নাই কেন ?

২। (ক) ফ্রান্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বিসমার্ক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (খ) রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল ? (গ) বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি সমলোচনার যোগ্য কেন ?

৩। (ক) দ্বিতীয় উইলিয়ম-এর সহিত বিসমার্কের মতের মিল হইল না কেন ? (খ) দ্বিতীয় উইলিয়মের বৈদেশিক নীতি কি ছিল ? (গ) তাঁহার বৈদেশিক নীতির ফল কি হইয়াছিল ?

৪। (ক) জার আলেকজাণ্ডার কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেন ? (খ) তাঁহার সংস্কারগুলির কি ফল হইয়াছিল ? (গ) ভূমিদাস প্রথা কি ? (ঘ) তিনি এই প্রথা কিভাবে বিলোপ করেন ? (ঙ) ইহার প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল ? (চ) জেমস্টভো কি ? (ছ) কেন ইহা স্থাপন করা হয় ? (জ) জনসাধারণ ইহার দ্বারা কিভাবে উপকৃত হইয়াছিল ?

৫। (ক) স্টোলিপিন সংস্কার কাহাকে বলে ? (খ) কাউণ্ট উইটে কি করিয়াছিলেন ? (গ) বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কোন্ দল রাশিয়ায় আমূল সংস্কার দাবি করিয়াছিল ? (ঘ) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব কেন ঘটিয়াছিল ? (ঙ) ইহা ব্যর্থ হয় কেন ?

৬। (ক) ত্রিশক্তি মৈত্রী চুক্তি কিভাবে গঠিত হয় ? (খ) ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের কারণ কি ? (গ) ত্রিসম্রাট চুক্তি কেন ভাঙিয়া যায় ? (ঘ) ইটালী অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সহিত মৈত্রীচুক্তি করিয়াছিল কেন ? (ঙ) ইংলণ্ড কিভাবে তাহার ভয়ঙ্কর একাকীত্ব ভাঙিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় ? (চ) ইউরোপ কিভাবে দুইটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে ?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। (ক) 'বিসমার্কের যুগ কোন্‌টিকে বলা হয় ? (খ) 'ত্রিসম্রাট সংঘ' কবে গঠিত হয় এবং ইহার সদস্য কাহারা ছিল ? (গ) দ্বৈতসন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঘ) ত্রি-শক্তি মৈত্রী কাহাদের লইয়া গঠিত হয় এবং কত সালে ? (ঙ) বিসমার্ক কত সালে পদত্যাগ করেন ? (চ) 'জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ' কে বলিতেন ? (ছ) 'জার্মানীর ভবিষ্যৎ নৌশক্তির উপর' কে ঘোষণা করেন ?

২। (ক) জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কত সালে রাশিয়ায় জার হন ? (খ) তাঁহার শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ? (গ) মির বলিতে কি বুঝ ? (ঘ) জেমস্‌ট্‌ভো কি ? (ঙ) নিহিলিস্ট কাহাদের বলা হইত ? (চ) দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু কি ভাবে ঘটে ? (ছ) সানস্টেফানোর সন্ধি কাহাদের মধ্যে কত সালে হইয়াছিল ? (জ) কাউণ্ট উইটে কে ছিলেন ? (ঝ) রাশিয়ার সহিত

ফ্রান্সের চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? (ঞ) রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় রাশিয়ার জার কে ছিলেন? (ট) এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? (ঠ) 'রক্তস্নাত রবিবার' বলিতে কোন্ তারিখকে বলা হয়? (ড) 'ভিবরো ঘোষণা'-টি কি? (ঢ) স্টোলিপিন কে ছিলেন এবং কি করিয়াছিলেন? (ণ) রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটে কবে?

৩। (ক) ট্রিপল আঁতাত-এর সদস্য কাহারা ছিল? (খ) ফ্যাসোডা ঘটনাটি কি? (গ) কাহাদের মধ্যে আন্তরিক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় এবং কবে? (ঘ) ইউরোপে যে দুইটি বিবদমান রাষ্ট্রজোট দেখা দেয় তাহার নাম লিখ।

দশম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। কার্ল মার্কসের জীবনী ও মতবাদ আলোচনা কর।

৩। 'সাম্রাজ্যবাদ' বলিতে যাহা বুঝ লিখ।

৪। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। চীনে ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রবেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখ।

৭। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সহিত চীনের দুইটি যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৮। চীনে প্রজাতন্ত্র কিভাবে স্থাপিত হইল তাহা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইল কেন? (খ) সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায়? (গ) কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রী কাহারা? (ঘ) তাঁহাদের মতবাদ কি?

২। (ক) কার্ল মার্কস্ কে ছিলেন? (খ) তাঁহার রচিত সাম্যবাদের ইস্তাহার-এ তিনি কি বলিয়াছেন? (গ) উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের উপাদান বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? (ঘ) শ্রেণী সংঘর্ষ সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা কি? (ঙ) ইতিহাসের ব্যাখ্যা তিনি কিভাবে করিয়াছেন? (চ) মার্কসের মতবাদের গুরুত্ব কোথায়?

৩। (ক) সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য কি কি? (খ) বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সহিত সংঘর্ষ বাধিল কেন? (গ) সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণ কি? (ঘ) ইহার ফলাফল কি হইল?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও:

১। (ক) সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা কি? (খ) ইহা কী স্বীকার করে না? (গ) কয়েকজন কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রীর নাম লেখ। (ঘ) কার্ল মার্কস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (ঙ) তিনি কোথায় শিক্ষালাভ করেন? (চ) প্রথম তিনি যে সংবাদপত্র বাহির করেন তাহার নাম কি? (ছ) তাঁহার বন্ধুর নাম কি? (জ) সাম্যবাদের ইস্তাহার কবে প্রকাশিত হয়? (ঝ) কার্ল মার্কস-এর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি কি এবং

কোন্ ভাষায় ইহা লিখিত ? (ঞ) মার্কস কোথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন ? (ট) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ কবে স্থাপিত হয় ? (ঠ) ইহা কি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে ? (ড) ইহার প্রথম বৈঠক কোথায় বসে ? (ঢ) তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল কবে এবং কোথায় স্থাপিত হয় ? (ন) সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপের নাম লিখ।

২. (ক) সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য কয়টি ? (খ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি পাওয়ায় কি ঘটিল ? (গ) উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় কাহারা গিয়া বসবাস শুরু করে ? (ঘ) এশিয়ায় কি নীতি গ্রহণ করা হয় ?

৩। (ক) ইউরোপের কোন্ দেশ সর্বপ্রথম চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে শুরু করে ? (খ) চীনে আফিং ব্যবসায়ে অগ্রণী ছিল কাহারা ? (গ) তাহারা কোথা হইতে আফিং লইয়া আসিত ? (ঘ) কয়টি আফিং যুদ্ধ হইয়াছিল এবং কখন ? (ঙ) নানকিং-এর সন্ধিতে কি ঠিক হয় ? (চ) তিয়েনসিনের সন্ধিতে চীনকে কি মানিয়া লইতে হয় ? (ছ) তাইপিং বিদ্রোহ কি ? (জ) এই বিদ্রোহে কাহারা যোগ দেয় ? (ঝ) এই বিদ্রোহ দমনে চীন সম্রাটকে কাহারা সাহায্য করিয়াছিল ? (ঞ) বক্সার বিদ্রোহ কি এবং করে দেখা দেয় ? (ট) চীনের অখণ্ডতা কাহার জন্য রক্ষা পাইল ? (ঠ) চীনের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক সভা কোন্ সালে স্থাপিত হয় ? (ড) মাঞ্চু বংশীয় রাজারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন ? (ঢ) 'চীন নবজাগরণ সমিতি' কে কোথায় স্থাপন করেন ? (ণ) চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল কবে ? (ত) যুয়ানশিকাই কে ছিলেন ? (থ) একুশ দফা দাবি কে কাহার নিকট কবে পেশ করে ? (দ) সাম্যবাদীদলকে কুয়োমিংটান দলের সহিত সহযোগিতা শুরু করিতে আহ্বান জানান হয় কবে ? (ধ) মাইকেল বোরোদিন কে ছিলেন ? (ন) জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে কবে ? (প) লংমার্চ বলিতে কি বুঝ ? (ফ) ইহার নেতা কে ছিলেন ? (ব) চীনে সাম্যবাদী দল কবে জয়লাভ করে ?

একাদশ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর হইতে বার্লিন কংগ্রেস পর্যন্ত নিকট প্রাচ্য সমস্যার বিবরণ দাও।

২। বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮) ও বার্লিন চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহা নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল তাহা উল্লেখ কর।

৩। বার্লিন সন্ধি হইতে বলকান যুদ্ধ পর্যন্ত নিকট প্রাচ্য সমস্যার আলোচনা কর।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ দুইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং ফলাফল সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

৫। তরুণ তুর্কী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) রুমানিয়া রাজ্যটি কিভাবে গঠিত হয় ? (খ) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করিল ? (গ) এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইল ?

(ঘ) বার্লিন বৈঠক কিভাবে আহূত হইল? (ঙ) বার্লিন সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলি কি? (চ) বার্লিন সন্ধি নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে কিরূপ সক্ষম হইয়াছিল?

২। (ক) ইংলণ্ড কিভাবে সাইপ্রাস পাইল? (খ) তরুণ তুর্কী আন্দোলন কেন দেখা দিল? (গ) ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? (ঘ) প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণ কি? (ঙ) ইহার ফলাফল কি হইল? (চ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ কিভাবে শুরু হইল? এই যুদ্ধের ফলে বলকান অঞ্চলে কেন সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইল?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। (ক) রুমানিয়া কি কি অঞ্চল লইয়া গঠিত হয়? (খ) ১৮৭৫ সালে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে কোথায় বিদ্রোহ দেখা দেয়? (গ) কোন্ রাজ্য দুইটি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে? (ঘ) রাশিয়া কত সালে তুরস্কের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করে? (ঙ) কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে? (চ) এই সন্ধিতে রাশিয়া কি কি স্থান পাইল? (ছ) বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য কোন্ অঞ্চল লইয়া গঠিত হয়? (জ) এই সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (ঝ) নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানের জন্য কোথায় বৈঠক বসে এবং কত সালে? (ঞ) এই বৈঠকে সভাপতিত্ব কে করেন? (ট) সান স্টেফানোর সন্ধির বদলে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় তাহার নাম কি? (ঠ) এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়া কি কি স্থান লাভ করে? (ড) ইংলণ্ড কিভাবে সাইপ্রাস লাভ করে? (ঢ) নব্য তুর্কী দলের নেতা কে ছিলেন? (ণ) এই দলের আদর্শ কি ছিল? (ত) প্রথম বলকান যুদ্ধ কবে শুরু হয়? (থ) বলকান সংঘে কোন্ কোন্ রাজ্য যোগ দেয়? (দ) কোন্ চুক্তির দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে? (ধ) নূতন কোন্ রাষ্ট্রটির এই সময় উদ্ভব ঘটে? (ন) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ কবে এবং কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? (প) এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? (ফ) কোন চুক্তির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে?

দ্বাদশ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি উল্লেখ কর।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। জার্মানী এই যুদ্ধে কিভাবে পরাজিত হইল তাহা বর্ণনা কর।

৪। ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। সেণ্ট জার্মেন ট্রায়াননের, নিউলির ও সেভরের সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ করিয়া এই সন্ধিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। জাতিসংঘের উৎপত্তি, লক্ষ্য এবং ইহার প্রধান প্রধান সংস্থাগুলির গঠন প্রণালী, কার্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখ।

৮। তুরস্কের কামাল পাশার জীবনী ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের পুনরুজ্জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। অথবা, কামাল আতাতুর্ক ও তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের আসল কারণ কি? (খ) যুদ্ধের জন্য কে দায়ী এবং কেন? (গ) বিবদমান শক্তিগুলির যুদ্ধাদর্শ কি ছিল? (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে যোগ দিল কেন? (ঙ) রাশিয়া এই যুদ্ধ হইতে সরিয়া গেল কেন? (চ) জার্মানী কিভাবে পরাজিত হইল?

২। (ক) প্যারিসের শান্তি বৈঠকে কোন্ কোন্ নেতা উপস্থিত ছিলেন? (খ) তাহাদের প্রত্যেকের মনোভাব কি ছিল? (গ) প্যারিস সম্মেলনে দুইটি পরস্পর বিরোধী নীতির সংঘাত কিভাবে দেখা দিল?

৩। (ক) ভার্সাই সন্ধির প্রধান শর্তগুলি কি? (খ) এই সন্ধির ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থায় কি পরিবর্তন হইল? (গ) ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল? (ঘ) ভার্সাই সন্ধিকে জার্মানরা কিভাবে সমালোচনা করিয়াছে? (ঙ) ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি ছিল কোথায়? (চ) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে আর একটি যুদ্ধের বীজ কিভাবে নিহিত ছিল?

৪। (ক) অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেন সন্ধির শর্তগুলি কি? (খ) ট্রায়াননের সন্ধির দ্বারা হাঙ্গেরীকে কি কি ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়? (গ) নিউলির সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়াকে কি ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়? (ঘ) সেভরের সন্ধিতে তুরস্কের অবস্থা কিরূপ হইল?

৫। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল? (খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন লইয়া আসে? (গ) জাতিসংঘের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল? (ঘ) ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) ইহার কি কি সংস্থা ছিল?

৬। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? (খ) কামাল কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন? (গ) বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি কিভাবে সংগ্রাম করেন? (ঘ) ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঙ) লসেনের সন্ধির তাৎপর্য কি? (চ) কামাল ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য কি ছিল? (ছ) কামালকে নব্য তুরস্কের স্রষ্টা কেন বলা হয়?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও

১। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু ও শেষ হয়? (খ) সেরাজেভো শহরে কাহাকে হত্যা করা হয়? (গ) চৌদ্দ দফা পরিকল্পনার রচয়িতা কে? (H. S. 1978)। (ঘ) এই সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (ঙ) ক্লিমেনশো কে ছিলেন? (চ) ভার্সাই চুক্তি কত সালে এবং কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর কি কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (জ) জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে কবে স্থাপিত হয়? (ঝ) জাতিসংঘের মূল আদর্শ কি ছিল? (H. S. 1978)। (ঞ) জাতিসংঘের কি কি সংস্থা ছিল? (ট) কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত? (H.S. 1978)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। জার-শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে যাহা জান লিখ। অথবা, রাশিয়ার পুরোহিত-তন্ত্র, সামন্তশ্রেণী এবং জনসাধারণের অবস্থার পটভূমিকায় উনিশ শতকের রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা কর।

২। রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। ইহার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি উল্লেখ কর।

৩। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব যে সকল ঘটনার ফলে দেখা দিয়াছিল সেগুলি বর্ণনা কর।

৪। জার দ্বিতীয় নিকোলাস কিভাবে সিংহাসনচ্যুত হইলেন তাহা বর্ণনা কর।

৫। বলশেভিক সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহিঃশত্রুদের পরাজিত করিয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

৬। রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) বলশেভিক কাহাদের বলিত ? (খ) বলশেভিক বিপ্লব কেন ঘটিয়াছিল ? (গ) ইহার গুরুত্ব কি ?

২। (ক) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের বিপ্লবের কৃতিত্ব কি ? (খ) অস্থায়ী সরকারের নীতি কিরূপ ছিল ? (গ) কেরেনস্কি কে ছিলেন ? (ঘ) তাঁহার নীতি কি ছিল ? (ঙ) তাঁহার নীতিগুলি ব্যর্থ হইল কেন ? কেরেনস্কির নীতির সহিত লেনিনের নীতির কিরূপ পার্থক্য ছিল ? (চ) অক্টোবর বিপ্লব কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় ?

৩। (ক) অক্টোবর বিপ্লবে লেনিন কিরূপ অংশ গ্রহণ করেন ? (খ) তাঁহার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা কি ছিল ? (গ) রাশিয়ার অভ্যন্তরে ও বাহিরে অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফল কি হইল ? (ঘ) বলশেভিক সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের পরাজিত করিল ?

৪। নেপ কাহাকে বলে ? কে ইহার প্রবর্তন করেন এবং কেন করেন ? ইহার কিরূপ প্রয়োজন ছিল ?

৫। রুশ বিপ্লব রাশিয়া ও বিশ্বকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) রুশ-বিপ্লব কবে দেখা দেয় ? (খ) এই সময় রাশিয়ার জার কে ছিলেন ? (গ) পেট্রোগ্রাডে গণ-অভ্যুত্থানের তারিখ কি ? (ঘ) কেরেনস্কি কে ছিলেন ? (ঙ) বলশেভিক দলের নেতা কে ছিলেন ? (চ) অক্টোবর বিপ্লব কবে সংঘটিত হয় ? (ছ) দ্বিতীয় অখিল সোভিয়েট কংগ্রেসের কবে উদ্বোধন হয় ? (জ) এই কংগ্রেস কি কি ডিক্রি পাশ করে ? (ঝ) ক্রেমলিন কবে বিপ্লবীদের হস্তগত হয় ? (ঞ) সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র যোগ দেয় ? (ট) এ্যাডমিরাল কলচাক কে ছিলেন ? (ঠ) N. E. P. কাহাকে বলে ? (ড) সোভিয়েট ইউনিয়ন কয়টি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র লইয়া গঠিত হয় ? (ঢ) এই নব গঠিত রাষ্ট্রটির নাম কি হইল ?

চতুর্দশ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। লোকার্ন চুক্তি কিভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

২। লোকার্ন চুক্তির ফলে যুদ্ধের প্রকৃত অবসান ঘটিল এবং শান্তির যুগ ফিরিয়া আসিল এই মত গ্রহণযোগ্য কিনা আলোচনা কর।

৩। কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি বা প্যারিস চুক্তির শর্তগুলি আলোচনা কর। ইহার ভাল ও মন্দ দিক আলোচনা কর।

৪। ১৯২৫ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালটিকে জাতিসংঘের ইতিহাসে সুবর্ণ-যুগ বলা হয় কেন তাহা আলোচনা কর।

৫। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা কর। জাতিসংঘের বাহিরে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ কর।

৬। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর।

৭। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট ইটালীর উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও। তাঁহার সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।

৮। মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৯। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

১০। জার্মানীতে হিটলার কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন তাহা বর্ণনা কর।

১১। হিটলারের অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর।

১২। হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়া তিনি কিভাবে এইগুলি বাস্তবে পরিণত করিতে পারিলেন তাহা আলোচনা কর।

১৩। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা কর। এই প্রসঙ্গে চীনের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

১৪। স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৫। যে ঘটনাবলীর পরিণামে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

১৬। রাশিয়ায় স্টালিনের একক শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। (ক) লোকার্ন চুক্তি কাহাকে বলে এবং কেন ? (খ) এই চুক্তির সহিত কোন্ কোন্ রাষ্ট্র জড়িত ছিল ? (গ) এই চুক্তি দ্বারা কি ঠিক হইয়াছিল ? (ঘ) লোকার্ন চুক্তিতে কি কি শর্ত ছিল ? (ঙ) জার্মানী ও ফ্রান্সের উপর এই চুক্তির কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল ? (চ) লোকার্ন চুক্তির গুরুত্ব কোথায় ? (ছ) কেবল-ব্রিঁয়া চুক্তি বা প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার কারণ কি ? (জ) এই চুক্তির শর্তগুলি কি ? (ঝ) চুক্তিটির ভাল দিক কি ছিল ? (ঞ) ইহার কি কি ত্রুটি ছিল ?

২। (ক) ফ্যাসিজম বলিতে কি বুঝ? (খ) মুসোলিনী কিভাবে ইটালীতে ক্ষমতা হস্তগত করিলেন? (গ) তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঘ) ঐ দুইটি কতটা সফল হইয়াছিল এবং কিরূপে?

৩। (ক) হিটলার কিভাবে জার্মানীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিলেন? (খ) তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রকৃত লক্ষ্য কি ছিল? (গ) নাৎসীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার স্বপক্ষে কি কি কারণ ছিল? (ঘ) হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্য কি ছিল? (ঙ) হিটলার অস্ট্রিয়া দখল কিভাবে করিলেন? (চ) চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত মতবিরোধ হইবার কারণ কি? (ছ) মিউনিক চুক্তিতে কি ঠিক হইল? (জ) পোল্যাণ্ডের নিকট হিটলার কি দাবি করিলেন?

৪। (ক) জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল কেন? (খ) টানাকা মেমোরিয়ল কি? (গ) এশিয়ায় নূতন ব্যবস্থা বলিতে জাপান কি বুঝাইতে চাহিয়াছিল? (ঘ) এশিয়ার দেশগুলি ইহাতে সাড়া দেয় নাই কেন?

৫। (ক) স্টালিন কিভাবে নিজেকে অপ্রতিহত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন? (খ) যাঁহারা তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিল তাঁহাদের কি অবস্থা করিয়াছিলেন? (গ) তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি কিরূপ ছিল?

৬। (ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি? (খ) ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল?

৭। (ক) চেম্বারলেন কে ছিলেন? (খ) দালাদিয়েরের সম্বন্ধে কি জান? (গ) হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতি তাঁহারা কিরূপ নীতি অনুসরণ করেন এবং কেন করেন? (ঘ) এই নীতির ফলাফল কি হইয়াছিল?

৮। (ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি কোথায়? (খ) কি কি কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয়? (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি? (ঘ) হিটলার এই যুদ্ধের জন্য কিরূপ দায়ী ছিল?

৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি বর্ণনা কর।

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের বিজয় অভিযান বর্ণনা কর।

১১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে শেষ হইল তাহা বর্ণনা কর।

১২। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার অবদান উল্লেখ কর।

১৩। (ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন সামগ্রিক যুদ্ধ বলা হয়? (খ) যুদ্ধের প্রথম দিকে হিটলার কোন্ কোন্ দেশ কিভাবে জয় করেন? (গ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন কেন? (ঘ) জাপান যুদ্ধে যোগ দিল কেন? (ঙ) জাপান কোন্ কোন্ দেশ জয় করিতে সমর্থ হয়? (চ) জাপান আত্মসমর্পণ করিল কেন? (ছ) হিটলারের পরিণতি কি হইয়াছিল?

দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। (ক) লোকার্ন চুক্তি কবে এবং কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? (খ) প্যারিস চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? (গ) ইহার মূল লক্ষ্য কি ছিল? (ঘ) জাতিসংঘ কয়টি রাজনৈতিক বিবাদ বিসংবাদ মিটাইতে সক্ষম হয়? (ঙ) জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যমণ্ডিত যুগ কোন্‌টি?

২। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ? (খ) মুসোলিনী কে ছিলেন ? (H. S. 1978)। (গ) তিনি যে দল গঠন করেন তাহার নাম কি ? (ঘ) আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে তিনি কত সালে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ? (ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি যোগ দেন কবে ? (চ) তাঁহাকে কাহারা কবে হত্যা করে ?

৩। (ক) হিটলার কে ছিলেন ? (খ) তিনি যে দল গঠন করেন তাহার নাম কি ? (গ) তাঁহার দলের প্রতীক কি ছিল ? (ঘ) তাঁহার যুব আন্দোলনের স্তম্ভ কাহারা ছিল ? (ঙ) হিটলার কবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ? (চ) হিটলারের আত্মজীবনীর নাম কি ? (ছ) তিনি কোন্ কোন্ রাজ্য দখল করেন ? (জ) কোন্ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তিনি ডানজিগ বন্দর দাবী করেন ? (ঝ) ইহার ফল কি হইল ? (ঞ) জার্মানী কোন্ রাষ্ট্রের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করে এবং কত সালে ?

৪। (ক) জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে কত সালে ? (খ) এশিয়ার নূতন ব্যবস্থা কি ? (গ) জাপান বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় চীন আক্রমণ করিল কখন ? (ঘ) জাপান কাহার সহিত কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং কত সালে ? জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে কবে ?

৫। (ক) স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? (খ) ফ্রাঙ্কো কে ছিলেন ? (গ) তিনি কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ? (ঘ) স্পেনের কাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ? (ঙ) ইউরোপের কোন্ দুইটি রাষ্ট্র তাঁহাকে সরাসরি সাহায্য করে ? (চ) কোন্ দুইটি দেশের সরকার নিরপেক্ষ থাকে ? (ছ) আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠিত হয় কাহাদের লইয়া ? (জ) স্পেনের গৃহযুদ্ধে কে জয়ী হন ? (ঝ) তিনি স্পেনে কি স্থাপন করেন ? (ঞ) তাঁহার দলের কি নাম দেন ? (ট) নিজে তিনি কি উপাধি গ্রহণ করেন ?

৬। (ক) লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় কোন্ দুই নেতার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ? (খ) কে জয়ী হন ? (গ) স্টালিন নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন কিভাবে ? (ঘ) দেশের নিরাপত্তার জন্য স্টালিন বিভিন্ন দেশের সহিত কি সম্পাদিত করেন ?

৭। (ক) দালাদিয়ের কে ছিলেন ? (খ) চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে হিটলার কি দাবি করিলেন ? (গ) মিউনিক বৈঠকে কে কে উপস্থিত ছিলেন ? (ঘ) মিউনিক চুক্তি কাহাদের মধ্যে কত সালে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় ? (চ) এই সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ? (ছ) ফ্রান্স কত সালে জার্মানীর নিকট পরাজিত হইল ? (জ) দক্ষিণ ফ্রান্সে কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল ? (ঝ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেন কবে ? (ঞ) জার্মানী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে কবে ? (ট) জাপানের কোন্ দুইটি শহরে কি বোমা নিক্ষেপ করা হয় ? (ঠ) জাপান কাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে ?

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৭৮

ইতিহাস

দ্বিতীয় পত্র

'ক' বিভাগ

(যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লেখ)

১। 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী' কাহাদের বলা হয়? জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?

২। শিল্প-বিপ্লবের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার ফলফল কি হইয়াছিল?

অথবা

সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডার এবং প্রথম নিকোলাসের আমলে রুশ দেশের অবস্থার বিবরণ লেখ।

৩। ইংলণ্ড এবং তাহার উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে কি কি কারণে যুদ্ধ বাধে?

অথবা

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দকে 'বিপ্লবের বৎসর' বলা হয় কেন?

৪। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কি ভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হইয়াছিলেন? তাঁহার সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। ইটালির ঐক্যসাধনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা কর।

৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি পর্যালোচনা কর।

৮। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা কি ছিল? এই বিপ্লবের ফলাফল কি?

'খ' বিভাগ

(যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ)

৯। ইতিহাসে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০। 'কনসার্ট অব্ ইউরোপ' (ইউরোপের ঐক্য) কি কি কারণে ব্যর্থ হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

১১। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'জুলাই বিপ্লবের' কারণগুলি নির্ণয় কর।

১২। মার্কস-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

১৩। ১৮৭৮ সালে বার্লিন সেট্‌লমেন্টের (বার্লিন নিষ্পত্তির) কি কৃতিত্ব?

১৪। রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-১৯০৫) ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

১৫। ট্রিপ্‌ল আঁতাত (ত্রিশক্তি-মৈত্রী) কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল?

১৬। জার্মানীতে হিটলার কি রূপে ক্ষমতায় আসীন হইলেন, দেখাও।

'গ' বিভাগ

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লেখ)

১৭। বাস্তিলের পতনের তারিখ কি ?
১৮। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কোন্ কোন্ দল লিপ্ত ছিল ?
১৯। কোন্ সালে বিসমার্ক ক্ষমতাচ্যুত হন ?
২০। ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন ?
২১। 'চৌদ্দ দফা দাবি'র রচয়িতা কে ?
২২। কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত ?
২৩। 'লীগ অব্ নেশনস্'-এর (জাতি-সংঘের) মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২৪। মুসোলিনি কে ছিলেন ?
২৫। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে, তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?
২৬। 'মিউনিক চুক্তিটি' কি ?

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮০

দ্বিতীয় পত্র

ক ॥ ১। 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র' বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতিতে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব নির্ণয় কর।
৩। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকেরা কতটা দায়ী
৪। নেপোলিয়নের সংস্কার-কার্যাদির বিবরণ দাও।
৫। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা কর।
৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।
৮। বলশেভিক বিপ্লবে লেনিন কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

খ ॥ ৯। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলি আলোচনা কর।
১০। ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের ব্যর্থতার কারণগুলি কি ?
১১। জুলাই বিপ্লবের (১৮৩০) কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।
১২। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে কাভুরের অবদান নির্ণয় কর।
১৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?
১৪। কার্ল মার্কস্ কে ছিলেন ? মার্কসীয় মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
১৫। কিভাবে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী গঠিত হইয়াছিল ?
১৬। হিটলার কিভাবে জার্মানীতে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন।

গ ॥ ১৭। রুশো কে ছিলেন ?
১৮। পবিত্র চুক্তি (১৮১৫) সম্পাদনের প্রস্তাব কে করিয়াছিলেন ?
১৯। কোন্ দেশকে 'ইউরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলা হইত ?
২০। মাঞ্চু রাজবংশকে কবে উৎখাত করা হয় ?

২১। 'চৌদ্দ-দফা নীতি'র রচয়িতা কে ?
২২। স্তালিন কে ছিলেন ?
২৩। 'অক্ষ মৈত্রী' বলিতে কি বুঝ ?
২৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন আরম্ভ হয় ?

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮১

দ্বিতীয় পত্র

ক-বিভাগ

১। ১৭৬৩ সালে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?
২। প্রথম নেপোলিয়নের 'মহাদেশীয় অবরোধ' ব্যাখ্যা কর। ইহা তাঁহার পতনের জন্য কতটা দায়ী ?
৩। ভিয়েনা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ইহার ত্রুটিগুলি কি ছিল ?
৪। জার্মানীর ঐক্যসাধনে বিসমার্কের অবদান পরীক্ষা কর।
৫। বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮) শর্তগুলি বিশ্লেষণ কর। ইহা কি বলকান সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল ?
৬। জাতিসংঘের কার্যাবলী আলোচনা কর। শান্তিরক্ষায় ইহা ব্যর্থ হইয়াছিল কেন ?
৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

খ-বিভাগ

৮। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৯। 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।
১০। 'মেটারনিক ব্যবস্থা' বলিতে কি বুঝায় ?
১১। রাশিয়ার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে 'মুক্তিদাতা জার' বলা হয় কেন ?
১২। সান-ইয়াত-সেন সম্পর্কে কি জান ?
১৩। ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) সমালোচনা কর।
১৪। ফ্যাসিবাদ কি ? মুসোলিনী কিভাবে ইটালীতে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন ?

গ-বিভাগ

১৫। জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন ?
১৬। প্রথম নেপোলিয়ন কখন সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন ?
১৭। ইউরোপে কোন্ বৎসরটি 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া পরিচিত ?
১৮। কোন্ দেশ ১৯৭১ সালে আলসেস্ ও লোরেণ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল ?
১৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয় ?
২০। কামাল আতাতুর্ক কে ছিলেন ?
২১। লোকার্ণো চুক্তিগুলি কোন্ সালে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ?
২২। চেম্বারলেন কে ছিলেন ?

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা—১৯৮২

দ্বিতীয় পত্র

ক—বিভাগ

১. জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রূপে ২য় যোশেফের সংস্কারগুলির পরিচয় দাও। উহাদের ব্যর্থতার কারণ কি ?

২. ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

৩. ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪. প্রথম কনসাল্‌রূপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫. ইটালীর ঐক্য বিধানে কাভুরের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬. প্রথম মহাযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৭. ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর।

৮. জার্মানীতে হিটলার কিরূপে ক্ষমতা অধিকার করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

খ—বিভাগ

৯. ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আমেরিকার উপনিবেশগুলির সাফল্যের কারণ আলোচনা কর।

১০. ফ্রান্স ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণগুলি কি ছিল ?

১১. চীনের বক্সার বিদ্রোহের কারণ ও ফল বর্ণনা কর।

১২. গ্রীস কিরূপে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল ?

১৩. ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি ছিল ? উহার ফল কি হইয়াছিল ?

১৪. কার্ল মার্কস্ কে ছিলেন ? তাঁহার মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৫. তুরস্ককে কে কিরূপে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন ?

১৬. বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের সাফল্য আলোচনা কর।

গ—বিভাগ

১৭. ভলটেয়ার কে ছিলেন ?

১৮. ফরাসী বিপ্লবের তিনটি আদর্শ কি কি ছিল ?

১৯. 'মহাদেশীয় প্রথা' কাহাকে বলে ?

২০. 'মনরো নীতি' কে, কবে ঘোষণা করেন ?

২১. ম্যাডোয়ার যুদ্ধ কবে কাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল ?

২২. একশত দিনের সংস্কার কে, কবে প্রবর্তন করেন ?

২৩. 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' কাহাকে বলা হইত ?

২৪. 'লাল ফৌজ' কে গঠন করেন ?

২৫. মুানিগ্ চুক্তি কবে, কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের দ্বারা সাক্ষরিত হয় ?

২৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি বলিলে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে বুঝাইত ?

১৯৮৩

SECOND PAPER

'ক' বিভাগ

(যে কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীরূপে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের কারণগুলি বিবৃত করিয়া উহার সাফল্যের পরিচয় দাও।

৩। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। বিসমার্ক্ কিরূপে জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। 'আধুনিক চীনের জনক' কাহাকে বলা হয়? তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৬। রাশিয়ায় বল্শেভিক বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর।

'খ' বিভাগ

(যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

৭। সমসাময়িক সমাজে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

৮। 'মেটারনিক তন্ত্র' বলিলে কি বুঝায়? উহার ব্যর্থতার কারণ কি?

৯। 'মুক্তিদাতা জার' কাহাকে বলা হয়? তাঁহার সংস্কারগুলির পরিচয় দাও।

১০। ম্যাৎসিনি কে ছিলেন? ইতালীর ঐক্যবিধানে তাঁহার ভূমিকা আলোচনা কর।

১১। বিশ্বশান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার কি কি কারণ ছিল?

১২। ইতালীতে ফ্যাসীবাদীরা কিরূপে ক্ষমতা লাভ করে, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

'গ' বিভাগ

(যে-কোনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১৩। ফিজিওক্র্যাট্ কাহাদের বলা হয়?

১৪। স্পিনিং জেনি কে, কবে আবিষ্কার করেন?

১৫। বোস্টন টি পার্টি কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
১৬। গিলোটিন্ কি ? উহা কে আবিষ্কার করেন ?
১৭। ট্রিপ্‌ল্ অ্যালায়েন্সের সদস্যদিগের নাম কি ?
১৮। রাস্‌পুটিন্ কে ছিলেন ?
১৯। তাইপিং বিপ্লব কবে, কোথায় ঘটিয়াছিল ?
২০। কার্ল্ মার্ক্‌স্ লিখিত প্রধান দুইখানি গ্রন্থের নাম লিখ।
২১। কাহাকে, কেন 'আতাতুর্ক্' বলা হয় ?
২২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় চীন ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদিগের নাম লিখ।

১৯৮৪

বিভাগ—'ক' ঃ (যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ২য় যোশেফের সংস্কারগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। উহাদের ব্যর্থতার কারণ কি ?

২। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের প্রাক্‌কালে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। শিল্পবিপ্লব কাহাকে বলে ? ইহার প্রভাবে কিরূপে পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠে ? ইহা প্রথমে ইংলণ্ডে ঘটে কেন ?

৪। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি ছিল ? ইহার ফল কি হইয়াছিল।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করিয়া ইহার জন্য জার্মানীর দায়িত্ব নির্দেশ কর।

বিভাগ—'খ' ঃ (যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

৭। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন অন্যায় ও ব্যর্থ হইয়াছিল কিনা, ব্যাখ্যা কর।

৮। ইউরোপীয় কন্‌সার্টের ব্যর্থতার কারণ কি ছিল ?

৯। বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্রনীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। চীনে বক্সার বিদ্রোহের কারণ কি ছিল ? ইহা কিরূপে দমন করা হয় ?

১১। মুস্তাফা কামাল কিরূপে তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন, সংক্ষেপে বল।

১২। যোশেফ স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিভাগ—'গ' ঃ (যে-কোনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১৩। জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন ?

১৪। ভিয়েনা বন্দোবস্তের দুইটি প্রধান নীতি উল্লেখ কর।

১৫। 'কার্বোনারি' আন্দোলন কাহারা কোথায় সংগঠন করেন ?

১৬। 'জোলভেরাইন' কোথায়, কেন স্থাপিত হয় ?

১৭। 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' কাহারা রচনা করেন ?

১৮। 'কুয়োমিন্‌তাং' কি ? উহা কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

১৯। কোন্ রাষ্ট্রকে, কেন 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' বলা হইত ?

২০। ফ্রান্সের কোন্ সম্রাট কোন্ যুদ্ধে সসৈন্যে বন্দী হ'ন ?

২১। মুানিখ্ চুক্তি কবে, কেন স্বাক্ষরিত হয় ?

২২। 'অক্ষশক্তি' কাহাদের বলা হইত ?

1985

HISTORY

Second Paper

'ক'—বিভাগ

(যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

১। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীরূপে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ কর।

৪। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৫। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের কারণ কি?

৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

'খ'—বিভাগ

(যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

৭। ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৫ খ্রীঃ) শর্তগুলি বিশ্লেষণ কর।

৮। বার্লিন চুক্তির শর্তগুলি কি? ইহা কি প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল?

৯। 'মেটারনিক ব্যবস্থা' কি? ইহা কেন ব্যর্থ হইয়াছিল?

১০। রাশিয়ার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে 'মুক্তিদাতা জার' বলা হয় কেন?

১১। জার্মানীতে হিটলারের উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১২। বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কি?

'গ'—বিভাগ

(যে-কোনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

১৩। রোব্‌স্‌পীয়র কে?

১৪। কখন ও কাহাদের মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইয়াছিল?

১৫। "কোড নেপোলিয়ন" কি?

১৬। সাডোয়ার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল?

১৭। কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্র লইয়া 'ত্রিশক্তি আঁতাত' গঠিত হইয়াছিল?

১৮। সান্-ইয়াৎ-সেন কে ছিলেন ?

১৯। 'আতাতুর্ক' কে ? কেন তাঁহাকে 'আতাতুর্ক' বলা হইত ?

২০। কত খ্রীষ্টাব্দে সিমনোশেকির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ? কোন্ কোন্ রাষ্ট্র এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল ?

২১। 'কেলগ্-ব্রায়াণ্ড চুক্তি' কি ?

২২। 'ইউনেস্কো' বলিতে কি বুঝায় ?
